সাম্প্রতিক

অমিয় চক্রবর্তী

সা ম্প্র তি ক

অমিয় চক্রবর্তী

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

শ্রী হুমায়ুন কবির

প্রিয়বরেষু

লেখকের মন্তব্য

অনেক দিনের গদ্য রচনা একত্র হ'ল। হঠাৎ আজকের চোখে বুঝতে পারছি না সবসুদ্ধ এটাও তারা-বাঁধা, না বাড়ি-তৈরি। কোনো সমগ্র রূপ ধরা পড়ল কিনা সেই বিচারের ভার পাঠকের, লেখকের নয়।

এক হিসাবে আমিও পাঠক এ-কথা স্বীকার্য। হয়তো কিছু স্বাভাবিক মমত্ব লঙ্ঘন ক'রে সেখানে আমি এই রচনাগুলির নির্মম সমালোচক। প্রথমেই বাধা পাই তিথি, তারিখ, পারম্পর্যের অভাবে; কিন্তু কোথায় কোন লেখা বেরিয়েছিল তা ভুলেছি। অন্য কারও স্মরণ থাকবার কথা নয়। যথাযথ পাঠোদ্ধারের উপায় নেই, হাতের লেখা কপি, টাইপ ও ছাপার বিবিধ বক-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে রচনাগুলি এই গ্রন্থের আশ্রয় পেল। কিছু বর্জন পরিমার্জন করেছি কিন্তু যথেষ্ট নয়। সপ্তসমুদ্র মহাদেশের পার থেকে নিজের বই সম্বন্ধেও আমার দায়িত্ববোধ এবং কার্যক্ষমতা ক্ষীণ মনে হয়েছে— নির্ভর করেছি আমার বন্ধুদের উপর। বিরাম মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু ও নরেশ গুহ সহায়তা না করলে এই বই বেরোতো না। নানাভাবে তাঁদের কাছে আমার গভীর ঋণের স্মারকচিহ্ন এখানে রেখে যাই।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী আমাকে বাল্যকাল থেকে প্রীতির উৎসাহ দিয়েছিলেন আমার বাংলা গদ্য ও কবিতা রচনা বিষয়ে। তার কোনো সংগত কারণ খুঁজে পাই না কিন্তু সেই আমার পথ-প্রবেশ। এখন দূরের আলোয় অনেক কথা মনে পড়ে। সংগৃহীত এই রচনাগুলি তাঁদের স্নেহ এবং আমার বন্ধুজনের ও পারিবারিক শুভ সংসর্গে বিজড়িত। দেশে বিদেশে বহু সাহিত্য, অনেক চিন্তা ও অনুভূতি জীবনের ধারায় মিশেছে— জানি না সেই বৈচিত্র্যের কোনো প্রাণসূত্র এই রচনাগুলির কোথাও দেখা দিয়েছে কিনা। "সাম্প্রতিক" পেরিয়ে সেই চিরসাময়িক বাংলার এবং বিশ্বমানসের পরিচয় দিতে চেয়েছিলাম ক্ষণিক এবং বিবিধ গদ্যে। এই আমার জবাবদিহি।

অমিয় চক্রবর্তী

সূচিপত্র

১

২

শিল্পদৃষ্টি

মানুষের সমাজে যখন নানা উগ্র মতাবলম্বী দর্শনের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই শিল্প-দৃষ্টির প্রশস্ত কাল। রাষ্ট্রিক ও ধর্মতাত্ত্বিকের খণ্ডিত ব্যাখ্যায় যখন জীবনের সমগ্র ছবি চোখের ভিড়ে হারিয়ে যায়, সেই ছিন্নদর্শীর ভিড়ে এসে দাঁড়ান কবি, যিনি চক্ষুষ্মান্‌। সম্পূর্ণতার বোধ ফিরিয়ে আনেন তিনি। সৌমনস্যের একটি স্বচ্ছ পটে প্রাত্যহিকের যথাযথ রূপ নিরীক্ষণ করা শিল্পীর স্বধর্ম। তিনি দেখান ঘটনার আবর্ত, বিচিত্রের সংঘাত-সমন্বয় অথচ স্থায়ী ভূমিকার উপরে নীলাম্বর, দৃশ্যে অদৃশ্যে মিলিয়ে এই পার্থিব আশ্চর্যতা। কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, সবকে নিয়ে এই শিল্পধারণা; ধ্যানের বিলীনতায় প্রত্যক্ষকে হারিয়ে যে-ধরনের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা তা নয়, অথচ কাছের অসংখ্যকে কেবলমাত্র স্বার্থের ও তথ্যের বন্দীশালা বানিয়ে যে-বাস্তব তাকেও দূরে রাখা। কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু এই মিলিয়ে দেখার দৃষ্টিশক্তি শিল্পীর সহজাত, অন্যের পক্ষে দুরূহ। তাই সংসারে আজ একচক্ষুর বা দিব্যচক্ষুর অত্যাচারে মানবিক শুভদৃষ্টি আচ্ছন্ন, প্রীতির আলোকে যে-দৃষ্টির প্রকাশ তাকেই বেঁধেছে মানুষের অতিবুদ্ধি। শিল্পীর মুক্তি যে কত বড়ো, তার সর্বত্রচারিতা বহুদর্শিতা মানুষের পারস্পরিক সভ্যতার পক্ষে একান্ত কাম্য সেই ব ' দলীয় মতদ্বন্দ্বিতার দিনে বারবার অনুভব করতে হয়।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অথবা প্রচলিত সংজ্ঞায় যা পারমার্থিক তার সাহচর্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা, সংকট, পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পথ-নির্ধারণের চেষ্টা ব্যর্থশ্রম। শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে নোয়াখালি, বেহার, পঞ্জাবের প্রজ্বলিত দ্বিখণ্ডে, কাশ্মীরে ঘোরা যেতে পারে, তারই দৃষ্টিতে দৃশ্যেব সত্য ধরা পড়বে। পক্ষ-প্রতিপক্ষকে উত্তীর্ণ হয়ে মানবিক সংস্থানে পৌঁছনো তার স্বভাবসিদ্ধ। কর্মকুশলতার প্রাক্‌-মন্ত্র আছে পূর্ণদর্শীর কাছে। অথচ ভাবুক, শিল্পী এদের বাদ দিয়েই লোকালয়ের চরম দুর্যোগে রাষ্ট্রিক নিজস্ব প্রত্যক্ষদর্শীর উপর নির্ভর করা হয়; কর্মচারী-বুদ্ধির বিশেষ অজ্ঞতা এবং বিশেষ অভিজ্ঞতার নির্ধারিত প্রবণতার পিছনে যোগ করা হয় শক্তির অস্ত্র, সাংঘিক বাহিনী। আমরা বলি পোড়া বাড়ি, পাশের সোনালী ক্ষেত্র এবং অপেক্ষার মহাকাল যে একই সঙ্গে দেখতে পায় তারই

প্রয়োজন সৌরাষ্ট্রে। বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেও প্রতিকারের অপরাজেয় শক্তি জাগে বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে, যার পরিচয় পাই সাহিত্যে, চিত্রকলায়। সেই দৃষ্টির বেদনা কে বুঝবে? আহত বা মৃত যে পড়ে আছে তার পোশাকের রং, মুখের ভাব, মাথার টুপি থেকে আরম্ভ ক'রে তার ব্যবসাগত সম্প্রদায়গত আকস্মিক এবং বিশিষ্ট চিরন্তনী পরিচয় সবই কবির নেত্রাঙ্কিত হয়, কিন্তু তথ্য ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ মানুষটিকে দেখা-ও সেই চিত্রদৃষ্টির অন্তর্গত। কোনো গণ্ডিতে বদ্ধ রেখে, বিদ্বেষের অবয়বে ঘটনার ব্যাখ্যান শিল্পীর ধর্মবিরুদ্ধ। আক্রান্ত গ্রামের মাঝখানে ঐ প্রকাণ্ড বটগাছটার ঈষৎ দূরবর্তিতা কবির চোখে পড়ল, তার ডালে লাল ফল, হাটের ধ্বংসিত ভাঙা মেঝেতে ছোটো মেয়ে ভাঙা চুড়ি কুড়োচ্ছে, মেঘ উড়ে গেল ওপারের জলা মাঠ পেরিয়ে। হঠাৎ হুহু ক'রে ওঠে চৈতন্যের হাওয়া। রাষ্ট্রিকেরা যখন কম্যুনিস্ট ফ্যাসিস্ট গুনছেন, ধার্মিকতার যাজক চিনছেন ধর্ম-চিহ্ন, এবং একান্ত আধ্যাত্মিক জানছেন সবটাই মায়া, তখন কবির চোখ-কান খোলা। তার কাছে সেখানে হিন্দু মুসলমান, বাঙালী পঞ্জাবী লক্ষণীয় কিন্তু অবান্তর, রাষ্ট্রিক বা দলগত ভিন্নতার হীনার্থক তারতম্যগুলি অদৃশ্য। মনুষ্যত্বের বিশেষকে পুরো দাম দিয়েই সে মানুষকে বড়ো ক'রে দেখে। মতামতের উষ্মা সেই পরিবেশে তার কাছে সমধিক ব্যর্থ। এমনতর উপলব্ধি যার সেই শিল্পীর পক্ষে বিপদকালে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সেবা করা শুধু সহজ নয়, অনিবার্য। প্রশ্ন উঠবে, শিল্পী না হয়েও কর্মীরা বিদ্বেষহীন আত্মপর-বোধাতীত শুশ্রূষা কি করেন না? যাঁরা করেন তাঁদের বলব জীবনশিল্পী। অর্থাৎ তাঁদের কর্মের মূলে আছে সর্বাঙ্গীণ বোধের শিল্পপ্রতিভা; কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিধি বা সভাসমিতির প্রবর্তনায় জাতি-বর্ণ-সাম্প্রদায়িকতার বিবিধ বিষকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আনুষ্ঠানিক ধর্মের পূজারীকে যদি বলি ধার্মিক তাহলে তার ব্যবহারেও বিশ্বাস নেই। কেননা অনুষ্ঠান বাহিরের, এবং বিষয়বুদ্ধির সংস্কারে বিজড়িত। মানুষের স্বভাবে যে-শিল্পবৃত্তি ছড়িয়ে আছে, যা নিঃস্বার্থ এবং মুক্ত তারই বিশেষ সাধক-রূপেই শিল্পীর জোর, সেই বৃত্তিকে জনসাধারণের চিত্তে তিনি আনন্দের প্রকর্ষে জাগিয়ে তোলেন। সাক্ষী সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য, বা সেই-জাতীয় ধর্মশাস্ত্র যার রচয়িতা একাধারে ঋষি এবং কবি এবং যিনি শুধু আলো দেখেননি আলো দিয়ে প্রাত্যহিক সংসারকে রূপে রসে দেখিয়েছেন। লোকব্যবহারে যথার্থদর্শিতার এই প্রেরণা আসতে পারে নৈর্ব্যক্তিক ধর্মদর্শন হতে, কিন্তু তার ব্যবহার জানেন শিল্পী। আদর্শকে মানুষের মনোধর্মে বিবিধ কর্মে প্রতিফলিত ক'রে উন্নীত করা,

শিল্পিত করার দায়িত্ব সকল ধর্মসাধকের নয়। তার জন্যে চাই শিল্পীর সৃষ্টিকুশলতা এবং স্বাভাবিক প্রসাধনশক্তি।

মহাভারতের অর্জুন পাণ্ডববংশীয়দের মধ্যে আর্টিস্ট্‌স্বভাবাপন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিপদকালে নীতিবাচন অথবা তার লঙ্ঘন কোনটা প্রচার করবেন ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু ওরই মধ্যে শিল্পভাবুক অর্জুন সারথি কৃষ্ণের সামনে কবির দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়ালেন। বিশ্বদর্শনের বর্ণনার চেয়ে অর্জুনের চোখে দেখা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রথম দৃষ্টি আমাদের কাছে মূল্যবান। আজ অবধি অর্জুনের প্রশ্ন জেগে রইল, যুগে-যুগে তার উত্তর দেবার চেষ্টা চলেছে। মানব-সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ্মদৃষ্টির এই বোধহয় প্রাচীনতম শুভ্র দৃষ্টান্ত। একই কালে অর্জুন স্পষ্ট দেখছেন পুণ্যতার প্রয়োগ ও পরিণাম। দেখছেন স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে দোষী-নির্দোষীর অসংখ্য মিশ্রণ ; রাজ্যসাম্রাজ্যস্পৃহায় দুই দলের বিশেষ ভেদ নেই। বংশরক্ষার সমরোদ্যত বিক্রম উভয় ক্ষেত্রেই সাংঘাতিক অস্ত্রশীল। এমন অবস্থায় যে-কবিমানস রক্তপ্লাবনে পরাঙ্মুখ হয়ে অন্য কোনো উপায়ে মীমাংসা খোঁজে সে আগে যোদ্ধা ছিল এখন দ্বিধাপন্ন, এতে তাকে ক্লীব বলা চলে না, চক্ষুসম্পন্ন বলতে হয়। তার প্রশ্নের জবাব কোথায় ? ধর্মযুদ্ধের নামে স্ত্রীগণকে পাপলাঞ্ছনার হাতে সঁপে দিয়ে, কুল প্রদুষ্ট ক'রে, অশুচি সংসারের "রুধিরবিদিগ্ধ" প্রলয়কলুষ রূপ বরণ করা আর যাই হোক মানবোচিত নয়। শ্মশানরচনার সুকৌশল এবং নীতিবর্জিত বহু আচরণ -দ্বারা পৃথিবীতে জয়ের চিতা জ্বালিয়ে অবশেষে স্বর্গে প্রস্থানের ঘটনা ইতিহাসে প্রশংসা পেল, কিন্তু মানুষের মধ্যে যিনি শিল্পী যিনি দ্রষ্টা তাঁর কাছে এটা চিরন্তন করণীয় ব'লে গণ্য হতে পারে না। পাঁচটা গ্রাম বাঁচাবার জন্যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের দাম দেওয়ার বিধি আজও চলেছে। কখনো দেখি তার সাম্রাজ্যিক রূপ কখনো বা সাম্প্রদায়িক, কিন্তু মহাকাব্য-লেখকের মন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিতে উঠে তাতে সায় দেয়নি। হয়তো কুরুপাণ্ডুর সময়ে স্বয়ং কৃষ্ণের পক্ষেও কর্মগত ধর্মগত পথ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না, আজও পুরো সম্ভব হয়নি, কিন্তু অর্জুনের চরিত্ররচয়িতা ও দৃষ্টিব্যাখ্যাতা মহাকবি ধন্য। মানুষের মুক্তদৃষ্টির এমন নির্ভীক অকুণ্ঠ প্রকাশ জগৎ-সাহিত্যে দুর্লভ। ভ্রাতৃহত্যা নরহত্যা শিশুহত্যাকে "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" অতএব মারো এই মন্ত্র-ব্যাখ্যায় চাপা দেবার চেষ্টাই আমাদের পক্ষে ক্লীবত্ব। অবশ্য মূল গীতায় এ-সব কোনোই সংসর্গ নেই। সেখানে না যুদ্ধ, না হন্তা ; নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে পরমার্থের সোপান সেখানে নির্ণীত। কিন্তু যদি মহাভারতের গৃহযুদ্ধ এবং বিবিধ

পাপাচরণের সঙ্গে গীতার চিরন্তন শ্লোকের ঐরূপ অনুযোগ পরবর্তী কোনো নিকৃষ্ট কবির সাধিত না হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে, অর্জুনের দৃষ্টিই ধার্মিক প্রলেপের চেয়ে সত্য, প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুর দৃষ্টিতত্ত্ব তখনকার সামাজিক অসামর্থ্যে আচ্ছন্ন। অর্থাৎ শিল্পীর কাছে, যাকে বলা হয় ধার্মিক ব্যাখ্যা, তারই পরাজয়।

বলা বাহুল্য সমস্ত গীতার মূলদর্শন শঠতার ছন্নতার কুরু-পাণ্ডবীয় আচরণকে সমূহ প্রত্যাখ্যান করে। "সমদর্শিতা"-ই ঐশীদৃষ্টির অর্থে সেখানে ব্যাখ্যাত। সেই দৃষ্টি পাপকে অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু পাপের বিরুদ্ধে আচরণেও শ্রেষ্ঠ ধর্মকেই একমাত্র রক্ষণীয় ব'লে জানে। কেননা দৃষ্টিমানের পক্ষে জয়পরাজয়ের লৌকিক বিচার নেই। বাজসনেয় সংহিতায় যে "সমীক্ষা"-র কথা বলা হয়েছে তারই আবির্ভাব দেখেছি অর্জুনের চোখে :

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥

মহাভারতের যুদ্ধকে অতিক্রম ক'রে ধ্বনিত হয়েছে ঐ কাব্যেরই অন্তর্নিহিত মহাবাণী :

জীবিতুং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোঽন্যং প্রঘাতয়েৎ।
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ ॥

"যে নিজে বেঁচে থাকতে চায় সে কেমন ক'রে অন্যকে আঘাত বা হত্যা করে? নিজের জন্যে যা ইচ্ছা কর অন্যের জন্যেও তা-ই ইচ্ছা কোরো।" দুঃখের বিষয় সমাজে মানবধর্মের পতন ঘটে, এবং সেই ভ্রষ্টতারও যথাযথ রূপ দেওয়ার দায়িত্ব কবির। তা ছাড়া আদি রচনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত অংশের উগ্র সমর্থকেরও অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও অর্জুনের চোখে দেখা শিল্পীর আদর্শ রয়েই গেল। সেই দৃষ্টির পরিণতি দেখি উত্তরকালের নানা দেশীয় কাব্যে শিল্পে কারুচিত্রে।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে বোধহয় সেকস্‌পীয়রের কোরায়লনাস্ নাটকে এই যুগ্ম-দৃষ্টির পরিচয় সবচেয়ে আশ্চর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। হননকারী বীর যখন ছদ্মবেশে বিধ্বস্ত শত্রু-শহরে প্রবেশ করেছেন তখন রক্তচক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে মানুষের দৃষ্টি তাঁর চোখে ভর করল :

"A goodly city is this Antium. City,
'Tis I that made thy widows : many an heir
Of these fine edifices 'fore my wars
Have I heard groan and drop : then know me not ;
Lest that thy wives with spits, and boys with stones,
In puny battles slay me."

বলা বাহুল্য যোদ্ধা বীরের পক্ষে এইরূপ দুর্লভ ক্ষণবাক্য ক্লীবত্বের পরিচয় নয়, সাধু সন্ন্যাসী বিপক্ষে থাকলেও বলতে হবে এতে মানুষের ক্ষণদেবত্ব বা বিরল মানবত্বেরই উদ্বোধিত প্রকাশ। সেকস্পীয়র বা মিল্‌টন্‌ যেখানে জাতি ধর্ম মতবৈরিতা বর্ণ সম্প্রদায় সকলের ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পীর দৃষ্টি পেয়েছেন সেখানে বৃহত্তর অস্মিতার আলো এসে পড়েছে তাঁদের শিখরকাব্যে। সেইখানেই তাঁদের কবি-দৃষ্টির স্বাভাবিকতা। দুঃখের বিষয় যে-কথা ধর্মবুদ্ধির পক্ষেই সবচেয়ে বলা সংগত মনে হয় তা ধর্মশাস্ত্রেও আখ্যান-কিংবদন্তী ও অশ্রেয় শ্লোকে নানা ভাবে ব্যর্থ হয়ে আছে। এতে সমাজের বহু ক্ষতি ঘটল। আজও যাঁরা নামের ছাপ-মারা বিজড়িত ধর্মে একান্ত বিশ্বাসী তাঁদেব পক্ষে বিশ্বাসের অবসর এবং ক্ষেত্র অবাধ অবারিত ব'লে যা আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ যা শ্রেষ্ঠ অর্থে শিল্পদৃষ্টি তাকে প্রচলিত ধর্মবোধ হতে তাঁরা দূরে রাখেন। তা না হলে আনুষ্ঠানিক এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম চলে না। এমনি ক'রে দেয়াল-তোলা ধর্ম দূরে-দূরে সরে রইল, মানুষের আশ্রয় না হয়ে বিভেদের সহায়তা করল। কাব্যেও কবিদৃষ্টি বারবার স্তিমিত হয়েছে তার প্রমাণ সর্বত্র। উদাহরণ মিল্‌টনের নানা স্তরের রচনা। তাঁর মহাকাব্যে পরিকীর্ণ হয়ে আছে চিরাচরিত লৌকিক অসমদর্শিতার উদাহরণ; বলা বাহুল্য দলীয় অত্যাচারের সঙ্গে-সঙ্গে জড়ো করা হয়েছে ধার্মিক সমর্থন যুক্তি। কখনো প্রকাশ পেয়েছে বিদ্বেষের সংশয়িত দ্বিধা-বিভক্ত বিচার। কিন্তু প্যারাডাইস লস্ট্‌-এ মিল্‌টনের শিল্পাগ্নি যেখানে প্রজ্বলিত সেখানে দুর্ধর্ষ বীরের অক্লীব্য-মাহাত্ম্য-ঘোষণা আর রইল না। তখন দেখি পুরোপুরি আর্টিস্টের কথা; শুধু পূর্ণ মানবিক দর্শনের কথা নয়, দৃষ্টির। হনন-মন্ত্রদাতাকে বেনিফ্যাক্‌টার অর্থাৎ মঙ্গলদাতা ব'লে পূজার পরিহাস আর রক্ষা হ'ল না। বিদ্রূপ-শাণিত বাক্যে কবি বলছেন

". . . . . Conquerors, who leave behind
Nothing but ruin whereso'er they rove,
And all the flourishing works of peace destroy,

. . . . . . must be titl'd Gods,
Great Benefactors of mankind, Deliverers."

কবি বা শিল্পীর পক্ষে যে-কোনো কারণেই অমানুষিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, জয়ের কীর্তি ঘোষণা করা আত্মাবমাননা, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অপমান। যেখানে নিকৃষ্ট পথই সামনে খোলা রয়েছে, অন্য পথ দেখা যায় না, সেখানে অর্জুনের মতো স্তব্ধ-হয়ে-যাওয়া দৃষ্টিতেই মানুষের পরিচয়। সেখানে ব্যথিত সংশয়ের তলে-তলে মানবিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাই শিল্পীজনোচিত। অথচ রক্ত-চিহ্নিত মন্দিরের শক্তিপূজায়, জিহাদের ধার্মিক ব্যাখ্যানে, য়ুরোপীয় ঐশীশক্তিময় ধার্মিক যুদ্ধে মান্ধাতা আমলের অস্ত্রশস্ত্র এবং আণবিক বোমার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যবহার হয়েছে পতিত শিল্পীর নরঘাত মন্ত্র, সাম্প্রদায়িক অথবা জাতীয় অন্ধ দেশভক্তির স্তব। মিল্‌টনের কাব্যে তারও উত্তর রয়েছে :

"Worship't with Temple, Priest and Sacrifice ;
One is Son of Jove, of Mars the other,
Till Conqueror Death discover them scarce men,
Rolling in brutish vice, and deform'd . . . . . .
But if there be in glory aught of good,
It may by means far different be attain'd
Without ambition, war, or violence ;
By deeds of peace, by wisdom eminent,
By patience, temperance . . . . . ."

ঠিক এই প্রশ্নই ছিল অর্জুনের কথায়। "Means far different" ; সেই শ্রেয় পথের জীবন-সংসর্গিত অনুসন্ধানই শিল্পীর ঈপ্সিত। যে-ধ্যানীরা শ্রেয় পথকে উত্তম প্রকোষ্ঠে বন্দী ক'রে সংসারের ক্ষেত্রে হীন সংস্করণের প্রেয় পদ্ধতি অনুমোদন করেন তাঁদের দূরে রেখে আমরা শিল্পীকে আবাহন করি। কেননা সর্বত্রগামী শিল্পীর মন হয়তো সুন্দর উপায়ের প্রেরণা এবং প্রয়োগবিধি নানা পক্ষের কাছে সংগ্রহ ক'রে নেবেন, এবং মায়িক সংসারের প্রতি মায়ামমত্ব আছে ব'লেই সামাজিক মানুষের পূর্ণ উপযোগী ক'রে তুলবেন। বিশ্বের সাহিত্যে জীবন-শিল্পের সেই প্রবণতাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত নিয়ে অনেকে বলেন, বিখ্যাত সোভিয়েট শিল্পীর রচনায়, টিখনভের কবিতা বা শলকভের গল্পে মানুষের দৃষ্টি-হারানো সংকীর্ণতা কি সগর্বে প্রকাশ পায়নি ? কিন্তু সেখানে শিল্পীর কাগজে কালি ঢালা, সেই

কালি পরাভূত লেখকের মনোজাত। ঘটনা যতই ভয়ানক হোক, সংসারে সর্বত্র দেখা যায় উভয় পক্ষেই মনুষ্যত্বের পরিচয় থাকে, সেই সত্যকে বর্জন ক'রে শিল্পের সত্যরক্ষা হয় না। যারা চিত্রিত হ'ল, শিল্পদৃষ্টিতে তাদের সমগ্র রূপ দেখানোর দায়িত্ব কবির, স্বচ্ছ দৃষ্টির মূল্য দিয়ে দেখলে "ঘৃণা" নামক গল্পে শলকভের শিল্প মানবিক বেদনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ জানার সততায় আরো একটি স্তরে গিয়ে পৌছত। তাহলে ঐ গল্পটি সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হ'ত। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিল্পীর পরাজয় তার পরিচয় নয়। দু-চারটে অগৌরবান্বিত সংঘাত-কাব্যের অন্তর্গত দলীয় যন্ত্রপূজা এবং চীৎকৃত ধ্বনি সংগ্রহ ক'রে সাহিত্যের স্বরূপতা বর্ণিত হয় না। এইটেই ভাববার বিষয় যে অত্যুগ্র শিল্পীদলের মধ্যেও রাশিয়ায় কেউ ফিন্‌লণ্ড্-আক্রমণের উপর উল্লাস-কাব্য রচনা করেননি। বর্মা লীবিয়া -সংক্রান্ত ধ্বংসধ্বজ কবিতা এবং গল্প অন্যান্য সভ্য সাহিত্যে এই যুদ্ধের কালে সগর্বে দেখা দিয়েছে, কিপ্‌লিঙের মসী এবং কলমরূপ অসিকে যুগপৎ ব্যবহার ক'রে বধকাব্য রচনার দৃষ্টান্ত এ দেশেও বিরল নয়, তবে তাতে অবশ্য বীরত্বের চেয়ে জনশ্রুতির প্রকোপই বেশি। দেশে-দেশে কত প্রখ্যাত শিল্পী স্বেচ্ছায় চক্ষু বেঁধেছেন, দলীয় স্বার্থবুদ্ধির দাসত্ব করিয়েছেন আপন তুলিকে, গানের সুরকে। কিন্তু এই কি সৃজনীদৃষ্টির নমুনা? বহু শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মিলবে যা সম্পূর্ণ অন্য-জাতীয়। শেষ দুই যুদ্ধের কোনো সময়েই ইংলণ্ডে শিল্পদৃষ্টির অভাব ঘটেনি, বহু কবিতায় গদ্যে তার প্রমাণ রয়ে গেল। যখন গির্জায় বিদ্বেষের ঘণ্টা বাজছে, কালীঘাটে জয়ের পূজা হচ্ছে প্রভুদের তোষণার্থে, সংবাদ : ভ'রে উঠেছে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের সমর্থনে, তখনো শিল্পীর দৃষ্টি হারায়নি। সর্বজনের হয়ে কোথাও সে জেগেছে। শত্রুপক্ষকেও মহীয়ান্ ক'রে দেখানোর যে-প্রয়াস দেখি মহাভারতের কর্ণ দ্রোণ ইত্যাদি চরিত্রসৃজনে, ক্ষমা এবং আত্মবিশ্লেষণবুদ্ধির সেই মহান শিল্পবৃত্তি ভারতবর্ষে স্তিমিত হবে না। কিন্তু সাহিত্যিকদের নূতন প্রেরণার জন্যে ফিরে যেতে হবে সহজ দৃষ্টির কাছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পসল্পে "দ্বন্দ্ব" ব'লে রচনাটিতে আছে সেই সৃষ্টির সুর; তাঁর রচনায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে দেখার চরম শিল্প। দেখব মানুষকে, স্বদেশের স্বদলের বিশেষ ধর্ম বা মতাবলম্বী মানুষকে নয়। শিল্পীর চক্ষু হারালে খণ্ডিত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আরো দূরে স'রে যাবে। সেদিন জর্মান লেখক Ernst Toller-এর রচনা পড়বার সময় মনে হচ্ছিল স্বজাতীয়ের উৎপীড়ন এবং সর্ববিধ হন্তৃতা-বিদ্বেষের মধ্যেও খাঁটি শিল্পীর মানবদর্শন কীভাবে জেগে ওঠে তা আশ্চর্য। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের নিহত মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বলছেন :

Suddenly, like light in darkness, the real truth broke in upon me; the simple fact of Man, which I had forgotten, which had lain deep buried and out of sight... A dead man. Not a dead German. A dead man.

All these corpses had been men; all these corpses had breathed as I breathed; had had a father, a mother, a woman whom they loved, a piece of land which was theirs, a face which expressed their joys and their sufferings, eyes which had known the light of day and the colour of the sky. At that moment of realisation I knew that I had been blind because I had not wished to see; it was then only that I realised, at last, that all these dead men, Frenchmen and Germans were brothers, and I was brother of them all.

এই দৃষ্টি নিয়ে ভারত পরিভ্রমণে বেরোলে আজ অগণ্য আর্ত লোকের জীবনে যা ঘটছে তার মানবিক চিত্র আমরা দেখতে পাব। যাঁরা শিল্পী নন অথচ জীবনশিল্পী তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতীক-পুরুষ ভারতবর্ষের চোখ খুলেছেন, তাঁর দৃষ্টি ধর্ম সম্প্রদায় রাষ্ট্র বা জাতির কোনো কক্ষে নিবদ্ধ নয়। যাঁর কথা বলছি তিনি অবশ্য অনেকের কাছে লেখকরূপেও উৎকৃষ্ট শিল্পী। কিন্তু আর্টিস্টের দায়িত্ব কি আজ একান্ত হয়ে ওঠেনি? দুই দিকে দেখা এক-দৃষ্টির কাব্য উপন্যাস চিত্র প্রকাশ না হলে লোকালয়ে দৃষ্টি চারিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। এই দৃষ্টি-গোচরতার প্রধান বাহন হ'ল সাহিত্য, ভাষা দিয়ে জাগানো তার কাজ। শিল্পীর গতি সর্বত্র, হাটবাজারে তার বিহার, রাজদ্বারে শ্মশানে চ; অথচ তার মন একাকী দর্শক। তাকে আজ চাই পুনর্বসতির কেন্দ্রে, আর্তের হাসপাতালে, মন্দিরে গুরুদ্বারায় মস্‌জিদে। সংসারের মানুষকে সে চিনবে রাষ্ট্রসীমানার দুই পারে এবং তাকে নিয়ে রচবে মহাকাব্য। প্রাচীন কাব্যের নায়ক হ'ত রাজা, বহুহন্তারক যোদ্ধা, বা যাদের মনে করা হ'ত অনন্যসাধারণ; আজ সেই মিথ্যা সংস্কারের দাসত্ব হতে মুক্তি পেয়েছে সাহিত্য। শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সাধারণের অনন্যতা। ট্রাম-কণ্ডাক্টর, শিক্ষক, রিক্‌শ-চালক, বিজ্ঞানকর্মী, পাটকলের মজুর বা হোটেলের দ্বার-রক্ষক কারও বাধা নেই নাটকের নায়ক হতে; যদি শিল্পী তাকে বেদনার মূল্য, মানুষের যথাযথ দাম দিয়ে দেখতে জানেন। উচ্চ আধ্যাত্মিকের কাছে যে সাধারণজনেরা বহু জন্মান্তর বিনা মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়, অথবা

যাদের জন্তে ধর্মের নিকৃষ্ট বিধান ; তাথ্যিকের কাছে যারা রাষ্ট্রতথ্য অর্থনীতি বা জৈবতথ্যের সমষ্টি ; সেই প্রতিবেশীদের চরম একটি মূল্য আছে শিল্পীর চোখে। তারই দৃষ্টিতে আমাদের সংসারের প্রধান নির্ভরস্থল। রবীন্দ্রনাথের যুগে আছি বলেই এ-কথা আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝেছি ; তিনিই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের দৃষ্টিপথ খুলে দিয়েছেন। এখন নূতন অভিযানে বেরোতে বাধা নেই। শিল্পীর কাজ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

কাব্যে ধারণাশক্তি

মনে করা যাক, বর্ষার কাব্য লিখছি। ভাদ্রের আকাশ ভেঙে পড়েছে; শ্রাবণী প্লাবনীর ভরা পাত্রে ঘনতর ছায়া ভবল; বাড়ির ঘাটে আশ্চর্য স্রোত। পুবের বাগানে কতরকম সবুজ, ঝাপ্‌সা সবুজ, মেঘলা সবুজ, তাতে ঝিনুকে আলো ঠিক্‌রে পড়ে, দুপুরের ক্ষণলঘু বিরত বৃষ্টির মুহূর্তে। কখনো নীল মেঘ, কালো মেঘ, কল্লাভ ইন্দ্রলোকের মেঘ। বাংলার বন্যায় আজ মিশেছে কান্নার জল, সব বাঁধ ভেঙে গেছে দুঃখের; সেদিককার কথাটা কাব্যকে ছাড়িয়ে যায়। যারা বাঁধ গড়বার কাজে যথাপ্রাণ নিযুক্ত তারা হয়তো আজ কবিতায় বোবা। আদিগন্ত দুর্যোগকে এখনই কাব্যে ধারণ করবার শক্তি সকলের নেই।

বর্ষার ধারণাকে অন্যান্য নানান আর্দ্র প্রসঙ্গে চেয়ে দেখি। বারান্দাটা ভিজছেই লাল সর্বাঙ্গে, লাল শানের বারান্দা, ছাতহীন; ঝিরিঝিরি, ঝরঝর সারাদিন। ঘাটের ধাপেই মেঘনা, তার ঘোলাটে আয়নায় পূর্ববঙ্গের ছায়া ঘনায়, আকাশ জলের মোহানায়; বৃষ্টি; দৃষ্টি লীন। সারাদিন। আমরা বাড়িতে। জলবরন জল, ছলছল, জামে আমরুলে জল, বাগানে ঝাউয়ের বনে, আনারসে মেহেদিতে। জল নামছে হঠাৎ প্রবল।

ওদিকের বাগানে কলাগাছের সারি-পাতা; শিমুলের বিশীর্ণ আঙুল; অঞ্জলিত মোটা বটপাতা। ফোঁটা-ফোঁটা জল, চঞ্চলিত। ঝিরঝির নতুন বর্ষণ। সুপুরিগাছের সারি ঘন সঞ্চলিত। তার মধ্য দিয়ে সরু জলের গলি। তেঁতুল নিমের দ্রুত সুচারু সবুজে বৃষ্টি; নিচে জল জমে; বকুলগহন গাছতলে ছায়াচ্ছন্ন গূঢ় জল। জানলায় বসে আছি। অগম্য আকাশ থেকে ঘাসে-ঘাসে শিকড়ে জল গড়ায়; ধানের গোড়ায়, শীষে; সিক্ত তেজে প্রাণ ভেজে। সূর্যরশ্মিদ্রবস্বচ্ছমর্ম জল। স্নিগ্ধ জল।

দেখছি, শুনছি, কিন্তু শত টুক্‌রো দেখাশোনাকে মিলিয়ে নিয়ে কবিতার সূত্রটুকু প্রচ্ছন্ন অনুভবের ভাষায় নিমগ্ন।

এরই মধ্যে মনে একটি পদ জাগল—

'ঝাপসা পুকুরে ব্যাং স্তব্ধ শুধু অস্তিত্ব বিহ্বল।'*

বুঝতে পারলাম, বলবার আর-একটি সচেতন স্তরে এসে পৌঁচেছি। শব্দটি আমার সমস্ত ধারণাকে ধারণ করতে চায়।

জাগা-মনের কোনায় যখন এই মেঘলা দিনের সচল সজল চিত্র, তখন গানের ধুয়োর মতো ঐ একটি পদ নেমে যেন আমার কথা-রচনার উপরে সজ্ঞানতার ধ্বনি জাগিয়ে দিল। ছবির ভিতর থেকে উঠল স্পষ্টতর সংস্কার, যাতে লুপ্ত স্মৃতি এবং নতুন পরিবেশ মিশেছে। দেখলাম আমার রচনা বিশেষ একটি ছন্দে অধিকৃত, কোনখানে গিয়ে সমস্ত লেখাটার পরিধিচক্র ঘুরে গেছে তাও অনুমান করলাম। কবিতাটার শেষতম অংশে মেঘার্দ্র মাটি-মন এবং ভাবের গগন, বিশেষ একটি লগ্নে উচ্ছল হ'ল; ছবিতে দেখা দিতে লাগল দৃঢ় একটি মানসরেখা। বিস্মৃতির শুষ্ক ডাল উড়ে যায় দম্‌কা বাদলে। কাজের বিস্রস্ত ব্যথা লুপ্ত হ'ল ডিণ্ডিম মাদলে। হৃৎপিণ্ডে সঘন ভাদ্র, ভ্রান্তি ভয় মৃত্যু ডোবে অশ্রান্ত বর্ষায়,— ডুবে থাকে, যেমন ঐ ঝাপ্‌সা পুকুরে বিশ্বের কূপ-মণ্ডূক। অগাধ জলে নিমগ্ন চৈতন্য। অথচ উপরমহলে প্রাণের উপ্‌চিয়ে পড়া একটি হৃদ্যতা। প্রত্যক্ষ করলাম, মাছ-হাঁস-মানুষে জলসূত্রে বাঁধা এক খুশি। খুশি বারান্দায়। মনে লেগে আছে বারান্দার কথা,— লাল মেঝে ধুয়ে তার ধাপে-ধাপে তরঙ্গ গড়ায়।

লাল বারান্দাটা আমার বর্ষা-চেতনার অন্তরঙ্গ।

—এই আমার বর্ষা-কাব্য।

* * *

নিজের মধ্য থেকে জেনেছি, চৈতন্যের বিশেষ ঘন মুহূর্তে কোন ঘটনা বাঁধা পড়বে, কোনটা পড়বে না, তার হিসাব নেই। তালিকার কথা উঠলেই যেন গীতিকাব্য-লেখক কাগজটা ছিঁড়ে ফেলেন। অন্তরের প্রচ্ছন্নতায় সংযোগ-বর্জনের পালাটা আমাদের সচেষ্টতার অনায়ত্ত, উদ্দেশ্যের বাহিরে। সমস্ত ধারণাকে বহন ক'রে কোন ছিন্ন বাক্য, প্রক্ষিপ্ত রৌদ্রচ্ছটা দেখা দেবে তা আঙ্গিকের অথবা ভাবনার বহির্ব্যাখ্যানে নির্ধারিত হয় না। অথচ এ-কথা জানি যে বোধনের ঘেরকে আমরা বাড়িয়েছি। লাল বারান্দাটা বিসংগত হলেও অসংগত নয়। অনেক কথা আমাদের ছবিতে ঢোকে যা আগে ফ্রেমের বাহিরেই থাকত।

রচনার কালে চেষ্টা না থাকলেও, রচয়িতার মন আজকে কাব্যবিচারের নানা মহলে ঘুরতে অভ্যস্ত; ছন্দোবেগের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিবিধ প্রবণতা নিশ্চয়ই থেকে যায়। আঙ্গিকের নবীনতায় বিমিশ্র মাধুরী সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গের অপ্রত্যাশিত পরিধি-রচনায় কবিতার দিগন্ত তৈরি হতে থাকে। সুরের ভাবনা

ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায় ভিন্ন রাগরাগিণীর দরোজা, যাদের মধ্যে বাহিরের সম্ভাব নেই; তাল এবং লয়ের বোল-চাল যায় বদলিয়ে। কাব্যের ঘেরে চতুর্দিকের কোন ঘটনার রং কোথায় মেশে, বিরূপের রূপ ধরা পড়ে কোন রেখার জালে তার জবাবদিহি নেই।

কিন্তু যাকে কাব্যের ধারণাশক্তি বলছি তা কেবলমাত্র ঘটনার টুক্‌রো কুড়িয়ে সরাসরি বাক্যে গ্রন্থনশক্তি নয়। সেভাবে জর্নলিজ্‌ম্‌-এর নগদ মূল্য মেলে, পরিবেশের চমক লাগানো যায়। প্রত্যক্ষ সংগ্রহ এবং সঙ্গে-সঙ্গে খরচ করবার কৌশলীবিধি সৃষ্টিশীলতার মুখ্য পরিচয় নয়, অধিক ক্ষেত্রে সেটা কাব্যপ্রকাশের বিরুদ্ধ পথ। নানা অভিজ্ঞতাকে ধারণ করবার শক্তিই ধারণাশক্তি। ভাবের চিত্রময় অন্তর্লীন একটি সূক্ষ্ম শরীর তৈরি হওয়ার জন্যে চাই মনের সম্বৃত-বেগ, যা আপন কালে এবং ছন্দে প্রকাশ পায়, যাকে তাড়া দেওয়া যায় না, অথচ যার মধ্যে বিভিন্ন-সমন্বিত সৃষ্টির অনিবার্যতা আছে। সেই প্রাণমনস্বিনী ধারাকে নূতন শিল্পে ক্বচিৎ দেখতে পাই। রিপোর্টর-বৃত্তির প্রাবল্য আধুনিক ধারণাশক্তিকে বিড়ম্বিত করে, কেননা তার মধ্যে অভিষিক্ত চৈতন্যের স্থিরবিদ্যুৎ নেই, যাতে তল পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছয়। অথচ কেবলমাত্র ঘটনার চকমকি ঘষাকে অনেকে নূতন শিল্প-সচেতনার সাক্ষ্য ব'লে মানেন। আবার কারও কাছে বিসদৃশের গভীরতম যে সংগতিকাব্য, যাতে বিশ্বসত্তার সাধর্ম্য প্রকাশিত, তাঁর সঙ্গে প্রহসনের কোনো ভেদ নেই। স্টক্‌-একস্‌চেঞ্জের টুক্‌রো তথ্য, দলের ঝাণ্ডা, আনুষ্ঠানিক ধর্মের পাণ্ডা, বিবৃত বুলি এবং নোংরা চায়ের পেয়ালা জোড়াতালি দিয়ে সচেষ্ট কাব্যরচনা হ'ল কাব্যের ছেঁড়া কাঁথা। কাব্য গাঁথা হয় যে-সৃষ্টির জাল বুনে তাতেও দ্রব্যের মনিহারি দোকান বসতে পারে, কিন্তু সেখানকার পসরা জুটেছে অন্যভাবে। পড়ন্ত রোদের একটি গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে গেল অনেক-কিছু; পানের দোকানে সবুজ পান, সোনালী ডিবে, ঝিলমিলে ঝোলানো আয়না, দোকানের লাল টালির উপরে চুপ করে বসেছে কাক। বুড়ি ভিখারি ভাঙা টিনের পাশে হাত বাড়িয়ে উদাসীন, তার অসুন্দর মুখের শীর্ণতা আলোয় চিত্রিত হয়ে দেখা দিল। তিনটে মার্কিন সৈন্যের মাথায় এসে রোদ্দুরের ঘেরটা মিলিয়ে গেছে অথচ তারাও রইল আমার কাব্যের অন্তর্দৃশ্যে। কী বলতে চায় জানি না, কিন্তু এই একটি সমগ্র রচনা, বিশেষ অর্থে, কম্পোজিশন। ছবির ঘেরে অহৈতুক একতা। বোধনের আলোকে শুধুমাত্র দেখাতে পারলে দর্শকের মনে হবে, দেখছি। দৃশ্য সত্য, দিব্য সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্যে মিলিয়ে

অন্তর্গূঢ় আধুনিক মন খামকা কী দেখাতে চায়। তার ধারণাশক্তি একটি পড়ন্ত রৌদ্ররশ্মির অদ্ভুত পাত্রের মতো, তাতে কত-কিছুর অনিবার্য প্রবেশ, আধেয় যা-খুশির অধিকার। আমরা মেটাফিজিক্‌স্‌-এ পাওয়া সজাগ সচল ধ্যানী, যোগবিশুদ্ধ চোখে অলিগলিতে চেয়ে দেখি। রাস্তায় ঘাটে কবিতা ছড়ানো; সিঁড়ির ধাপে, ঐ পাশের দরজায় পিতলের কড়াটা পর্যন্ত ছবির অঙ্গ। বৃষ্টিতে লাল বারান্দা ভিজছে। এর রহস্য বিষম ছন্দে ধরা দিতে চাইল। বোঝানোর দরকার নেই। কেননা কাব্যের বাহিরে তা অসম্ভব।

"স্বর্গ হইতে বিদায়," কলকাতা শহরের আধুনিক নরকের সঙ্গে যুক্ত ক'রে লেখা যায়। স্বর্গের দৃষ্টি স্বর্গীয়, দৃশ্যের উপরই তার নির্ভর নয়। মনের বিশেষ অবস্থায় একটি আশ্চর্যের আভা এসে পৌঁছতে পারে। অথচ সংসারের কিছুই মেনে নিতে বলছি না। সাংঘাতিক শহুরে ব্যবস্থার জন্যে যারা পাপী তাদের বিষয়ে যথাসময়ে বলব, এমনকি প্রগাঢ় কাব্যের মধ্যেও প্রতিঘাত জাগবে যদি বেদনার তীব্রতা জীবনের মূলে পৌঁছে থাকে। ইতিমধ্যে কলুটোলার গলিতে কনে-বিদায়ের শাঁখ বেজে উঠল। বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার চোখে কোন সজল দৃশ্য আমারও কাছে স্বর্গীয় হয়ে উঠল। আমার কাব্যে লিখলাম একটা প'ড়ে-থাকা ভাঙা কলসির কথা, তার গায়ে এখনও একটু শাদা আল্‌পনা। ছোটো কাহিনীর সুরে খানিকটা পরিবেশ বাঁধা পড়ল। পাশে চলছেই প্রতিদিনের গলির জীবন। কে একজন কাকে বলল, মশাই, দেশালাই আছে?

বহু শত সহস্র কচ এবং দেবযানী পরস্পরকে শেষ কথা বলেছে হাওড়া প্লাটফর্মে, দেশকালহীন থার্ডক্লাশ কামরার সমুখে। ভেণ্ডর, হুইলর স্টল, বাষ্পাভ সরণীতে জেগে আছে কোন ঘুরিয়ে-নেওয়া দু-চোখের দৃষ্টি। কোটি বৎসর চলে গেল গাড়ির শেষ লাল গোলকের সঙ্গে। ঢং ঢং ঢং। সমস্ত স্বর্গমর্ত্যের গম্ভীর রেলোয়ে ধ্বনি তাতে। মায়ের একমাত্র হাবা ছেলে কোন দৈব খুঁজতে এসেছিল দু-বছরের কলকাতায়; একলা চলে গেছে সেই বিকেলে আসানসোল স্টেশনের মুখী হয়ে। গাড়ি আর ফিরল না। বৃহত্তর, বিড়তর, ঘোর আধুনিক ধারণা-শক্তিতে গাঁথা এই সনাতন কাব্য; ভূমিকায় থাকতে পারে টিকিট আপিস, এবং নানা জায়গায় ওঠা-নামার ভিড়।

একটা কবিতায় বলেছিলাম: জাপানী খদ্দর ভালোবাসি না, স্বদেশী বোমারুকেও নয়, এমনি আমার স্বভাব। আধুনিক এই-সব উগ্র অভিব্যক্তিকে মস্ত বাস্তব সত্যের অঙ্গরূপে সহ্য করি, বা করি না। কিন্তু এইটে জানি: বিচিত্র

বিশ্বে আমিও আছি, অনেকে আছে। অনেকের স্থান। সুখের বিষয়, এমন অদ্ভুত দুঃখের যুগেও স্বাধীন নারীকে দেখলাম, বড়ো পরিবারকে আপন উপার্জনে, চারিত্রশক্তির দৃঢ়তায় সে বহন করছে। এ-ও দেখলাম, যাদের কুলি বলা হয়, গুলিও করা হয়, তাদের মধ্যে ধর্মঘট জাগল, অন্যায়কে সহ্য না করবার একযোগী বিদ্রোহ। এর জন্যে তারা গুলি খেলেও বলব তা শুভচিহ্ন। ঝিমন্ত দেশে ভালো এই সংকট। আধুনিক কালের কথা বলছিলাম।

বিপুলা চ পৃথ্বী। তাতে নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি থাকেন, আমিও। বিশুদ্ধ তিনি আস্ত একজন মানুষ— নাম শুনেই বোঝা যায় বিসদৃশ। আর ব'লে কাজ কী? তিনিও থাকুন। এই যে হতাশ্চর্য আমার দুর্দিনের পৃথিবী, এর সম্বন্ধে আমার কিন্তু শেষ পর্যন্ত নালিশ নেই। আমি দ্রষ্টা। দেখে চলে যাব। কোথাও দৃষ্টির আনন্দ, কোথাও নয়। মন্দিরের বাহিরটা আমার সুদৃশ্য, ভিতরের যাত্রী-ব্যবসায়ী পাণ্ডা এবং বন্ধ হাওয়ায় উড়ন্ত বাদুড় পর্যন্ত আমার ধর্ম নাই পৌঁছল। মন্দিরের ওপর কী সুন্দর রোদ্দুর পড়েছে। যতদূর দেখছি আজ বাঁচবার এই অদ্ভুত পার্থিব পথ চলে গেছে। কোন বাস্তব পরিণামের দিকে কে জানে। দোকানের দাওয়ায় বসে কেবল দেখছি। তৃপ্তি মেটে না। অপার্থিব কী তা আমার জানা নেই, খোলা চোখের সামনে এই আমার অফুরন্ত দু-দিনের দৃশ্যকাব্য।

প্রগাঢ় বেদনাময় দৃষ্টির কোন এক মুহূর্তে এই সমস্ত ধারণাটা জেগেছিল। হাল্কা কথার চালে তার বক্তব্য আপনি আমাকে বলিয়েছে, বাধা দিইনি, চেষ্টাও করিনি।

আজ আমার ধারণার আকাশ বর্ষায় অভিষিক্ত। কেবল জল, আর হাওয়া, আর ভিজে সবুজ কীর্তি। আমার লাল বারান্দাটা ভাদ্রের বন্যায় ভিজছে।

কাব্যের টেকনিক

টেকনিক আছে ভাব নেই এমনতর দুর্ঘটনার সংবাদ কাব্যজগতে আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। শুনে ভাবি কথাটা সম্পূর্ণ বোঝা গেল না। লণ্ঠন আছে আলো নেই, বাক্স আছে জিনিস নেই, দড়ি আছে বালতি নেই, এইরকম কিছু আছে অন্য কিছু নেই, বা আছে, এমন ব্যাপার বস্তুজগতে ঘটেই থাকে। টাকার থলিটা আছে টাকা নেই এ তো আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা। এ-সব ক্ষেত্রে তেল বা আগুন যোগানো (বা সল্‌তে, সে যাই হোক), বাক্সে জিনিস ভর্তি করা, দড়ি-বালতির যোগ খাটিয়ে জল তোলা ইত্যাদি অসাধ্য নয়, কিন্তু প্রাণের জগতে প্রাণ নেই অন্য কিছু আছে বলাটা বিসদৃশ ঠেকে। কারণ তার অর্থ, কিছুই নেই— কথাটা কম-বেশির কথা নয়, একেবারে নেই-এর কথা। আঙ্গিক আছে ভাব নেই বলাও সেইরকম। অঙ্গ আছে প্রাণ নেই এই খবরটার তাৎপর্য দুটো হতে পারে— দেহটা জন্মমৃত, নয়তো প্রাণ এসেছিল কিন্তু চলে গেছে। যে-কবিতা প্রাণই পায়নি তাকে বিশ্লেষণ করবার দায়িত্ব সমালোচনার বড়ো মহলের নয়, ব্যবচ্ছেদ বিভাগের। কবিতায় প্রাণ এসেছিল অথচ চলে গেছে এরকম দুর্যোগের কথা কেউ জেনে থাকেন তো সাহিত্যের ভৌতিক বা ডিটেক্‌টিভ দপ্তরে খবর দিন। আমাদের কাজ যা হয়েছে, আছে, যা একই সঙ্গে প্রাণ এবং দেহ, তাই নিয়ে। সাহিত্যের প্রাণজগতে অঙ্গ এবং আঙ্গিক দুই এক-সঙ্গে থাকে। ভাব-রূপ-প্রাণ নিয়ে সাহিত্যের অখণ্ড সৃজন, সেই সৃষ্টিকে সামনে রেখেই সমালোচনা।

আকার এবং প্রক্রিয়া এ দুটো জিনিস প্রাণজগতে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে প্রকাশ পায়। রূপের মধ্যেই প্রাণের ইচ্ছা নিরূপিত, সেই ইচ্ছাকে পৃথক করতে গেলে রূপও ধ্বংস হবে। শুধুমাত্র রূপ, প্রাণের প্রয়োজন তাতে নেই, এরকমের উৎপত্তি জৈবজগতে মিলবে না। পুষ্পিত ইচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গেই কোরকের অভিব্যক্তি, সমস্ত ফুলের পরিণতি। বর্ণ সৌরভ রেখার সৌষম্যে ফুলের প্রয়োজন বিলোপ হয় না, সাধিত হয়। জুঁইফুলের অন্তর্লীন ভাবনা তার বিশিষ্ট রূপের উদ্ভাবনায় সহজাত। কাব্য যেখানে প্রাণবস্তু, অর্থাৎ কাব্যপদবাচ্য, সেখানে রূপ আছে ভাব নেই

এমন হতেই পারে না। লিরিকের আশ্চর্য ভাবকে তার প্রকাশ থেকে আলাদা ক'রে দেখবার কি উপায় আছে? ভাব নেই কিন্তু কবিতার রূপ আশ্চর্য এমন হলে রূপের আশ্চর্যতাই থাকে না। বিশেষণটা ওখানে অপ্রযুক্ত।

যাঁরা আধুনিকদের টেকনিক সম্বন্ধে উৎসাহী অথচ তাঁদের কাব্যে ভাবের অভাব নিয়ে ক্রুদ্ধ হন তাঁদের আসল বলবার কথা এই যে টেকনিকও হয়নি। সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করব। ভাবের দোহাই দিয়ে প্রকাশের অভাবকে ক্ষমা করাও সমান নিরর্থক। এমন কবিতা পড়িনি যার কাব্যভাব মহান্ ঐশ্বর্যময় অথচ আঙ্গিক পূর্ণাঙ্গীন নয়। সে-স্থলে ভাব কথাটার অর্থ কী তা জানি না। কাব্যের ক্ষেত্রে ভাবও শিল্পিত হয়ে দেখা দেয়, নয়তো তার প্রকাশ হয়নি। যা প্রকাশিত হয়েছে তাই নিয়ে বিচার। ভাষা ও ছন্দের শরীরে সমগ্র কাব্যের প্রকাশ। যোগী বা পলিটিশিয়ান বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাব্য লিখেছেন— কাব্য হয়নি কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ— এ দাবির কোনো উত্তরই নেই। সাহিত্য-সমালোচনায় প্রকাশই সৎ, অর্থাৎ যা সত্যই প্রকাশিত— ধার্মিক যদি অতিরঞ্জিত ভাষায় আত্মবিস্তার ক'রে থাকেন তাহলে সাহিত্যধর্ম রক্ষা হয়নি; ধর্মের অন্য প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর। আধ্যাত্মিক সনেট পদার্থটা যদি ভালো সনেট না হয়ে থাকে তো সেটা আত্মিকই নয়— কেননা জীবন্ত সনেটের আত্মা এবং অবয়ব অবিচ্ছেদ্য— এবং সেই কারণে তার আধ্যাত্মিক মূল্যও শূন্য।

টেকনিকের কথা। অন্য কোনো শিল্পের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক— কেননা সর্বদা ভাষা ব্যবহার করি ব'লে ভাষার শিল্প, যা নিয়ে সাহিত্যের প্রকাশ, সে-সম্বন্ধে ভুল তর্ক ওঠে। সংগীতের ভাব আর সংগীতের ধ্বনি দুয়ের যৌগিক শ্রুতিই সংগীত। বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখার উপায় নেই। সাংগীতিক ভাব প্রায় নেই অথচ শব্দের ইন্দ্রজাল অতি আশ্চর্য এমন উক্তির একমাত্র উত্তর এই যে সেরকম বাজনায় শব্দের মাকড়সার জাল নিশ্চয় আছে এবং তা অত্যন্ত অশ্রাব্য, তার প্রশংসা করা চলে না। যেখানে ধ্বনির ঐশ্বর্য, সেখানে ভাবেরও আশ্চর্যতা; শুধুমাত্র শব্দের বিন্যাস বিস্ময়কর নয়, ক্লান্তিজনক, কুশলের অভাবে সেখানে নিরাশ্চর্য কৌশল। যদি আঙুলের কৃতিত্ব নির্দেশ করা হয়ে থাকে তাহলে মেজরাফের বাহার এবং শেষ পর্যন্ত সেতারীর শৌখিন চেহারা অথবা গায়ের আধুনিক গেরুয়াকে সংগীতের বিচারে মূল্য দিতে হয়। সুরের জগতে তার দাম নেই।

কবিতার আলোচনায় লেখকের ছান্দসিক কসরতকে বাহবা দিয়ে ভাবের গুণপনায় শূন্য মার্কা দেওয়ার মনস্তত্ত্ব একই। ছন্দ আশ্চর্য হবার উপায় নেই যদি তার মধ্য দিয়ে কাব্যের আশ্চর্য ভাব ছন্দিত না হয়ে থাকে; ভাবের তরঙ্গেই ছন্দ। উর্বশী কবিতা ছন্দে-ভাবে অভিন্ন পরমসৃষ্টি ব'লেই আমাদের মনে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ এনে দেয়, সে-স্থলে ছন্দ ও বিষয়বস্তুকে স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ ক'রেও কাব্যের যৌগিক রহস্যে নিবিষ্ট হওয়া যায়।

আসল কথা আজকের দিনে কাব্যালোচনায় টেকনিকের অথবা বক্তব্যের ঐকান্তিক নিন্দা প্রশংসা দুয়েরই মূলে আছে সমগ্র কাব্যের মূল্যবিচার করবার প্রচেষ্টা। সমালোচকদের প্রকৃত লক্ষ্যস্থল আধুনিক কাব্যের আঙ্গিক বা বিষয়বস্তু নয়— কলমে তাঁরা যা-ই লিখুন— সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার মূল প্রবণতা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠেছেন। ভাব ও ছন্দের নবীন যুগ্মতায় সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপ দেখা দিচ্ছে এ-কথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। নূতন সামাজিক তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের প্রভাব এই সৃজনীধারাকে বেগবান প্রসারিত করেছে। কিন্তু নবীন সাহিত্যের মূল প্রেরণা সেখানে নয়; শাশ্বত প্রাণের সঙ্গে আধুনিক প্রবণতার যোগ কোনখানে তার সন্ধান জানা চাই। টেকনিকের পরিবর্তন যুগ-মনের পালাবদলের সঙ্গে কী ভাবে যুক্ত তারও বিশ্লেষণ করবার সময় এসেছে। সামান্য একটা কথা— রিক্‌শওয়ালা— কবিতায় ব্যবহার করতে হলে প্রাচীন ছন্দের ঘনঘোর কাঠামোতে কুলোয় না। অথচ রিক্‌শওয়ালা যখন বিশ্বজগতে আপন অস্তিত্বের অধিকারে বর্তমান তখন কাব্যজগতে তার স্থান আছেই। আজকের কাব্যে ছন্দের টেকনিক ও ভাবের অনুভূতি যে-সকল অনিবার্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তার কোনো অতি সুলভ ব্যাখ্যা আর চলবে না। বিদেশী অনুকরণ বা কেবলমাত্র আঙ্গিকের অতিচেতনাকে দায়ী ক'রে কাব্যের মূল সৃজনীক্রিয়াকে বিস্মৃত হলে সাহিত্যের প্রকাশে শাশ্বত এবং অভিনবের নব-নব রূপপর্যায়ের রহস্যকে অ'' ণ! বিস্মৃত হব।

কখনো মনে হয়েছে কাব্যের সৃষ্টি মুখ্যত প্রাসঙ্গিক,— অর্থাৎ জীবনের বিচিত্র প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গকে আপন অলোকচ্ছায়ায় প্রতিফলিত ক'রেই কাব্যলক্ষ্মী অবতীর্ণ হন। মানুষের সমাজ যে সময়ে বিশেষ বেদনার পীড়নে অনুকম্পিত, তখন কাব্যকেও আরো-ই স্পষ্টত সেই বেদনার ছন্দে চঞ্চল, সেই পীড়নের রঙে রঞ্জিত দেখলে যেন সাহিত্য সম্বন্ধে মানুষের দাবি পূর্ণ হয়। এখন ব্যাপকভাবে বেদনার যুগই চলেছে।

বলা বাহুল্য কাব্যসৃষ্টির বড়ো একটি ধারা সামাজিক চলন্ত স্রোতের সঙ্গে জড়িত, প্রবাহিত। যাকে আমরা বলি সুখ দুঃখ, যাকে বলি ঘটনা, তাকে সাহিত্যের উপকরণ মাত্র নয়, প্রকাশের প্রধান একটি আশ্রয় বলা চলে। অথচ আমরা জানি প্রত্যেক শিল্পেই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অধিক এমন কিছু আছে যাকে ঘটনা, বা আঘাত-অভিঘাতের চেয়ে অন্য কিছু ব'লে বর্ণনা করতে হয়। নীতিবাচনিকেরা বলবেন চিরন্তন নীতি-কথাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রধান বক্তব্য, প্রাত্যহিক প্রসঙ্গ তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপন মূল্য পায়। ভালো-মন্দের একটি মুক্ত শাশ্বত ভূমিকা উজ্জ্বল প্রকাশিত হলেই মানুষের কাহিনী আপন বর্ণময় রূপ নিয়ে সাহিত্যে দেখা দেয়। উদ্দেশ্য এবং মানবনীতির অপরিবর্ত স্বরূপকে যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে এক ক'রে দেখেছেন তাঁদের এই যুক্তির সপক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা কঠিন নয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সবটাই এতে ধরা পড়ে না, যেমন পড়ে না নিছক কল্পনাবিদ্ সমালোচকের জালে। শেষোক্ত সমালোচকশ্রেণী ময়ূরপুচ্ছ, মাছরাঙা বা অদ্ভুত রঙিন সূর্যাস্তের সম-পর্যায়ী সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলবেন, ঐ দেখ পর্যাপ্ত ঘুমের রং, স্বপ্নের রং, এমনকি চিত্তবিকারের অপরূপ বর্ণশীলতা নিয়েও কাব্য হতে পারে। হতে পারে, এবং হয়েছে সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই।

আজ আমরা বলব সাহিত্যের আর-একটি রূপ আছে যা নিঃসংলগ্ন, যা বর্ণাঢ্য কিন্তু শ্রেয়োধর্মী— অথচ সেই শ্রেয়তা সমাজের উপস্থিত ভালো-মন্দের সঙ্গেও স্পষ্টভাবে যুক্ত নয় তো। কথাটাকে হেঁয়ালির আকারেই রাখা ভালো— এবং ঠিক যে-ভাবে কাব্যের ঝংকার, গল্পের ভঙ্গি নিয়ে আ[illegible]দর্শের ছবিটি

দেখা দিয়েছে সেই ভাবেই আজ তাকে এখানে উপস্থিত করি। সমালোচক এবং বিশেষ ক'রে শিল্পসৃষ্টিবিষয়ে যাঁরা দক্ষ বিচার করুন তাঁরা। আমার বক্তব্য তবে শুনুন .

হে অসংলগ্ন প্রেয়তা
সংসারদুঃখ হতে ভিন্ন
সুখাশ্রয়চ্ছিন্ন, তুমি
অহৈতুকী প্রেয়তা।

সংসর্গহীন
এল মুহূর্ত,
আদিম আলোকে উড্ডীন।
বাঁধি বুকে
ধ্যান-কৌতুকে,
হে আকাশ জ্যোতিরাসীন
অমূর্ত।

রেখাঙ্কিনী,
কথাবাহিনী,
রাগিণী, তুমি উচ্ছলা
সহসা চক্ষেব জলে উজ্জ্বলা,
অপরিমেয়তা—
হে অসংলগ্ন প্রেয়তা॥

দুর্যোগের সাহিত্য

এ-কথা স্বীকার করতেই হবে ষোলোই আগস্টের পরও ঘাসের রং সবুজ আছে। আকাশ প্রত্যক্ষ নীল। সূর্যসনাথ বসুন্ধরা অদৃষ্টের মহাবর্ত-পথ ভোলেনি। খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা কেউ বলেননি বাংলায় বা বেহারে বৃক্ষলতা নদী শস্য-ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক ভাষায় কোনো বিকল্প ঘটেছে। দশই অক্টোবরের অপরাহ্ণ অতিক্রম করেও প্রাত্যহিক অরণ্যে প্রান্তরে মৃত্তিকার ছন্দোচ্চারণ চলেছে, মেঘের ছায়া পড়ে, ধানের শীষে বা সুপুরি-নারকেলের কুঞ্জে রক্তিম আয়োজন হাহাকার আক্রমণের প্রত্যুত্তর নেই। সৃষ্টিলোক ধ্রুব শক্তির প্রশাসনে প্রাণিত, চন্দ্ররথা রজনীর স্বচ্ছ তারাগুলির দিকে চেয়ে কলকাতা শহরেও তা বুঝতে পারি।

মানবসংসারে সাংঘাতিক ঘটনাপরম্পরার কালেও পার্থিব ভূমিকা আকাশিকা বদলায়নি।

হঠাৎ মনে হয় বিশ্বভুবন নির্মম উদাসীন। প্রচণ্ড নিদারুণতার দিনেও ভূর্ভুবঃ স্বঃ -এর এমন অবিচলতা। প্রাণীজগতেও প্রবৃত্তির পর্যায়ে জীবধারা চলেছে, প্রজাপতি উড়ছে, উজ্জ্বল হাওড়া ব্রিজের ঊর্ধ্বে ডানা মেলে চিল স্পন্দিত, হানাহানির পথের ধারেই নিঝুম দুপুরে গোরু চরছে। যেন কোথাও কিছু ব্যতিক্রম ঘটেনি। মানুষের সংসারেও শিশু হাততালি দিয়ে উঠছে, ছোটো মেয়ে সুবিধা পেলেই পুতুলকে নতুন কাপড় পরায়, ক্ষুধা তৃপ্তি মনন ভাবনার চিরাচরিত পদ্ধতি উত্তেজনার মধ্যেও মূলে অবধারিত।

যা চিরদিন আছে তার তুলনায় যা আজ বিষমভাবে ধ্বংসমুখর তার স্থান কোনখানে তা জানতে হবে।

অত্যন্ত স্পষ্ট মনে যখন বিশ্বব্যাপারকে সমগ্র সত্যে দেখবার প্রয়াস জাগে তখন উপস্থিত দারুণতাকে মানুষ অগ্রাহ্য বা ভয় করে না, সত্তার জোরেই নিরস্ত পরাজিত করতে উদ্যত হয়। কাব্যের চরমশক্তি সেইখানেই। সমগ্রের বোধে খণ্ডকে, সৃষ্টির পটে প্রলয়কে সে নির্ধারিত করে। মানবসমাজেও ভূকম্প জাগে, শুধু মাটির নীচে নয়; যেমন জীবলোকালয়ে তেমনি মনোলোকেও সংক্রামক ব্যাধি হঠাৎ চতুর্দিকে দেখা দেয়, কিন্তু স্বাভাবিক শরীরমনের মানদণ্ডেই তার বিচার। নিরাময়তার বিধান হয় প্রাণের শুভশক্তিযোগে। আশ্চর্য এই যে

প্রাণের পরমাকাশ কোনো সময়েই সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় না। অসহনীয় বেদনার ক্ষেত্র ছাড়িয়েও দিগ্‌বিলয় চোখে পড়ে, আনন্তিক দিগন্তের শাঁখ বাজছে ভ্রাতৃহত্যার পরিবেশেও তা কানে শোনা যায়। সাহিত্য তাই বলে, দেখো শোনো। কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, সবকে নিয়েই। সমাশ্রিত বোধ জাগানো চাই।) রবীন্দ্রনাথের গান কানে থাকলে অন্যায়কে লেশমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া চলে না : গ্রামের ছবি চোখের সামনে রেখে বীর চলে দেশ বাঁচাতে, দেখতে পায় সোনার ধান ফলেছে কুটীরের পাশে, হেলে পড়েছে শিউলিগাছের ছায়া। আর কি মাথা নিচু হয়? পকেটে হয়তো আছে আর্টিস্টের আঁকা চিত্র, দেখেই মন উঠল জ্বলে, কে জানে বইখানিতে আছে দেশের কোন চিরন্তন কাহিনী। এমনি ক'রে প্রাণের যোগে স্রস্ত হয় অবসাদের ভার, আত্মীয় বিশ্বের অমোঘ দাবি মনকে মৃত্যুহীন শক্তি দেয়। এইজন্যেই ছবি, এইজন্যেই গান। জীবনমরণের অভিযানে যেতে-যেতে আমরা চাই সর্বার্পিত প্রাণের অখণ্ড স্বরূপকে : হারাবার ভয় আর থাকে না।

হানাহানির পর্বকালে সাহিত্যে যদি হন্তার প্রতিধ্বনি জাগে তাহলে বুঝব চরম পরাভব হ'ল। বাংলার বদলে বেহার, বেহারের উত্তরে অন্য কোনো চিৎভূমি— মহামরণের যজ্ঞরচনায় যাঁরা বাক্যে বা সংঘাতে উত্তরোত্তর সমাধি-রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত করেন তাঁদের কোন-জাতীয় মানব-বীর বলব? বাংলার সাহিত্যে সেই বীর্যের কীর্তন না হোক।

সাহিত্যে সেই পৌরুষের কথাই আছে যা কল্যাণের সহায়, আশ্রিতের রক্ষক, প্রাতিবেশিক ধর্মে যা নরোত্তম। "দুর্জনেরে রক্ষা করো, দুর্বলেরে হানো"— এমন কথা কবি বলেননি। অথচ দেখতে পাই শত-শত অসহায়কে বিনাশ ক'রে পাপের প্রতিঘাত জানানোকে নানাবিধ জনমত আজ সমর্থন করতে চায়। দুর্জনের দিকে মঙ্গল শক্তি নিয়োগ না ক'রে যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাদের উপর স্বপক্ষীয় বা অন্যদলীয় প্রতিশোধবৃত্তির চর্চা ক'রে পাড়ার দলপতি বলছেন, আর এক কাপ চা। শিক্ষার মঞ্চে, সাহিত্যের পুলিসে, রাষ্ট্রের দরবারে এই-জাতীয় আদর্শবাদ ব্যাখান করছেন উষ্ণ ব্যাখ্যাতা, তাঁদের অনেকে আর্তত্রাণের জন্যে তার চেয়ে বেশি কিছু করেননি। শ্রোতার দল অনেকেই পরিতৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন, হয়তো বাড়ি গিয়ে আরো এক কাপ চায়ের সহযোগে বিশেষ পক্ষের তপ্ত সমালোচনা উপভোগ করেন। এই সময়ে প্রশ্ন জাগে, সাহিত্যের কাজ কী?

সাহিত্যের কাজ আজও যা কালও তাই ছিল। অর্থাৎ সত্য বলা, সবখানি

সত্য বলা। নিজের জীবনের অন্তর্যোগে নিঃসৃত যে-প্রকাশ সেই আন্তরিক সর্বাস্তিক সত্য ফুটিয়ে তুলতেই লেখকের সাহিত্যিকতা।

তাই যখন আকীর্ণ সংসারের বিষময়তাকে স্বস্থানে স্বীকার ক'রেই কবি বলেন আকাশ নীল, ঘাস সবুজ, মানুষ সত্য, তখন তিনি বিলাস করেন না। সমগ্রের স্বাদ তিনি অমৃতপাত্রে বহন করে আনেন। তখন নামা যায় মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে, পশুত্বে ধর্মান্তরিত হওয়ার চেয়ে প্রাণ দিতে পণ করি, মৃত্যুর চেয়েও যা বিনাশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় মনুষ্যত্ব। সেই কথা বলে সাহিত্য। দুর্জনকে হানার চেয়ে বড়ো কথা তখন জাগে; ত্রাণশক্তির মূল কোনখানে তার বিচিত্র উদ্ভব সন্ধানে মন এগিয়ে যায়। যা কোমল, যা করুণাময়, যা বরেণ্য তাকে বর্বরতার দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখলে আনন্দনীয় অভীত তেজে দাঁড়ায় সেই বীর যে দয়াধর্ম মানে, যে পাপের উত্তরে পাপ করে না। মৃত্যুভয় লোকভয় রাজভয় সাহিত্যের ধর্ম নয়।

এই মুহূর্তেই ভোরের অরুণশ্রী সুন্দর। বিশ্বসময়ের মধ্যে নরঘ্নি সময়ের স্থান স্বল্পায়ু, মানুষের মন্বন্তর তীব্র হয়েও তার হাওয়া ফিরে শান্ত হয়। প্রত্যক্ষ উন্মাদনার চিত্র সাহিত্যিক ঘটনায় রূপ নেবেই, কিন্তু উন্মাদনাকে দেখাতে হলে মানসলোকের বৃহত্তর পরিচয় দিতে হয়। সেই পরিচয় সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক তারই আহ্বান এসেছে নূতন যুগে।

যেখানে অম্লান অস্খলিত সৃষ্টির ছন্দে চলেছে বিশ্বের প্রকাশ তারই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাণসংগ্রামের অমোঘ অস্ত্রগুলি বাংলা দেশকে দিয়েছিলেন তিনি। প্রাণের অস্ত্র, শুভের অস্ত্র, সম্মানের অস্ত্র, রুচির অস্ত্র। আমাদের বলবীর্যের মন্ত্র আছে সেই সাহিত্যে।

মানব-ইতিহাসের চূড়ান্ত পাপের ক্ষেত্রভূমিতে প্রত্যন্ত পল্লীপথে চলেছেন একটি মানুষ। সর্বাস্তিবাদ তাঁর ধর্ম, সত্যের করুণা তাঁর আচরণ। জীবননাট্যে এই যে গান্ধী মহাত্মার আবির্ভাব দেখলাম তার আখ্যান দিতে গেলে কি সাধারণ কথাও কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে না? এতবড়ো নাটককে যিনি রচনায় বাঁধবেন কোথায় সেই নাট্যকার? কোনো একদিন নূতন রচনার ধারায় স্বতঃপ্রকাশী প্রতিভা বাংলাদেশে দেখা দেবেই। দুর্যোগের সাহিত্য তখন সমস্ত অসত্যযোগীকে অতিক্রম করে মেঘনা নদীর প্রান্তবর্তী গ্রামের ছবি নিয়ে মূর্ত হবে, শুনতে পাব সুপুরিগাছের মর্মর, দেখব বাংলাদেশকে যেখানে মানুষে-মানুষে চিরদিনের সমাজ রচিত।

য়ুরোপীয় সামরিক সাহিত্য

উড়ো তর্ক

সদ্য শোণবর্ণে ছবি আঁকা শক্ত। য়ুরোপীয় সাহিত্য কাঁচা নৃমাংসের সন্ধান পেয়েছে, হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ…ইত্যাদি। এমন অবস্থায় শিল্পবৃত্তিটাকেই পান্‌সে মনে হয়, ডগ্‌ডগে ঘটনার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সাহিত্যের কর্ম নয়। চরম বেদনার তত্ত্ব যুদ্ধকালীন রচনায় নিশ্চয়ই আছে, সেখানে মাথা নিচু করতে হয়, কিন্তু অন্য কারণে। সাহিত্যিক কারণে নয়। খুনের সঙ্গে খারাবির একটা যোগ প্রচলিত ; সাহিত্যে এই যোগাযোগ প্রবল হলে উষ্মা হয়, উৎসাহ কমে। সদ্য বেদনাকে শিল্পে সার্থক অনুরঞ্জিত করতে সময় লাগে ; গরজে ফোটানো পুষ্প হয় সদ্যঃপাতি, হোক না লাল।

লাল রক্ত সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তিটা স্নায়বিক, সাহিত্যিক নয়। বাস্তব-ভীতির প্যাথলজিকে টঙে চ'ড়ে আরাধনা করো ; নিত্যনূতন পলায়নী সৃষ্টিতত্ত্ব মাথায় সুন্দর গজাবে। বেশ ভালো আছ। নীলরক্তবান সাহিত্যকে লালে ভিজিয়ে খানিকটা তাজা করা গেছে, রাঙা অভিজাতসাহিত্য পরিদৃশ্যমান—কিন্তু তোমাদের মন মজল না। কৃষ্ণের ধ্যানে অচল থেকো, রসাতলের পুণ্য পাবে। আমরা রক্তিমের মত্ততাকেই পছন্দ করি, অন্তত ফ্যাকাশে বর্ণহীনে পাওয়া এই দেশে। রাঙা কাব্যের নমুনা কি নয়া বাংলায় পাওনি ? বিদেশী সাহিত্যও তোমার টেবিলে দেখছি স্মরণ হয়।

সে-কথায় আসছি। কিন্তু উজ্জ্বল রুধিরের ধ্যানমূর্তিকে বৈদিক প্রদোষেও দেখতে পাই। চম্‌কে উঠো না। সেদিন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের চমৎকার লেখা পড়ছিলাম : অপ্সরার উৎপত্তির ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃতাংশ তোমাদের গদ্যকবিতায় ছকে নিলে এইরকম দাঁড়ায় :

লাল আভার অদ্ভুতভুবন। জবা লাল, বান্ধুলি লাল, রক্তচন্দন তপ্ত কাঞ্চন॥ জান্‌লায় লাল হাওয়া ঢোকে আমার রক্ত চেনে ওকে বেলা রক্তিম সাড়ে ছটায় হঠাৎ আর্দ্র আকাশে রটায় স্নিগ্ধত্রিদিবভাস্বরা॥ হে অপ্সরা॥

…কমতি কাগজের দিনে গদ্যকবিতাকে একটানা লিখে যেয়ো— মনের মধ্যে ঢেলে সাজিয়ো না হয়। এটা কি ষোলো আনা লাল কাব্য নয় ? ধ্যানের সঙ্গে রুধির : এই তো নবীন কালের গান্ধর্ব।

রেখে দাও মিষ্টিক রক্তের প্রলাপ। চোখ-ফেরানো প্রাচীন তোমাকে পেয়েছে— তবু বলবে তুমি কম্যুনিস্ট? সেদিন কফি হাউসে তোমাকে দেখছিলাম; মিসেস্ রায়ের টেবিলে ব'সে—

•

কথাটা যেন ঈষৎ ব্যক্তিগত শোনাচ্ছে— দেখ্‌ছি একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছ। কেন, কম্যুনিজ্‌ম্ বিশ্ববহির্গত প্রক্রিয়া নাকি? তাকে মানলে অন্য সবকে ত্যাগ করতে হবে? অতখানি না-এর মুখে খড়কুটো বেঁধে এ কীরকম নীড় চাও— অথচ কামনা করছ আসন্ন ঝড়কে। তর্কটা না হয়—

শোনো, শোনো। বর্নর্ড্ শ' বলেছিলেন না, মার্ক্‌স্ পড়লে কিছুই পূর্ববৎ থাকে না: একেবারে নতুন আরম্ভ করতে হয়। সেই কথাই বলছি।

আমিও মানি। কিন্তু নতুন আরম্ভ করা মানে শূন্যে দাঁড়ানো নয়। সাহিত্যের মাটি বহুযুগের পলিতে তৈরি, তবে তা দৃঢ়; তারই উপর নূতন ভিত গড়ব। মাটির তলে আছে দান্তের হাড়, এখন তাকে হীরের হাড় বলতে পারো, উজ্জ্বল কঠিন— যদিও অদৃশ্য গ্যয়টের দূরনিবিষ্ট দৃষ্টি চূর্ণ-চূর্ণ শাশ্বত হয়ে মাটিকে হিরণ্ময় ক'রে রেখেছে। য়ুরোপীয় সাহিত্য আজ তাঁদের ভাষা-ভাবনায় গাঁটে-গাঁটে স্তম্ভিত, তাঁদেরকে অস্বীকার করার মতো আত্মবিলোপ—

সোভিয়েট রাশিয়া তা করেনি।

তাই বলছি। কেননা সেখানে কম্যুনিজ্‌ম্ বড়ো ইতিহাসের ভূমিকায় উদ্‌গত। রাশিয়ায় একটি অখণ্ড মানবসত্তার বোধ বহুবিবিধ সাহিত্যকে অধিকার ক'রে আছে, যেমন তার দেশ প্রশস্ত নগরে প্রান্তরে গ্রামে উপনিবেশে প্রকাণ্ড সাংসারিক; কোটি বৃক্ষের সমবায়ে একই অরণ্য। এমনতর বিপুল ঐতিহাসিকতা নূতনে-প্রাচীনে মিলিয়ে মহাকালীন; যদি বা ছেদ পড়ে, হঠাৎ সমস্ত জনশক্তির প্রকাশ আবার ভিতর থেকেই ঠেলে বেরোয়। ওদের সাহিত্যে প্রাচীনের উপাদান প্রবল।

এর মধ্যে মিষ্টিসিজ্‌ম্ কোথায়?

কেন, ডস্টয়েভ্‌স্কি পড়নি? রুশীয় সাহিত্যে রক্তের ধারা কোন গভীর অবচেতনায় স্পন্দমান বলতে পার? কেবল কি বায়োলজির রক্তকে তাঁরা চিনেছেন? চিরন্তন ম্যুজিকের হাড়ে-হাড়ে সঞ্জাত হয়েছে বেদনা, সেই গল্পের বেদনা আদিম। যদিও ঘটনার দারুণতাও পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্ণিত। রক্তসন্ধ্যাকে পেরিয়ে তাঁদের দৃষ্টি মানবাকাশের অকল্প সত্যকে পেয়েছিল। শলকভ্ নিকট-

বর্তী কালের তাণ্ডবে ঘূর্ণিত হয়েও মানবচরিত্রের শিকড়ে আশ্রয় পেয়েছেন— সেখানে বিরোধের নীচেও মাটি। ক্ষুধাতৃষ্ণার পৃথিবীকেই ফোটাব, কিন্তু আধার চাই। শলকভের লেখায় প্রসার আছে, উদ্দেশ্যের চেয়ে সেটা বড়ো। দুর্গতের বিদ্রোহ তাই অজেয় তেজোমূর্তি নিয়ে দাঁড়াল তাঁর লেখায়, ডন্ নদীর ধারে-ধারে।

শলকভের পরবর্তী লেখা—

বিশেষ পড়িনি। সম্প্রতি "Hate" নামে তাঁর এই যুদ্ধের ক্ষুদে গল্প পড়লাম। কিন্তু উতরোয়নি। যে-কোনো পক্ষের রিপোর্টর এইরকম লিখতেন— লিখে থাকেন— তার জন্যে শলকভের দরকার ছিল না। কাগ্‌জি লেখার এই দুর্গতি ; এমনকি প'ড়ে পুরো প্রত্যয় জাগে না। বোঝা যায় এমনতর উগ্র ব্যাপারে সব পক্ষই সমান : ওখানে মূল্যভেদের জায়গা নেই।

ক্রোধ, বিদ্বেষ, বধের অস্ত্র দু-পক্ষেরই ব্যবহার্য, কিন্তু তাই ব'লে মূল্যবিচার হবে না ?

ঐ স্তরে নেমে সাহিত্য চলে না। যেখানে জল্লাদি ক্রিয়াই একমাত্র, সেখানে শিল্পীর দরকার নেই। মোষ-বলির গীতিকাব্যও হয়তো একদিন হবে ; যারা ফ্যাসিজ্‌ম্-পন্থী এটা যেন তাদেরই ক্ষেত্র। হেমিংওয়ে যেমন ইস্পানী বুল্-ফাইট্-এর বর্ণনায় আরক্ত, উল্লসিত ; সম্প্রতি তিনি কম্যুনিস্ট হয়েও ঐরকম লিখছেন, কিন্তু তাতে একটা কথাই প্রমাণিত হয়।

কথাটা কীরকম শুনি।

উন্মত্ত সামরিকতা শিল্পের নয়, অন্য ক্ষেত্রে তাঁর মূল্য বিচার করো। আক্রোশ দিয়ে সাহিত্য হয় না, যেখানে রাগের আগুন আরো বড়ো আগুনকে জ্বালে সেখানে প্রকাশ। বেড়া আগুনে জ্বলে ক্ষুদে সাহিত্য ধিকিধিকি পুড়ছে, ধোঁয়াসুদ্ধ তাকে পাড়ায় আমদানি কোরো না।

য়ুরোপে যা ঘটছে, একই কালপর্বের তাগিদে তা এখানেও ঘটবে। সাহিত্যের আকাশটা তো ভূখণ্ডিত নয়। ঐ একটা জায়গায় হাওয়া চলাচল হবেই।

যেখানে হাওয়া বিষাক্ত তার চলাচল নাই হ'ল। না হয় এদিক থেকেই শান্ত হাওয়া বইবে। একে একে মধ্য-য়ুরোপের দীপ নিভল ; গর্জন উঠেছে

নিরুদ্ধ সভ্যতার শিবিরে। ইংলণ্ডেও জাগছে মানুষ-যন্ত্রের তীক্ষ্ণ-তান। সকলের কথা বলছি না। যাঁরা আজও আবহযুগের প্রসঙ্গকে আধুনিকে উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন তাঁদের কণ্ঠ এই মুহূর্তে শুনতে পাবে না। যুগধর্মী বলবে কাকে ?

যাঁরা এই যুগের বেদনাকে মহাযুদ্ধের প্রলয়পটে আঁকছেন, তাঁদের।

মহাযুদ্ধটাকে কেবলমাত্র এই ক'টা বছরের পরিধিতে দেখো না। কোন পক্ষ কাকে কতসংখ্যক মারছে তার হৃদ্‌বিদারক হিসাবটাও মহাযুদ্ধ নয়। অন্যায় এবং কল্যাণের লোকায়ত একটি মহাযুদ্ধ আছে, তারই দৃষ্টি দিয়ে তীব্র ঘটনার তলে-তলে মূল্যবোধ জাগে; পড়ো টলস্টয়ের মহাসামরিক উপন্যাস। শেষ ক'বছর ধরে সমগ্র য়ুরোপে দৃষ্টি আঁধিয়ে এল; শিল্পের ভঙ্গিতে গড়া হচ্ছে রক্তপঙ্কের পুতুল। তাতে লাল বা অন্যরঙা ক্যামুফ্লাজের বর্ণচাতুরী। খাঁটি কম্যুনিজ্‌মকে বন্ধক রেখে এই সস্তা শিল্পকে চালানো হচ্ছে। এরই অনুকরণ করতে চাও কি ?

এতবড়ো জগৎজোড়া ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে লিখবে কী ক'রে ? যেন যুদ্ধ নেই, মানুষ মরছে না—

বাদ দেবে কেন ? জোর ক'রে আনবারও কথা নেই। পুরোপুরি জ্যান্ত মানুষের চোখে-কানে প্রচণ্ড এই ঘটনা এমনিতেই রয়েছে, শত সূক্ষ্ম মনের তন্ত্রীতে বাজছে। ঘটনার ডঙ্কা না বাজালেই কি লেখা ব্যর্থ হবে ? প্রপাগাণ্ডা হ'ল সেই-জাতীয় হুংকার যা মনে পৌঁছয় না। কানের কাছে চীৎকার করলে ভদ্র মানুষ স'রে যায়, কণ্ঠে স্বর থাকলে আপনি শোনে। সেই ধ্বনির চর্চা করবেন সাহিত্যব্যবসায়ী। নিভৃত কারিগরি চাই যন্ত্রকে সাধতে। সেখানে হুকুম খাটবে না। অথচ দেখবে শিল্পী যদি খাঁটি হয়, ঘটনাও ভাষা পাবে; যদি বর্ণনা কোথাও বাদ পড়ে, বর্ণ তো থাকবেই। ভিতরের কথাটা যাবে কোথায় ? শিল্পীর ধর্ম সমাজসৃষ্টিরই অনুযায়ী, তার রূপকে ছাঁচে ঢালা যায় না যেমন যায় না সমাজকে ! অনুকরণের তাড়নায় এই কথাটা আমরা ভুলতে বসেছি।

শিল্প যদি সোজা কথা না বলে তবে তাতে শিল্পের যা-ই হোক, সমাজের কী হবে ? সোজা কথা—

সোজা কথা অনেক ক্ষেত্রে তির্যক কথা। ছবি-আঁকিয়ে জানেন রেখা-রংকে সর্বত্র সমান স্পষ্ট করতে গেলে কোনোটাই স্পষ্ট হয় না। কমিয়ে বাড়িয়ে মানিয়ে নেওয়াকে বলে ছন্দ। ইঙ্গিতে যে-কথা বলা যায় তার আঙ্গিক মানুষ চেনে। সমস্ত সমাজের বুকে ধক্ ক'রে ওঠে দুর্লভ বাক্য : নিঠুর গরজী তার সন্ধান জানে না। লেখামাত্র এই বাক্য সমাজের বুকে পৌঁছতে না পারে— কখনো বা পৌঁছয়— কিন্তু এখানে তাড়া দিয়ে ফল পাবে না।

এদিকে আগুন জ্বলতে থাক্— সবাই ব'সে থাকি বাণীর প্রতীক্ষায়।

ব'সে থাকবে কেন? খবরের কাগজে, গলার আওয়াজে, প্যাম্ফ্লেটে অনেক বালতি দরকারী বাক্য বর্ষণ ক'রে আগুন থামাবে। কিন্তু সেই বর্ষণের ধারা সাহিত্য নয়— অন্ততপক্ষে না হবারই সম্ভাবনা। বাক্যের চেয়েও স্টিরপ পম্প্ আরো কাজে লাগতে পারে।

তাহলে দেখছি য়েট্স্-এর দীক্ষা পুরোপুরি নিয়েছ। আধুনিক কাব্য-সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেছেন না, যুদ্ধের কবিতা ব'লে কিছু নেই? যেন মারী মড়ক মৃত্যুঘাতের মুখে শিল্পবুদ্ধি সংগত হয় না। দৈবিক মানবিক ভূকম্পের কালে আত্মরক্ষার উপায় খোঁজো, কলমটাকে মুদ্গরের মতো ঘুরিয়ো না। একের কাজ অন্যে হবে না। দুটোই ভ্রষ্ট হবে। ওয়েন্‌কে পর্যন্ত বাদ দিয়েছেন। এমনতর আইরিশ শিল্পগুরুকে—

মোটের উপর মানি। যদিও ওয়েন্-এর উপরে তাঁর বিচার ঠিক হয়নি। ওয়েন্-এর দূরত্ব ছিল; দূরত্ব তো স্থানের উপরেই নির্ভর করে না। মনের কালটা বড়ো। দেখলাম কবি স্পেণ্ডর্ সেদিন কথাটাকে সুন্দর বুঝিয়েছেন। মনে এবং সাম্প্রতিকে মিলে সাহিত্যের কাল। সেই কালকে সত্য প্রকাশ করতে স্পেণ্ডর্ থেকে গেলেন লণ্ডনে, বোমাবারুদের মধ্যেই চাকরি নিয়ে। অডেন্ গেলেন মার্কিনরাজ্যে। কিন্তু দু-জনের সৃষ্টিধর্ম একই কালের; সেই কালের চেতনা শিল্পীর মনে যখন জাগল তখন পালানোর কথাই ওঠে না, নিজের কাছ থেকে পালাবে কোথায়? কোন জায়গায় থাকি সেটা মুখ্য নয়। য়েট্স্ তো আয়র্লণ্ড্ এবং প্রতিবেশী দেশের সামরিক পরিবেশেই কাব্য লিখেছেন। যেখানে তিনি প্রকাশ্যে প্রসঙ্গধর্মী ছিলেন না, সেখানেও কালের প্রসঙ্গচেতনা তাঁর কিছুমাত্র কম ছিল না। জেনেশুনে যে-কারিগর বলেন গয়না-ই বানাব, এ-ও সমাজের কাজ, তাঁর সমাজবোধ অভাবাত্মক নয়। সমাজ-বিপ্লবের কালেও তো বিয়ে ভালোবাসা প্রীতির দান বন্ধ হয় না। সমাজের প্রাত্যহিকতাকে সুন্দর সার্থক করবারও ভার কবির; বিপদের তলে-তলে শক্তির মাধুর্য বইতে থাকে। সোভিয়েট দেশে গানও বন্ধ হয়নি, ছবিও না। আমি বলছি "উদ্দেশ্যহীন"

গানের ছবির কথা, গেরিলা আর্টের নয়। মিষ্টিক রচনার স্বাদ বীর্যসাধকেরা কম বোঝে না। তার মূল্য শাশ্বত মানবিক এবং সেই কারণেই মানুষের পক্ষে মূল্যবান।

মোটেই মানলাম না। আর্টের উন্মার্গ থেকে সবাই আজ নামছেন। মাটির সাহিত্য ফিরে এল। তোমাদের খ-পুষ্পের চাষ থামাবে না? মানসিক কুমড়ো-বেগুনে মনন দাও। লোকে খেয়ে বাঁচবে। কোথায় রইল রাসেল্-এর সূক্ষ্ম শান্তিকতা; জোড্-মিল্ন্-এর, এমনকি এলিয়টের নম্রন্যায়িকবৃত্তি? সবাই আজ কড়া উৎকর্ষের ব্যবসায়ী, বোঝা যাচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যটা জাগছে। যাঁরা জামা বদলেছেন তাঁদের হৃৎপদার্থও খানিক বদলে থাকবে। এই যুদ্ধে তো অডেন-স্পেণ্ডর-ডে. লিউইস্-এর দল—

ঠিক তা নয়। পাঁচমিশেলি লেখক যাঁদের নাম করলে তাঁরা দলীয় নন, বিভিন্ন; এবং শক্তির ক্ষেত্রেও অসমপর্যায়ী। নূতন কবিদের অনেকেই পূর্বে ক্ষাত্রধর্ম প্রচার করেছেন। তবে শত্রুপক্ষ তখনও স্পষ্ট নির্ধারিত হয়নি। তাতে কাব্যের দৃষ্টি স্বচ্ছতর ছিল। আজ বিশেষ দেশ বা সভ্যতাকে নাম ক'রে কাব্যে মারা হচ্ছে। যেন সেই ভৌগোলিক খণ্ডের জনসাধারণ বিধাতার স্বতন্ত্র পাপ-সৃষ্টি; তাদের কোটি ধ্বংস করলে সাহিত্যের পুণ্য। কলমের স্বর্গলাভ। শত্রুকে কোনো ব্যক্তি বা দেশের ঘাড়ে চাপাতে পারলেই দেখি কাব্যে গুলি চলে, বুলি বাড়ে। শত্রুর কী হয় জানি না, সাহিত্য মারে নিজেকে। একেই বলি, সাহিত্যিক হারিকিরি।

শত্রুকে মারব না?

সাহিত্যের দিক থেকেই বলি। আজকের শত্রুপক্ষ পরদিনের বন্ধু— চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। পশুকে দমন করতে হবে— তারই নাম শত্রুপক্ষ— তার সন্ধান অত সহজে মেলে না। চাই শিল্পদৃষ্টি, যা অনেকটা দেখে, পলিটিশিয়ানের চোখ-রাঙানিতে কোন পশু ধরা পড়ে? আত্ম-সন্ধানী কবি নিজের বুকেও লুকোনো শত্রু খোঁজেন,— এবং এই কারণে অভ্রান্ত স্বপক্ষের তর্জন তাঁর কণ্ঠে বেরোয় না। বেরোলেও তা আর যাই হোক সংগীত হয় না। পছন্দসই দেশকে বা দলকে সমগ্র মানবসত্যের প্রহরী বানিয়ে নরমেধের চর্চা— এর অমূল্যতা সাহিত্যে খুঁজো না। বিদেশী সাহিত্যের যাঁরা বড়ো তাঁরা দলকে—

তাঁরা তো দলবদ্ধ সংহারী কাব্যও—

ব্যাধি যতই উৎকট হোক, য়ুরোপী কাব্য তার চেয়ে বড়ো। যে-কবিদের নাম করেছিলে তাঁদের অনেকে কম্যুনিজ্ম্-এর গভীর উৎসকে জেনেছেন; সাম্য-

ধর্মে তাঁরা দীক্ষিত। কালের সংক্রামকতা তাঁদের জীর্ণ করবে না; রচনার ভাষায় বিষব্রণ দু-দিনে মিলিয়ে যাবে। অডেন এবং স্পেণ্ডর টিঁক্‌বেন, ভয় আছে পরবর্তীদের নিয়ে। বোমা-বিস্ফোরকের চোটে ছোটো কবিদের লেখায় জখমের ছড়াছড়ি, বিদ্বেষের ঝাঁজে হাওয়া ভরতি। অথচ যেটাকে তাঁরা ভাবেন বীরের বৃংহিত, দূর থেকে মনে হয় আর্ত কাব্য। অধিক স্থলে, ফরমাশী ঐকতান।

অর্থাৎ যাঁরা রাষ্ট্রিক সচেতন লেখক, তাঁরা আসলে স্বার্থের লোভে—

বুঝলাম না। ঘোষণার গরজটা খাঁটি হবে না কেন,— কীর্তন নানাবিধ, কিন্তু সব কীর্তনই শ্রোতব্য নয়। সুরের গলা নিয়ে কথা, পদাবলীর পাঠ যেন সরস হয়। এটা হ'ল সাহিত্যিক আসরের কথা। কোনো কীর্তনিয়ার পক্ষেই ব্যবসায়ী হওয়া দোষের নয়, ঠিক উল্টো; গুণীর স্বার্থের সঙ্গে অর্থ মেলা চাই; তাতেই সার্থকতা। তোমার কথাটায় যেন ইঙ্গিত ছিল তাই বললাম।

শৌখিন শিল্পীর কাছ থেকে অর্থের তত্ত্ব আশা করিনি।

শিল্পকলার ব্যবসাটা কি অনশনের হাট? শিল্পীর জামার পকেট থাকে তো ভরুক— অনেক ক্ষেত্রে জামাও জোটে না— সেটা খাটুনির প্রাপ্য। শিল্পের স্বার্থটা পরমার্থের সঙ্গে জড়িত, সেই কথাটাও বলতে চেয়েছিলাম। ফরমাশী আর্টের অনায়ত্ত একটি কেন্দ্রিক অথচ সর্বমানবীয়—

এইবারে সুরু হ'ল কীর্তন. – স'রে পড়ি। কেবল একটা কথা। এলিয়টকে তো খাতির করো— তিনি আজ—

তিনি আজ নূতন চতুরঙ্গ কবিতায়—

কবিতায় নয়— সে তো সোনার জিলিপি— কেবলি ভাবের চক্র— কিন্তু গদ্য-লেখায় তিনি আজ যুগধর্মকে স্বীকার করছেন। কিপ্‌লিঙের পৌরুষকে—

তোমার মুখে এই কথা? কিপ্‌লিঙের বীর্য তো তুমি আমি মানব না। সম্পত্তিরক্ষার জন্যেও যদি কাব্যে সামরিকতা চীৎকৃত হয় তাহলে কি সুখী হবে? যেহেতু সেটা গড়ের বাদ্যি, যেহেতু সেটা অন্য কিছু নয়?

কিপ্‌লিং মোড় ফিরিয়েছিলেন। দেখো না কেন,— পুষ্পমাল্য ধর্মবুদ্ধি সহধর্মিণীর জায়গায় বেয়োনেট বুয়র যুদ্ধ স্বাধীন মেয়ে—

জানি এটা হচ্ছে ঠাট্টা,— যাকে বলে নিজেকে ব্যঙ্গ ক'রে অপরপক্ষকে লজ্জা দেওয়া। কিন্তু যথার্থ বলছি— শোনো— মোড়-ফেরানোর কথা মানি। অথচ কোনদিকে মোড় ফিরল তা কেবল টেকনিক এবং কড়া-পড়া বাক্যে প্রাঞ্জল হয় না। আমরা আজ বিজ্ঞান-উজ্জ্বলিত দৃষ্টিতে নবীন চেষ্টার গান বাঁধছি, কাব্যের অনায়ত্ত রইল না কাজের কল, দিনের হাট; মুগ্ধ চক্ষে দেখছি রাঙা শূন্যে বিদ্যুতাভ এরোপ্লেন, কখনো চন্দ্ররথা, গুঞ্জন ক'রে চলেছে অন্তরীক্ষে মানুষের বৈজয়ন্তী। বর্বরের হাতে যন্ত্রের কথা বলছি না, সে ফুলকে দিয়েও বিষ বানায়, শিশুবধ করতে। সোভিয়েট রাশিয়ায় পদার্পণ করলে মানুষের চোখে মুখে আলো পড়ে, সেইখানে দেখেছি প্রাণের বাহন যন্ত্রকে, নিয়ে চলেছে তুর্ক্‌সিব্‌ রেলোয়ে দূর তৃষার্ত গ্রামে-গ্রামে সঞ্জীবনীধারা; বায়ুতরীতে চ'ড়ে সবুজ বিষ ছড়ানো হ'ল মারীমশাগ্রস্ত জলাজমিতে, মান্ধাতার যুগ থেকে যারা ছিল বঞ্চিত তারা পেয়েছে সামর্থ্য। পড়েছে উঁচু কপালে রোদ্দুর। প্রাণকল্লোল ছুটেছে উজ্‌বেকী চিত্রে, উক্রেনের স্বর্ণফসলছন্দিত প্রচুর নৃত্যে। তার মধ্যে নেই জাতি-বিদ্বেষ, হননের সমবায়, মারণযন্ত্রের স্তব। সেই বিরাট প্রাণবিক কম্যুনিজ্‌ম্‌ যেখানেই ছুঁয়েছে যন্ত্রকে, বুদ্ধিতে মিলেছে মন্ত্র, অর্থাৎ শিল্পীর আনন্দযোগে প্রভূত ঐশ্বর্য ছড়িয়ে গেছে মজবুত সংসারে। গড়বার তেজ সোভিয়েট সাহিত্যকে—

ভাঙ্‌বারও প্রচণ্ড তেজ—

তাতে সাহিত্য হয়নি। ছিন্নমস্তার স্তবনে রচিত কাব্য নানা দেশে বিক্ষিপ্ত, তার কবোষ্ণ করোটি আজ য়ুরোপীয় সাহিত্যের শ্মশানে দিকে-দিকে পাবে। তার জন্যে কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর দরকার হ'ত না। মোড়-ফেরানোর কথাই বলছি। কিপ্‌লিং যেখানে ইংরেজের বিক্রম নয়, বিশ্বপরিক্রমণের উৎসাহে নীলজল পেরিয়েছেন, ঘাটে-ঘাটে নেমেছেন দেশান্তরে, ধুলো উড়েছে তাঁর দেখা লাহোর মন্দালয়ের রাস্তায়, ঘন হয়ে এসেছে হিমালয়তটে অরণ্য— সেইখানে তিনি যুগের নেশায় পাওয়া শিল্পী। কালের পর্দা গেছে উড়ে, নূতন কাল দেখা দিয়েছে অচির দৈগন্তিক। সেখানে চোখে পৃথিবী, বুকে প্রাণের বেগ— সাম্রাজ্যের কথাই ওঠে না। দল বা পার্টির উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে পাই সাহিত্যকে অর্থাৎ জীবনের বাঙ্‌মূর্তিকে। এই নিষ্ক্রমণ নিজের কাছ থেকে নিজের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে; দরদীর চোখ ফিরে আসে সকলেরই কাছে, পরমাত্মীয়দের চিনতে পারে জাতীয় হন্যতার বেড়া ডিঙিয়ে। গণ্ডারের চামড়া ভেদ ক'রে কিপ্‌লিঙের অ্যাংলো-ইণ্ডীয় স্বভাবে ঢুকেছিল মানবনম্রতা, মনিবের পক্ষ না নিয়ে সেখানে তিনি বিদ্রোহবক্তা সাধারণ্যের। কিন্তু কতক্ষণ, কতটুকু? বারেবারেই দেখি আচ্ছন্ন বোধ, ঐশীশক্তির যোগে ইম্পিরিয়ল সাধনা। ছন্দও মামুলিত্বে ভিক্টোরীয় মধুর; কেবলই উক্তি। এর ছোঁয়াচ না লাগুক আমাদের ছাপা কাগজে।

অন্ততপক্ষে কালধর্মের জোর তো আছে ?

কালধর্ম, না, কালের পাপ ? যাকে বলা হয় ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এ হ'ল সেই বিশ্বজনীন পুরনো পদার্থ, এখন পেয়েছে নতুন নাম। এর উদ্‌গাতা হচ্ছেন তাঁরা যাঁদের বাড়ি ফ্যাসিস্ট্‌ রাজ্যের বাহিরেও চারতলা হয়ে উঠছে। বড়ো-বড়ো বাসিন্দে কেউ লেখেন, কেউ ছবি আঁকেন, তাতে কালের পরিচয় আছে বৈকি।

স্থানকালপাত্রহীন কাব্যচর্চার চেয়ে—

এলিয়টও কতকটা ঐভাবে আসল কথা এড়াতে চেয়েছেন। কিপ্‌লিং ছিলেন বিশেষ কালধর্মী, আত্মবিশ্বাসী। অতএব তাঁর বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই তাঁর কাব্যকে বিচার করতে হবে। যেন বিশ্বাসের বড়ো ভূমিকা নেই, যাচাই করবার উপায় নেই। অথচ এলিয়ট-ই ট্রাডিশন নিয়ে বহু কথা বলেছেন। ভয় হচ্ছে ওঁর মধ্যে যুগধর্ম নয়, কালের বিষ ঢুকছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো ধনিকতার তুরীয় কাব্য ফাঁদবেন,— সেটাও তো ঐতিহ্য। অত্যন্ত ধ্যানী যখন মল্লযুদ্ধের আখড়ায় বাণী দেন তখন এমনি ঘটে থাকে। তাই বলি কিছু ধ্যান, কিছু সংসার— প্রথম থেকেই মিশিয়ে রেখো। স্রষ্টার জিত ঐখানে ; জীবনের নানা উপকরণ নিয়ে শিল্প গড়েন। এলিয়ট বেশি পালাতে গিয়ে বেশি জড়িয়েছেন। একান্তবাসীর হঠাৎ ইতরতা তাঁর কাব্যে আগেও দেখেছি—Sweeney কাব্যের কথা মনে পড়ছে— কিন্তু তাঁর কবিতার বড়ো ধারা সেটা নয়। তাঁর গন্ধকে সম্প্রতি আশ্রয় করছে যাকে তুমি বললে কালধর্ম— তাতেই ভয় পেয়েছি।

মোটকথায় ফিরে আসা যাক। বেলা হ'ল। তোমার কাব্যাদর্শটা কী ?

কাব্যলক্ষ্মী বাস্তবী, প্রত্যক্ষদর্শনা। তিনি সাম্প্রতিকী ; তাঁর অন্য মূর্তিও আছে। কিন্তু তাঁকে দেখবার আলো চাই,— সেই আলোকের আকাশ কেবলমাত্র ঘটনায় নেই।

তবে কোথায় আছে ?

বোঝাতে পারব না। যিনি সম্প্রতিকে মেলান লোকায়ত সম্বন্ধের যোগে, তাঁর খবর সাহিত্যিকের জানতে বাকি নেই, অথচ জানি না। মিস্টিক শোনাচ্ছে। কী করা যাবে ? মিস্টিক কাব্য—

অন্যরকম সাহিত্যও তো আছে।

সাহিত্য নানা জাতের, কিন্তু মনুষ্য-জাতীয়। অর্থাৎ নানা বর্ণ ভাষা পরিচ্ছদ নিয়ে রচনার সামাজিকতা। কিন্তু প্রাণের একটা আত্মিক পরিচয় আছে। বহুকালের সে প্রভু, দেশকালের সে বন্দী নয়। এই কথা বুঝতে হলে নিরর্থক খুশির কাজ করতে হয়, যেমন অকারণে ছাতের উপরে বেড়ানো বা কেবলমাত্র সুরে ভ'রে গান বাঁধা। তার মধ্যে কালের প্রসঙ্গ নেই। তীব্র কালের মধ্যেই একটু সময় রাখা চাই। Distant Point-এর নাট্যকার এই কথা বুঝেছেন বলেই তিনি বড়ো। দূর এবং নিকটের নাট্যে তিনি পালা জমিয়েছেন নিভৃত প্রাত্যহিক সংসারকে নিয়ে— সেই চিরন্তন নৃর্তনের গল্পে যখন আধুনিকের সংসর্গ দেখা দিল সে বড়ো আশ্চর্য। একটি সুমিত চক্রে এসে মিলল কালজয়ী চিরমানবিক এবং সমগ্র সোভিয়েটের উজ্জ্বল ঐক্যে বাঁধা নবীন কালের মানুষ। Afinogenevকে আধুনিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মধ্যে—

কেন, সোভিয়েট লেখক ছাড়া কি তুমিও—

আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যের খবর খুব ভালো জানি না। কিন্তু অন্যত্র য়ুরোপে দুর্দিন। শেষ দু-বছরে ইংলণ্ডে একটিও বড়োদরের বই লেখা হ'ল না— দুটো ছাড়া— এ কি ভাববার কথা নয়? সমালোচনা লিখতে গিয়ে আশ্চর্য হয়েছি। যুদ্ধে হতাহতের মধ্যে দেখছি সাহিত্য-পক্ষেরই অক্ষৌহিণী— ছবির জগৎও বিকলাঙ্গ। এর মূল কারণ যুদ্ধ নয়, যে-কারণে যুদ্ধ জাগে সেইটে।

তবে তো তুমি আমাদেরই—

কিন্তু দলে নয়। প্রভেদটা কোথায় বুঝেছ। মুখ্যত প্রকরণ নিয়ে। যে-সাহিত্যকে বাঁচাতে চাই তাকে যুগের অস্ত্রে বধ করতে রাজী নই। আজকে একটু চেয়ে দেখতে চাই আজকের এই দিনের বাহিরে থেকে।

যাই বলো, পিছনের দিকে তোমার মন ঝুঁকেছে। তোমার ভাবনায় কাল-বৈশাখী নেমে উল্টো দিকে বইছে।

পিছনে কি সামনে জানি না, কিন্তু দাঁড়িয়েছি একটা প্রাচীন বটচ্ছায়ায়; পিতৃপুরুষের যুগবাহী কল্যাণ যেখানে আশ্রিত। মরুভূমিতে আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের চলা। কিন্তু ছায়াতপে যুগ্ম বাণী শুনে যাব।

উপস্থিত চলো "বৈশাখী"র আপিসে গিয়ে উত্তীর্ণ হই। আর দেরি করার কোনো সাহিত্যিক যুক্তি খাটবে না

সম্পাদক, "বৈশাখী"

সমীপেষু

চেয়েছিলেন সারবান ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনা, পাঠালাম হাওয়াই তর্ক। কিন্তু দোষটা পুরো আমার নয়। Aldous Huxley-র Grey Eminence এবং Eliot-এর নূতন চারটি কবিতা ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যে একটিও কালোত্তীর্ণ হবার যোগ্য লেখা বেরোয়নি। একটিও নাটক নয়, উপন্যাস নয়, কাব্যসংগ্রহ নয়। জোর দিয়ে কথাটা বলছি, কিন্তু তাই ব'লে আমার বিশ্বাসটা শিথিল নয়। ভুল করতে পারি। যে-দুটি লেখকের নাম করলাম, তাঁদের ঐ নূতন রচনা অতি আশ্চর্য সৃষ্টি ব'লে জেনেছি। ইংরেজি সাহিত্যে তার প্রভা অম্লান থাকবে মনে করি। The Screwtape Letters ইংরেজি মানসিক রাজ্যে আন্দোলন এনেছে— Oxford-এর সেরা মস্তিষ্কবান অধ্যাপক Lewisএর লেখা। কিন্তু এর স্থান দর্শনধর্মতত্ত্বের কোঠায়। যদিও লেখার কৌশলে মন চমৎকৃত হয়— সূক্ষ্ম শানানো বাক্য থেকে স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে পড়েছে প্রতি পদে। দুষ্টবুদ্ধিও আছে।

লেখাটায় কিছু তর্ক রইল। অনেকটা নিজেরই সঙ্গে। তাই বক্তাদের স্বতন্ত্র রাখলেও নাম-ভেদের দরকার হ'ল না। অভ্রংলিহ উক্তি বা যুক্তির সন্ধান জানিনে। বলতে-বলতে আলোচনা জমে উঠেছিল। এই পর্যন্ত।

তেরো শ' পঞ্চাশের বাংলা

মহামারীর পরিবেষ্টনে রচিত কবিতার একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয়ন-গ্রন্থ ঢাকুরিয়া প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে শীঘ্রই বার হবে শুনে উৎসাহিত বোধ করছি। বিশেষ কালের পরিধিতে সমসাময়িক শিল্পীদের রচনা বিচিত্র ঐক্য নিয়ে দেখা দেয় এই রহস্য আমাদের কাছে ঔৎসুক্যজনক; আধুনিক বাংলা কাব্যে তার বিশিষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু যেখানে সদ্য ঘটনার দাবি প্রবল, শিল্পীর পক্ষে সমস্যা সেখানে কঠিনতর। সমস্যাটা শিল্পীর, শিল্পের নয়। যে-কোনো অভিজ্ঞতাই সাহিত্যে সৃজিত হতে বাধা নেই; চতুর্দিকের রাষ্ট্রিক সামাজিক অবস্থান চিরদিনই লেখকের গভীরতম চেতনায় আলোড়িত হয়ে ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে। মুশকিল এই যে, শিল্পী ও সামাজিক মানুষ একই ব্যক্তি— অন্ততপক্ষে তা না হলে শিল্পী বড়ো হতে পারে না— এবং সেই কারণে দুই পৃথক কর্মক্ষেত্রে তার একই সময়ে ডাক পড়তে পারে। যে-মানুষ এরোপ্লেন চালনায় নিযুক্ত তার পক্ষে কবিতা রচনার সময় কোথায়, হাতুড়ি পেটানোর কাজে ব্যস্ত থাকলে কলম চালানো সম্ভব হয় না। শুধু ঘড়ির সময় নয়, মনোভাবেরও একটি সময় অর্থাৎ অনুকূল অবস্থা থাকা চাই। শিল্পকাজের জন্যে যে অবসর এবং মনঃসংযোগের ঐকান্তিক প্রয়োজন তার অভাবে উৎকর্ষ সৃষ্টি বন্ধ থাকে; অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে থেকেও শিল্পী তার ভাব ও আঙ্গিক প্রসাধনের যুগ্ম দাবি সম্পন্ন করবে এমন আশা করা অন্যায়। তাই দেখা যায় যুদ্ধরত কবিদের রচনা বিষয়ের প্রবলতা সত্ত্বেও দুর্বল হয়ে দেখা দেয়; দুরন্ত ছন্দ, বা বিশেষণ বর্ষণের দ্বারা শিল্পের ক্লান্তি ঢাকা পড়ে না। ক্বচিৎ ব্যতিক্রম হয়নি তা বলা যায় না, কিন্তু বিশেষ ক'রে আধুনিক যুদ্ধের দিনে সৈনিকের পক্ষে শিল্পসাধক হওয়া কঠিন; যার নাম সমগ্র যুদ্ধ, তাতে আজ যুদ্ধ ছাড়া অন্য ক্রিয়া নেই। এমনকি যুদ্ধে নিযুক্ত নয় এমন কবির পক্ষেও দূরত্বের আড়ালে ব'সে কাব্যচর্চার নিরাপদ অবস্থা অন্তর্হিত, কেননা পদমর্যাদা রক্ষা না ক'রে বোমা প'ড়ে থাকে।

য়ুরোপীয় যোদ্ধা কবিদের রচনাসংগ্রহ পড়লে এই-সব কথা অত্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যায়। মন্বন্তরের কবিতাও উৎকট সামাজিক ব্যাধির কালে রচিত, সাংঘাতিক অন্যায় এবং দুঃখের পরিবেশ যুদ্ধের মতোই লেখকদের ব্যক্তিগত

জীবনকে ভিতরে বাহিরে চতুর্দিক হতে ঘিরেছিল। প্রভেদ আছে, কিন্তু শিল্পের সমস্যার দিক থেকে অনেক সাদৃশ্য মিলবে। প্রশ্ন এই, যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে দুর্গত-ত্রাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন সেইরকম লেখকের পক্ষে কাব্যরচনা সম্ভবপর হয়েছিল কি না। যাঁরা একান্ত দরদী, কিছু পরিমাণে যাঁরা সেবার কর্মও গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের হাতে সময় থাকলেও মনে কি সময়ের আনুকূল্য ছিল— অর্থাৎ তাঁরা কি আন্তরিক বেদনাকে শিল্পের আন্তরিকতায় পরিণত করবার সুযোগ পেয়েছিলেন? বলা বাহুল্য, শিল্পের সত্যরক্ষার জন্য শুধু ভাবনায় নয়, আঙ্গিকের সাধনাতেও সত্যলাভ করতে হয়। নিদারুণ ঘটনায় উত্তেজিত মানসের অবস্থা শিল্পের আপন বিশিষ্ট সাধনার প্রতিকূল। তাই দেখা যায় যথার্থ শোকের প্রকাশ সৃজনশিল্পের অভাবে কৃত্রিম শোনায়; কাব্যের ক্রোধ, যা একান্ত ক্রোধের ভাবই পাঠকের চিত্তে পৌঁছিয়ে দেয়, তা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে যথেচ্ছায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। মাসিকপত্রে যখন মন্বন্তরের তীব্র ব্যথায় উন্মথিত কবিতা পড়েছি অনেক সময়ে কাব্যের কান্না অত্যুক্ত মনে হয়েছে, অথচ লেখকের অনুভূতি এবং ঘটনার দারুণ্য তো অতিশয় প্রকাশিত হতেই পারে না। মনে হয়েছে, কবি যদি সে-স্থলে কষ্টকাব্য না লিখে গলিতে ছুটে গিয়ে কষ্টনিবারণ বা বিপ্লবসৃষ্টির কাজ বরণ ক'রে নিতেন তাহলে কবির পক্ষে ভালো হ'ত, কাব্যের ক্ষতি হ'ত না। মনে হয়েছে, অসহায় দ্রষ্টার আসনে বসে মুমূর্ষুদের বর্ণনা করার মধ্যে লজ্জা আছে— সেই লজ্জা পাঠকেরও। মানুষের দুঃখ এমন জায়গায় পৌঁছয় যেখানে তার বিষয়ে যদি বলতেই হয় তাহলে সুরের সমাহিত ভাব চাই, ভাষার আব্রু চাই— কাতরতা প্রকাশের চেয়ে শ্রদ্ধার মৌনতাই প্রশস্ত। সবচেয়ে বড়ো পাপ দয়ার ভাষণ, আত্মপ্রসন্ন লঘু ছন্দে কারুণ্যকীর্তনের চেয়ে নির্যাতিতকে অভিশাপ দিলেও সম্মান রক্ষা হয়। সক্রিয় মনোবৃত্তির আর-একটা পরিচয় ভাষার উগ্রতা— বিশেষ ঘটনাকে অত্যন্ত জাহির ক'রে তার দায়িত্বকে এড়ানোর এই পদ্ধতি।

কোনো বিশেষ ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখবার উপায় তাকে সত্যের চলন্ত এবং স্থির ভূমিকার যোগে একাগ্র উপলব্ধি করা,— শিল্পের প্রকাশে সেই পরিপ্রেক্ষিত রক্ষা করতে হয়। চরম যন্ত্রণার চতুর্দিকে সুনীল আকাশ বিচিত্র প্রাণের বেষ্টনীকে স্বীকার করলে তাকে ছোটো করা হয় না, মর্মান্তিক অনুভূতির ধারাকে বইয়ে দেবার সেই একটা উপায়। যা সুস্থ, যা মানবত্বের স্বাভাবিক, তাকে ক্ষণে ক্ষণে বোধনে জাগ্রত না রাখতে পারলে অনুভূতিও বিমর্ষ হয়।

সৃষ্টির জগতে এমন কোনোই অবস্থা ঘটে না যেখানে চিরন্তন সংসর্গ যুক্ত হয়ে নেই, সবের মধ্যেই আমরা আছি। যে-শিল্পী কেবলমাত্র বীভৎসকে দেখালেন তিনি 'নিরন্ন ছিন্নকন্থা মানবত্বকেও ক্ষুণ্ণ ক'রে দিলেন— এমন শিল্প চাই যাতে পূর্ণ অস্তিত্বের অধিকারকে স্বীকার করতেই হয়। শ্রদ্ধা জাগানো দরকার। শিল্পী যেন এ-কথা না ভোলেন যে পটের আকাশে কালি ঢেলে দিলে কিছুই দেখা যায় না, সবখানি শাদা থাকলেও যেমন শূন্য। চাই আলো কালোর শিল্প। বর্ণের বিমিশ্রতা দ্রষ্টব্যেও আছে, দ্রষ্টার চোখেও আছে। যার জন্যে ছবি আঁকা হচ্ছে সেই ছবির দর্শকও রঞ্জিত রেখাঙ্কিত অনুভূতির তারতম্যের মধ্যে দিয়েই দুঃখকে দেখে, সত্যকে দেখে। সৃজনীশিল্পের এই সূক্ষ্মতা আমরা মন্বন্তরের কবিতায় রক্ষা কবতে পেরেছি কি না বিচার্য। একই পরিমণ্ডলের অন্তর্বর্তী হয়ে আমরা কেউ-ই বিচারকের মঞ্চে বসতে পারি না, কিন্তু সাম্প্রতিক কাব্যালোচনার প্রসঙ্গে আত্মবিচারের প্রয়োজন আছে। যে-সামাজিক বিপর্যয়ের কেন্দ্রে আমরা রয়েছি শাশ্বতের ভূমিকায় তাকে দেখতে হবে। এই দুই বিষয়ে নূতন সংকলিত বাংলা কাব্য আমাদের সাহায্য করুক।

কেন লিখি

কেন লিখি? পুরো উত্তর দিতে হলে অনেক কিছু জানা দরকার। কিন্তু সৃষ্টি-কাজ সম্বন্ধে একটা বিস্ময় থেকেই যায়। কেন কী হয় তার সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা চলবেই, কিন্তু আশ্চর্যের রহস্য-দরোজাটা বন্ধ হলে চলবে না— লেখকের নিজের কাছেও যেমন তার রচনার ব্যাপারটা অনেকখানি অজানিত, সমালোচকের কাছেও তাই।

কেন লিখি? একটুকরো শক্ত কাঠ, তার মধ্যে সীসে; অথবা কালি-লাগানো নিব— এর সঙ্গে আমার সুখ দুঃখ চেতনার কী যোগ? কতকগুলো কালো কালো সোজা-বাঁকা দাগের মধ্যে প্রাণের ভাষা কোথায়? কেন এই অদ্ভুত আচরণের উদ্ভব হ'ল, পৃথিবীতে এসে মানুষেরা উপুড় হয়ে বসে অক্ষর চিহ্ন করতে লাগল— লেখার এই কারুরহস্যটুকুও অজ্ঞেয়। লিখিত ভাষা, অর্থাৎ বাহিরের শব্দ এবং রেখা দিয়ে অদৃশ্য মনোভাবকে বন্দী করার এই প্রবণতাটুকু কেন-লিখি-র একটা অনুত্তর-বদ্ধ প্রশ্ন।

তার পরে আছে লিখতে-বসার কালে মনের স্বায়ত্তবিধান সম্বন্ধে কেন-লিখি-র প্রশ্ন। সজ্ঞানে কি জানি কী লিখছি? কোনটা লিখব, কোনটা নয়? কেবল কি আমার খুশি? কি বা আমার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে জড়িত আমার ইচ্ছা মিলিয়ে একটি সজ্ঞান সংকল্প আমাকে লেখায়? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলব দুটোই সত্য। কখনো কোনোটা প্রাধান্য পায়। খুশির নেশায় গান লিখি, কবিতা লিখি; ছন্দের খেপামি, মনের মধ্যে সুরের ঘূর্ণিত গুন-গুন ধ্বনি, যা অর্থের চেয়ে বেশি, যা আমার অভাবিত কল্পমুহূর্তের সোনা-ছোঁওয়া ভাবনা, সেই ভরপুর কবিত্বে-পাওয়া সেই আত্মবিস্মৃত রচনার মধ্যে কেন-লিখি প্রশ্নটা অতল জলে ডুবে যায়, যেমন আস্ত একখানা পূর্ণিমার চাঁদ ডুবে যায় স্বচ্ছ আকাশে। আবার তারই মধ্যে বাস্তব চাঁদটাকেও যে দেখি না তা নয়, হয়তো আমার লেখবার ইচ্ছাটাকে জলজ্যান্ত ভাবেই দেখতে পাই গাছের পাতার আড়ালে, রাস্তার বাড়ির ছাত পেরিয়ে— আমি কি বলতে চাই তা খুবই স্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে মানসের সমুখে। এই-সব রূপক দিয়ে কথা বলা অসংগত নয় যেখানে ভাব-রূপের রহস্য কিছুতেই স্পষ্ট কথায় স্পষ্ট হয় না,

তির্যকভাবেই যাকে সোজা দেখানোর উপায়। কিন্তু জানি আমার বিশেষ কিছু বলবার সংকল্প এবং আমার অভাবিত শঙ্কিত বাক্যের স্বতঃপ্রকাশ এই দুয়ের যোগেই আমার কেন-লিখির প্রশ্নটাকে খাটিয়ে দেখতে হয়।

খুব স্পষ্ট লেখবার তাগিদ নিয়ে উদ্দেশ্য নিয়ে বসি না তা তো নয়। কিন্তু সেই তাগিদকেও জোর ক'রে জাগানো যায় না। হঠাৎ জাগে। প্রবণতা তৈরি করতে পারি মাত্র, মনকে বাঁধতে পারি, চরিত্রশক্তিকে সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজের ধ্রুবস্বরে বেঁধে তুলি, মানুষের বড়ো অধিকারে সকলকে সমান জেনে সংহত সাম্যচিত্তে যখন কলম নিয়ে লিখতে বসি তখনো আয়োজন চলছে। এই আয়োজনকে প্রত্যহ সত্য ক'রে তোলবার সাধনা লেখকের। কিন্তু আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, বা সম্পূর্ণ অবস্থাতেও যখন হঠাৎ ঠিক কথা, স্পষ্ট যুক্তি, সুভাষিত মনোভাব এসে পৌঁছতে থাকে তখন জানি আমার চেষ্টার অতীত একটি আত্মশক্তির ক্রিয়া চলেছে। লেখকের সেই আত্মশক্তি তার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়, যার যতটা আয়ত্তাধীন লেখক হিসাবে তার শক্তির পরিচয় তত বড়ো। অনেক সময় মনে হয় নিজের মধ্যে সমস্ত মানসিক কারখানার কোন একজন বড়ো কর্তা আছে, তাকে বাদ দিয়ে যথাবিধি লেখা, ভাবা, যুক্তিতর্ক, হৃদয়াবেগের প্রাত্যহিক নানাবিধ নিয়মিত কাজকর্ম চলতে থাকে, কিন্তু সবটা চালনা করা, কী তৈরি হচ্ছে তার তদারক করা, এবং সমস্ত আয়োজনকে হঠাৎ অন্য পথে নিযুক্ত করার কাজ লেখকের মনের কোন এক মনোনায়কের হাতে। হঠাৎ দেখি যে-উপমা ব্যবহার করেছি তার মানে গেছে বদলে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে কোমর বেঁধে লিখছি তারও গভীরে আমার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য বা আমার কালের উদ্দেশ্য, দেশ বা জাতির উদ্দেশ্য ধরা পড়ে গেছে। কেন লিখেছি?—এর সম্পূর্ণ উত্তর তাই কোনো লোকই দিতে পারেন বলে জানি না। নদীর খাত তৈরি করে রাখে সজ্ঞান মনের কর্মীদল, কিন্তু দামোদরের বন্যা যখন নামে সেই প্রবল জলধারা কোন বাঁকে বইবে তার হিসাব ঠিক থাকে না। অথচ ক্রমাগতই বাঁধ বাঁধতে হয়, সচেতন মনকে সংসারের বিচিত্র বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত রেখে এমন ব্যবস্থা ঠিক করতে চাই যাতে বৃষ্টির জল, পাহাড়ের জল নষ্ট না হয়ে ফসল ফলাতে পারে, খেয়ানৌকো জেলেডিঙি মহাজনী নৌকো চলবার পথ খোলা থাকে। সামাজিক উদ্দেশ্য আমাদের লেখার পথকে বেঁধে দেয়; নিছক আনন্দ দেবার উদ্দেশ্য, আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যও পথ বাঁধে; কিন্তু একটা অধিক ব্যাপারও আছে তা স্বীকার করতেই হবে। মনোধারা বইবার কালে কোনটা

রাখে কোনটা বর্জন করে, কীভাবে কোন রূপ দাঁড়িয়ে যায় শ্রেষ্ঠ সৃজনধর্মী লেখার বেলায় তা অত্যন্ত স্পষ্ট বলা যায় না ; অগোচরেই তার ক্রিয়ার প্রধান পরিচয়। প্রাণের সকল পরিচয়েই এই নেপথ্যবিধান আছে, দেহতত্ত্বের মধ্যে প্রাণের রহস্যকে ধরে দেওয়া চলে না। হাড় গুনে, প্রতি অঙ্গের ব্যবহার এবং সুব্যবহারের তালিকা তৈরি ক'রে প্রাণধারণের ভালো বিধি আমরা বের করব, শারীরতত্ত্ববিদের কাছে আমাদের যাওয়া দরকার, কিন্তু প্রাণের সজীবতা প্রাণ দিয়েই অনুভব করা যায়, ব্যক্ত করা যায় না। সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও প্রাণের অপরিমেয় রহস্য নিহিত আছে— কেন-লিখি-র পুরো জবাব দিতে গেলে তাই ভুল জবাব দিতে হয়। কেননা লেখাটাই জবাব। তার থেকে আলাদা ক'রে যা বলা যায় তা লেখার অ্যানাটমি, বা মনস্তত্ত্ব, বা সামাজিক বিচার, কিন্তু লেখার প্রাণপূর্ণ নিহিতার্থ তাতে ধরা পড়ে না। কড়া সমালোচক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহিত্যিক বিচারকও তাই এক জায়গায় এসে যেন প্রাণের অজ্ঞেয় সহজতার কাছে মাথা নিচু করেন, বলেন— কেন আমরা লিখি তা ঠিক জানি না। এটা যদি মিস্টিক শোনায় তো উপায় কী ?— এ তো নিরেট সত্য কথা।

কাল আমাকে লেখায়, স্বভাবও আমাকে লেখায়, এই দ্বৈত সত্যকে স্বীকার করব। আমি যদি জাত-লিখিয়ে হই তাহলে আমার লেখার ক্রিয়া আমার অস্তিত্বের সঙ্গেই গূঢ়যোগে একক— আমি কেন লিখি, আর-একজন কেন ছবি আঁকে বা বীন বাজায় তার মূ‌‌ে যে অস্তিত্ব এবং প্রকাশের যুগ্মতা আছে তাকে সৃষ্টিব্যাপারের মূলে নেমে অনুসরণ করতে হয়।

আরো অনেক প্রাসঙ্গিক, আনুষঙ্গিক বিচার্য বিষয় আছে, কিন্তু এখানে স্থানাভাব। সৃষ্টিধর্মী রচনার মূল প্রশ্নটিকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটু বোঝবার চেষ্টা করলাম।

সমবায়ী যুগের শিল্প

উপন্যাসের নানা বৈষয়িক উপাদান আসতে পারে গ্রাম থেকে, কিন্তু ঔপন্যাসিক দেখা দেন শহরসৃষ্টির সঙ্গে। অর্থাৎ যে-সভ্যতায় বড়ো শহর জাগেনি সেখানে যাকে বলি নভেল তার পরিচয় মিলবে না। ছোটোগল্পও নয়। কেননা বিচিত্র ঘটনার স্বতন্ত্র ছবি ফুটিয়ে তোলবার পিছনে আছে নূতন কালের সংযোগী এবং বিবিধদর্শী মন। সংঘবদ্ধ জীবনের বৃহৎ সামাজিক কেন্দ্র-রূপী আধুনিক শহরগুলিতেই ধীরে-ধীরে এই বিশেষরকম মনোদৃষ্টি তৈরি হয়ে উঠল ; সেই মন নিয়ে শিল্পী এখন গ্রামে গিয়েও উপন্যাস লিখতে পারেন কিন্তু সভ্যতার নূতন অধ্যায় তার সঙ্গে জড়িত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখতে পাই উপন্যাসের জন্মস্থান কলকাতা শহর, এবং এই শহরের পরিণতির পর্যায়ক্রমে নভেল ও ছোটোগল্পও পত্রপল্লবিত হয়ে উঠেছে।

কথাটা স্পষ্ট করে বলি। আখ্যায়িকা উপাখ্যান ইত্যাদি গল্পের বহু ধারা যুগে-যুগে বিস্তৃত হয়ে কিংবদন্তী এবং জনশ্রুতির সহযোগে নানা মনের ছাপ নিয়ে মুখে-মুখে অথবা পুঁথির অক্ষরে সাহিত্যের উৎকর্ষ লাভ করেনি তা বলছি না। কবিতায় যেমন মহাকাব্য এসেছিল জনচিত্তের অস্পষ্ট আলোড়ন বহন করে, তাতে যেমন বিশেষ কোনো শিল্পীর সংহত বিশ্বদর্শনের চেয়ে বেশি ক'রে পাই একই ছাঁচে ঢালা নানা মনোজাত কাহিনীর মহানতা এবং তারই সমবায়, তেমনি প্রাক্-আধুনিক কালের রূপকথা অথবা গল্পের জগতেও ব্যাপ্তি আছে কিন্তু তা বিশিষ্ট দৃষ্টির শিল্পে নির্ধারিত নয়। একই চোখে যুগ্মদৃষ্টি অর্থাৎ নিজের এবং অন্যান্যের দৃষ্টিতে সংসারকে দেখবার শিল্প নূতন কালে স্পষ্টতর প্রকাশিত হয়েছে। এর জন্যে শুধু বহু জীবনী নয়, বহু জীবিকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য চাই ; শহরেই তা সম্ভবপর। য়ুরোপে দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই ইংলণ্ডে উপন্যাসের প্রথম সূচনা, তখন লণ্ডন শহর তৈরি হয়ে উঠছে। যথার্থ নভেল এল আরো পরে ; শাহরিক সভ্যতা লণ্ডনকে কেন্দ্র করে বিবিধবৃত্তির মানুষকে জনালয়ে একত্র গ্রন্থি বাঁধবার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দিল উপন্যাস। সেই সময়ে এলেন রিচার্ডসন, ফিল্ডিং। বিচিত্র ব্যবসায়ী বণিক শ্রমিক কর্মজীবী, ধর্মযাজক, মধ্যবিত্ত অর্ধবিত্তের দল তখন লণ্ডনের দোকানে বাজারে, আপিসে আদালতে, ডাক্তারখানায়

বিস্তালয়ে জাহাজঘাটায় উপনীত। শুধু মানুষের সমষ্টি নয়, নানারকম মানুষের দাবিকে স্বীকার করে যে গল্প জমে ওঠে, যেখানে নানা মন নানা মতকে মিলিয়ে সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে একই মানবিক আদর্শে বিচিত্র করে দেখবার ঔৎসুক্য জাগে তাতেই ঔপন্যাসিকের পরিচয়।

বলা যেতে পারে গ্রাম্যজীবনেও নানা জীবিকার সমবায় আছে, পূর্বকালের ছোটো-ছোটো শহরেও তাই ছিল— নভেল কেন দেখা দেয়নি। এইখানে একটি মূলগত তত্ত্বের বিচার প্রয়োজন। আমরা যাকে আধুনিক শিল্পদৃষ্টি বলতে চাই তাতে মানুষকে বাহিরের দিক থেকে নানাধর্মী বলে জানা-ই যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অসীম বিচিত্র সম্ভাব্যতার সত্যকে স্বীকার করতে হয়। গ্রামে যে-ভাবে তাঁতী, নাপিত, জমিদার ইত্যাদি আখ্যায় বন্দী ক'রে মানুষকে এক-একটি চিরস্থায়ী বৃত্তির ভিন্নতায় বদ্ধ করা হয় তাতে জাতিভেদ রক্ষা হতে পারে কিন্তু শিল্পের জাত যায়। নূতন যুগের শিল্পের কথা বলছি। শহরে অনেকটা পরিমাণে অমানবিক এই জাতিভেদ নষ্ট হয় বলেই শিল্পের উৎকর্ষ দেখা দিতে থাকে। যেখানে বহু জীবিকার মধ্যে রাস্তা খোলা, একই মানুষ নানা কর্মের এবং সূক্ষ্মতর জীবনীর জাল গেঁথে তোলে, সেখানে পরি-বর্তনশীল মানব-সম্বন্ধের বিবিধ যোগে উপন্যাসের শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ উপন্যাস হ'ল সমাজবিন্যাসের প্রতিচ্ছবি, সামাজিকতার আদর্শ যেখানে অধিক পরিস্ফুট সেখানে ঔপন্যাসিকের বিশেষ শিল্পজাত দৃষ্টিও সার্থক রূপ লাভ করে। ইংলণ্ডে উচ্চনীচের প্র. ·দ জাতিভেদের মতোই কঠিন ছিল, কিন্তু লণ্ডনে এই ভেদের দেয়াল যতই ভাঙতে লাগল নভেলের আশ্চর্য উদ্ভব সেখানে দেখা দিল। মোটামুটি বলা যেতে পারে নভেলের মূল প্রবণতা বহুজনের জীবনীতে গাঁথা সমাজের দিকে। তাই নভেলের জগতে যে-কোনো ব্যক্তি নায়ক হতে পারে, রাজা অথবা সংহারকর্তা বা ধর্মপ্রতাপী বিশেষ বীরের স্থান সেখানে উচ্চাসনে বাঁধা নেই— শহরের সভ্যতা আজও যতই ভেদশীল হোক তার গতি ডেমক্রেসির অভিমুখে। প্রাণের বিচিত্রবিধ আবর্তে পড়ে কেউ আজ শহরে ধনী, কেউ দেউলে, ভাগ্যবিপর্যয়ের পালা চলেছে, ঘটনার দিক থেকেও ওঠা-পড়ার বিরাম নেই। এমনতর আবহে প্রবর্তিত শিল্পীর মন স্বভাবতই মানুষকে যথার্থ দেখতে চায়, কোনো সংজ্ঞায় বন্দী ক'রে এবং বিশেষ কোনো সংস্কারের মধ্যবর্তিতায় মানবসংসারকে জানা তার ধর্মবিরুদ্ধ। নানা অবস্থায় ফেলে নিজেকেই সে দেখে এবং অন্যকেও চেনে, তার আত্মদৃষ্টি বাহিরের দৃষ্টির

সঙ্গে মিলে গিয়ে যথার্থ ঔপন্যাসিকের শিল্পদৃষ্টি তৈরি করে। তাই মহাকাব্যের গল্পে বা উপকথায় রাজা উজীর অথবা বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতীকরূপী ছাপ-মারা পুরুষ যে-ভাবে আধিপত্য করত আজকের কাব্যে গল্পে তা আর সম্ভব নয়। মহাকাব্যের স্থানে এসেছে কাব্যের বৈচিত্র্য আর গল্পের জায়গায় এসেছে নভেল ছোটোগল্প। এই নূতন শিল্পরূপগুলির মূলে আছে মানুষ সম্বন্ধে মুক্ত মনের আগ্রহ, নানা বৃত্তি নানা স্বভাব সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত সৃজনীদৃষ্টি। কোথাও তা উজ্জ্বল কণিকা হয়ে লিরিকে ছোটোগল্পে নবতর সম্পূর্ণতা পেয়েছে, কোথাও তা মালায় গাঁথা দীর্ঘতর কাব্যে উপন্যাসে সংহত হ'ল। যথার্থ শিল্পদৃষ্টি যাকে বলি তা যে মানবিক দৃষ্টিরই সঙ্গে এক তা ক্রমে আমরা বুঝতে পারছি। বিশেষ কোনো শিল্পীর দৃষ্টি পূর্বযুগেও কালের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে প্রকাশ পেয়েছে এমন বহু উদাহরণ আছে, বর্তমান কালেও শিল্পজগতে চক্ষুষ্মানের সংখ্যা কম, কিন্তু এটা হ'ল শিল্পশক্তির তারতম্যের কথা। নূতন যুগের বিশেষ শিল্প যাকে বলছি সেই উপন্যাসের পরিচয় পেতে হলে শিল্পচৈতন্যের একটি প্রসার-ধর্মকে মানতে হয়।

সাহিত্যের আরো একটি মহল, নাটকের রাজ্যেও এইরকম পরিণতি দেখা যায়। য়ুরোপে বহুপূর্বকালে নাটক ছিল মহাকাব্যের সমগোত্রীয়, তাতে গণ্য-মান্যের প্রাদুর্ভাব, তাতে বহুর জন্মগত মানবিক অধিকার অস্বীকৃত। সাধারণের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সেখানে ক্ষীণপ্রভ, পারিবেশিক তথ্য লুপ্ত-প্রায়। দু-চারটি বৃহৎ ঘটনাকে বড়ো ব'লে মানা হয়েছে, প্রকৃতি বা সমাজের প্রচণ্ডতা যথারীতি সাহিত্যিক মর্যাদা হতে বঞ্চিত হয়নি। যাকে বলছি নাটিকা তা এল এলিজাবেথান্ যুগে, কিন্তু সেক্সপীয়রের অসামান্য প্রতিভাকে বাদ দিলে দেখা যাবে সেই যুগে নূতন অর্থে নাটিকা প্রায় ছিল না, পুরাতনী নাটকেরই নবমূর্তি ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছে। শাহরিক সভ্যতা তখনো লণ্ডনে গ'ড়ে ওঠেনি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন লণ্ডনের পূর্ণতর নিজস্ব বৈচিত্র্য ফুঠে উঠল সেই সময়ে বহুজীবনের সমবায়ী দৃষ্টি হতে নভেল এবং নাটিকা দুয়েরই সৃষ্টি হতে থাকল। এলিজাবেথান্ রঙ্গমঞ্চেও দুর্ধর্ষ চরিত্র এবং সাংঘাতিক ঘটনার প্রাবল্যই ছিল নাট্যশক্তির পরিচয়; পরবর্তীকালে বেন্ জন্সনের নাটকে নায়ক-নায়িকাদের আভিজাত্য ঘুচেছে কিন্তু তারাও ছাপ-মারা পদার্থ, তাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কারও তেমন ঔৎসুক্য নেই, যদিও বিবিধ বর্ণনা ও চরিত্রচাতুরী আছে; শিল্পের যুগ্ম-দৃষ্টির সূক্ষ্মতা কোথায়? জীবননাট্যে চরিত্রের বৈচিত্র্য দেখানোই

যথেষ্ট নয়, যে-দৃষ্টিতে প্রত্যেকের অসামান্যতা ধরা পড়ে এবং একই মনুষ্যত্বের মহিমায় তাদের মূল্যবিচার হয় তার অভাবে যথার্থ নাটিকা কোনো দেশেই শ্রেষ্ঠত্ব পায়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে খুব বড়োদরের নাট্যপ্রতিভা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে উদিত হয়নি, কিন্তু নাটিকার চেহারা গেল বদলিয়ে। তার পর হতে বর্নর্ড্ শ' পর্যন্ত ইংরেজি নাটিকায় নবযুগের সেই দৃষ্টি সৃজনীশীল বহু রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, উদ্ভাবনার অন্ত নেই। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে এখনও দুর্গতির পালা চলেছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ-ই নাটিকা লেখেননি এটা আশ্চর্য। অথচ উপন্যাস ছোটোগল্পের আসরে আমরা বিশ্বের যে-কোনো সাহিত্যের সমান আসন দাবি করতে পারি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নূতন নাটিকায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শক্তি অন্যত্র প্রয়োগ করায় দু-চারটি অসম্পূর্ণ প্রতীক ভিন্ন যথার্থ নাটিকা তিনি রেখে যেতে পারেননি। নামোল্লেখ করা যায় এমন সৃষ্টি বাংলার রঙ্গমঞ্চে নেই। রবীন্দ্রনাথের নাম পূর্বেই বাদ দিয়েছি, তা ছাড়া সাধারণ রঙ্গালয়ে চণ্ডালিকা, রক্তকরবী অথবা মুক্তধারা কে কবে দেখেছেন? বিসর্জন এবং চিরকুমার-সভা ক্বচিৎ দেখা দিয়ে সারা বছর বা দীর্ঘতর কাল অদৃশ্য। বাংলার নাট্যসাহিত্যে এবং নাট্যমঞ্চে একই ঘনান্ধকার।

সমবায়ী যুগের দৃষ্টি যেখানে শিল্পে পৌঁচেছে তার আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা নভেলের কথা পুনর্বার স্মরণ করতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নূতন শিল্পের সৃষ্টি, তার পিছনে রয়েছে কলকাতা শহর। শুধু কমলাকান্তের দপ্তর নয়, রাজসিংহ ইন্দিরা বা দেবী চৌধুরাণী যিনি রচনা করেছেন তাঁর মনের উপর নূতন যুগের প্রভাব পড়েছে; শরৎচন্দ্রের রচনায় এ-শিল্পচেতনার ব্যাপকতর উজ্জ্বলতর পর্ব প্রকাশিত। শ্রীকান্ত যেখানেই পরিভ্রমণ করুক বনেজঙ্গলেও তার মনের সমালোচনা আধুনিক বিচারশীল, মানুষের স্বতন্ত্র অধিকার সম্বন্ধে নিরন্ত উৎসাহী। "পল্লীসমাজ" যে-দৃষ্টিতে দেখা হ'ল তা কেবলমাত্র পল্লীবাসীর নয়, শহরবাসীর দৃষ্টি সেখানে প্রত্যক্ষতর। কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস, হয়তো সব দিক বিচার করলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গোরা, এই বহু সূক্ষ্মদৃষ্টির শিল্প; তারই সঙ্গে নাম করা যায় চতুরঙ্গ এবং ঘরে-বাইরে এই উপন্যাসদুটির। এই গল্পগুলিতে যিনি দেখছেন তিনি আপন স্বভাবের বহির্বর্তী বিভিন্ন জাতীয় মানুষের জীবনীকে এবং সমাজের বিশেষ পরিবেশকে অস্তিত্বের চরম মূল্য দিয়েই জেনেছেন। কোনো গল্প ঘটনা-বিরল, কোথাও বহুজীবনগ্রথিত

শাহরিক ভূমিকা স্পষ্ট দেখা দিয়েছে, কিন্তু ঘটনার মূল্য মানুষেরই, এবং ভূমিকা সার্বভৌম। কোনো মন-গড়া ছাঁচ, বা জাতিভেদ বা বৃত্তিপূজা শিল্পকে খণ্ডিত করেনি; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সার্বজনীন। সেদিন তারাশঙ্করবাবুর কবি নামক উপন্যাস প'ড়ে মনে হচ্ছিল এ ধরনের বিচিত্র গল্প-সাহিত্য এর পূর্বে বাংলা দেশে রচিত হতে পারত না। একভাবে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের কালেও নয়। এর পিছনে যে মননের ভূমিকা আছে তা বহুজীবনীমিশ্রিত নূতনতর নাগরিক, যদিও এই বিশেষ গল্পটিতে গ্রাম্য ছবি উৎসুক মনকে অধিকার করে নেয়। বহুধা-বিচিত্র জীবন ও জীবিকার হাজার সুতোয় গাঁথা যে বুনোনি তারই শিল্প বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালিকে মিশিয়েছে আরণ্যকের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, দুয়ের মধ্যে সেতু সুস্পষ্ট যদিও গল্পদুটির লক্ষ্য স্বতন্ত্র। পদ্মানদীর মাঝি, জননী জন্মভূমিশ্চ প্রত্যেকটিই বিশিষ্ট শিল্পরচয়িতার ভিন্ন মাননিক সৃষ্টি কিন্তু উপন্যাসের ধর্ম অর্থাৎ বিবিধ ঐক্যসঞ্জাত শিল্পের ক্ষেত্রে তারা একই যুগের। মহাপ্রস্থানের পথে এই নব যুগশিল্পেবই প্রকৃষ্ট উদাহবণ; যে-মন তীর্থে বেরিয়েছে তার কাছে মানুষেব বৃহৎ জীবনই তীর্থ। ছোটোগল্পের বিস্তৃত প্রসঙ্গ এখানে তুলব না, কিন্তু নূতন বিশ্বসাহিত্যের পরম আশ্চর্য দুটি গল্প, প্রমথ চৌধুরীর আহুতি এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের দু কান কাটা শুধু কারু-দক্ষতায় নয়, নিগূঢ় একাত্মক মননশিল্পের পরিচয়ে যথার্থ আধুনিক। চিত্তের সমভাবিতা এবং অকুণ্ঠিত জীবনদর্শন ঐ সংহত শিল্পসৃষ্টির ক্ষুদ্রায়তনে মানব-চরিত্রের বৃহৎ একটি অবকাশ রচনা করেছে; যেটুকুই দেখছি সব মিলিয়ে দেখি, মনের মানদণ্ড গ্রামে শহরে একই শুভ্রতায় বিচারশীল। গভীর ভাবনা এবং বিচিত্র দৃষ্টির সহযোগে যে-মমত্ববস এই-জাতীয় শিল্পে সঞ্জাত হয় তার আভিজাত্য কোনো সামাজিক সংবিধানে নির্ধারিত নয়, তা দরদী নূতন কালের অনুভূতির সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

বিশেষ এক-জাতীয় শিল্পের কথাই এখানে আলোচনা করেছি; বলা বাহুল্য অন্যবিধ উৎকর্ষ শিল্প আধুনিক কালেও গল্পে কবিতায় দেখা দিচ্ছে।

ইংরেজি ও মাতৃভাষা

প্রিয়বরেষু,

পৌষ-ফাল্গুনের কবিতা পত্রিকায় আপনার প্রবন্ধটি খুব ভালো লাগল। "ইংরেজি ও মাতৃভাষা" নামে ঐ রচনা আশা করি বহুল প্রচারিত হবে; ইংরেজিতেও ভারতের নানা জায়গায় বেরোনো দরকার। বিষয়টা প্রকাণ্ড জটিল, ভবিষ্যৎ দূরে থাক্ ঠিক এখনই কী ব্যবস্থা দাঁড়াবে বলা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ভাষার মূল্য যেখানে গভীর সেই কেন্দ্রিক স্থানে ক্রমান্বয় আলোচনা জাগিয়ে রাখা চাই। আপনি বাংলা ভাষার এবং বাংলা সাহিত্যের ভিতরকার কথা তার সৃষ্টিশীল প্রবাহের দিক থেকে সুস্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন; এই আলোচনায় যোগ দেবার অধিকার তাঁদেরই যাঁরা ভাষাকে চিন্ময় জ্ঞানময় সত্তার অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জানেন।...

রাষ্ট্রিক দিক যে নেই তা নয়, খুবই আছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য রক্ষা হবে সংস্কৃতির বৃহত্তর ভূমিকায়,— আশা করি প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকার সে-কথা বুঝবেন। বাংলাদেশের সাহিত্যবুদ্ধি এবং জাতীয়তা কারও চেয়ে কম নয়, আমাদের বিশেষ দায়িত্ব যেন প্রাঞ্জল অনুশীলন এবং প্রচারের দ্বারা আমরা অনেকখানি আলো-হাওয়া এই "সঙ্গে চারিয়ে দিতে পারি। "কবিতা"র পৃষ্ঠায় আপনি তাই করেছেন।...

আমি দূরে আছি, সব জিনিসটাকে যা' য়ে দেখতে পারছি না। ভারতের প্রত্যেক জাতীয় ভাষাকে চরম এবং স্বতন্ত্র মূল্য না দিয়ে পারি না; ইংরেজিকেও সেই ভারতীয় ভাষামণ্ডলীর অন্তর্গত ব'লেই জানি। দেশজোড়া মানসিক এবং বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে ইংরেজি আধুনিক যুগের ভারতবর্ষে ক্ষীয়মাণ হতে থাকবে তা ভাবাই যায় না, কেননা আজকের পৃথিবীতে সর্বরাষ্ট্রিক একটি বা একের বেশি বহুসচল ভাষার দাবি বেড়ে যাচ্ছে; কমছে না। খাঁটি সাহিত্যের দিক থেকে আমার মনে কিছু খটকা আছে,— ভারতবর্ষ যে ইংরেজি ভাষায় উৎকৃষ্ট সৃষ্টির পরিচয় দেবে, সহজ প্রত্যহ অধিকারে আপন গরিমা প্রকাশ করবে তার আশা কম। কেনই বা তা আশা করব। বস্তুত, আজকের ভারতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার উৎকর্ষের দিক থেকে নিচুতে নেমেছে, এবং হয়তো

আরো নামবে, যদিও সংখ্যায় হয়তো বেশি লোক ইংরেজি ব্যবহার করে এবং করবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষাও থাকবে ভারতের অন্যান্য জাতীয় ভাষার পাশাপাশি ; বিশেষ গরিমার স্থান তার না-ই বা হ'ল,— ইংরেজি ব্যবহারের স্রোত ভারতে মুক্ত রাখাটাই প্রধান কথা। সাহিত্যসৃষ্টি মুখ্যভাবে চলতে থাকবে প্রত্যেক ভারতীয় অঞ্চলের নিজস্ব ভাষায়। আপসে এইটে মেনে নিতে দোষ কী ?…

বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত চিঠি। ১০ জুন, ১৯৫৮। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত

এজরা পাউণ্ড

'কবিতা'র দরবারে পত্রাঘাত

হাওয়ায় ছড়ানো রাঙা, উজ্জ্বল লাল রাঙা, তামার সঙ্গে হলদে আর সবুজ ডোরা-কাটা পাতা, ঝরা পাতা, লক্ষ লক্ষ ঝরা পাতা বাগানে, পথের দু-পাশে, বাড়ির দরজা পর্যন্ত পুরু হয়ে আছে। হেমন্তের অজস্রতায় আকাশ পর্যন্ত অন্তিম সোনালি বনবাষ্প চোখে ঘোর আনে। তার মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রকৃতির অবিশ্বাস্য রক্তিম, কখনো শব্দহীন, কখনো উদাসীন অস্ফুট ঝিরিঝিরি দুপুরের পথে কড়া-পাহারা-ঘেরা আরোগ্যভবনের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হলাম। তার পর অনেক লোহার দরজা, কাচের দরজা, ঘুরোনো সিঁড়ি, বইয়ে সই করা, মনের ডাক্তারকে বোঝানো, মধ্যে-মধ্যে সম্পূর্ণ যেন অন্য জগৎবাসী এমন চোখের-ভাব মানুষ দু-একজনকে হঠাৎ যেতে দেখা, কেউ ব'সে আছে শেষসময় তার অর্থহীন অপেক্ষায় বহন ক'রে, কারো মুখে কান্না পাথর হয়ে গেছে, এখন আর ভাষা নেই, কেবল আঙুল ঘোরাচ্ছে— এই প্রত্যন্ত বিরূপ প্রাণধারণের একটি ঘরে এজরা পাউণ্ড দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। খুব সমাদরে করমর্দন ক'রে মস্ত জনসাধারণের বসবার ঘরটা : কোনায় জানলার কাছে বসালেন। বাহিরে ক্রমাগতই হেমন্ত ঝরছে, সোনার মেঘ, কিন্তু "বসন্তের এই চরম ইতিহাসে"র সঙ্গে আবদ্ধ কবির সাদৃশ্যই মনে আনলাম— সেং প্রকাণ্ড পাতাঝরা মুক্ত সমারোহে নেমে গিয়ে যোগ দেওয়ার উপায় তাঁর নেই।

দুই

মনোভবনের নাম-শহর এখনো এই চিঠিতে অলিখিত রইল। কেবল অদ্ভুত কবির আরো অনেক বেশি অন্যায় অদ্ভুত সামাজিক অবস্থানের ভূমিকাটুকু দিতে চাই। রাশি-রাশি বর্ণঝরা হলদে পাতার ভূমিকার সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি অবসানপর্বের রহস্যে রঙিন উত্তেজন-চিত্র। এইটুকু শুধু বলবার অনুমতি আছে যে মুসোলিনির প্রেত-পর্যায়ের শেষ দিকে যখন সমুদ্র-পারের দৈত্য-আক্রমণে ইটালি ভেঙে পড়ল, এজরা পাউণ্ড তখনো রাপালো শহরেই ছিলেন। জর্মানরা

তাঁর ত্রিশ-বছর-বাসিত সমুদ্রের ধারের বাড়িটা দখল করেনি, যদিও সবত্র তাদেরই উগ্র প্রতাপ ; ইতিমধ্যে তাঁর স্বদেশীয় "মিত্র" বাহিনী এসে সমস্ত রাপালো ঘিরে ফেলল এবং শত্রুপক্ষের তিনি সমর্থক এই চরম অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। বহুকাল কারো জানবার উপায় ছিল না তিনি জীবিত কি নিহত। চতুর্দিকে বিপ্লব, গুলি-ব্যারুদ, সৈন্যবাহিনী। মধ্যযুগীয় নরকের আধুনিক সংস্করণ লেখবার দান্তে আজ নেই, থাকলেও পৃথিবী-জোড়া হন্তারক পর্বের বর্ণনা লিখতে তাঁকে অন্য কোনো গ্রহে প্রবাসী হয়ে বিজয়ের ভিন্ন পথ দেখাতে হ'ত। কালো কাহিনী চাপা থাক্‌। কেবল এই কথাও জানা চাই যে, যে-অভিযোগে আরো অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে এবং অন্য পক্ষের নীতি অনুসারে ঘাতক একটুও দেরি করত না তার থেকে পাউণ্ডকে বাঁচানো হয়। অপরাধী হয়তো বা তার মনের দিক থেকে সুস্থ নয় এইটুকু সংশয়ের স্থানরক্ষা দ্বারা মিত্র সামরিকের খানিকটা কৃপা প্রকাশ হ'ল বই-কি। পিসা শহরের বন্দী-খাঁচায়, ঘরে নয়, পাউণ্ড তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কবিতার বই *Pisan Cantos*-এর অনেকাংশ লেখেন। দৈব-ক্রমে গরাদের ধারেই মাটি, সেখানে পিঁপড়ের সারি মুক্ত হয়ে ঘুরছে, উপরে মেঘ, দূরে রাস্তা, রাত্রের অসহ্য সহস্রশক্তি বিদ্যুৎচক্ষু[১] পেরিয়েও নীলাভ আকাশ। সমস্তক্ষণ শস্ত্র, শিকল, লোহার চাকা এবং লৌহ-পদক্ষেপে ছিন্ন হাওয়ার চীৎকার, তবু কানে দুটো-চারটে ধ্বনি আসে যা বর্মহীন সাধারণ মানুষের, যারা ফল রুটি বিক্রি করতে বা ধোপার কাজে বাহিরের পৃথিবীর প্রতীক তাদের কথাবার্তা শোনা যায়। জটিল মস্তিষ্কের রচিত কঠিন রচনার ফাটলে এই-সব সাধারণতার সুর নিয়েই *Pisan Cantos*-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ।[২] মধ্যে-মধ্যে বেদনা অন্ধকার ক'রে আসে, আবদ্ধের প্রতিকারহীন দিগন্তে অস্তিত্বের ছায়া বিলীয়মান—

> ...the phantom mountain above the cloud
> But in the caged panther's eyes :
>
> "Nothing. Nothing that you can do..."

---

১ the excess electric illumination
is now focussed.........(*Pisan Cantos*, p. 43)

২ that stone angle all of his scenery (*Pisan Cantos*, p. 60, 61,)
কিন্তু পৃথিবীর মাটি পার্শ্ববর্তী। তাই কবিতার ইঙ্গিতে এই প্রশ্ন দেখা দিল—

> Is there a sound in the forest
> of pard or of bassarid
> or crotale   or of leaves moving ?

green pool, under green of the jungle,
caged : "Nothing, nothing that you can do."

* * * your eyes are like clouds

Nor can who has passed a month in the death cells
believe in capital punishment
No man who has passed a month in the death cells
believes in cages for beasts

* * * your eyes are like the clouds over Taishan
When some of the rain has fallen
and half remains yet to fall (p. 108)

ঝরঝর ক'রে বৃষ্টি পড়ে, কিন্তু অসমাপ্ত বেদনার পরপারে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দূরান্তরীণ কবি দেখতে পান—

The roots go down to the river's edge
and the hidden city moves upward
white ivory under the bark (p. 108)

দৃশ্যের ওপারে প্রকাণ্ড শাদা শহর। তার পরে রাত্রির পাহাড়।

and now the new moon faces Taishan
one must count by the dawn star
Dryad, thy peace is like water (p. 108)

রাত্রি কেটে যায়। পুনর্বার সকালের রোদে পৃথিবীর মুক্ত প্রাণচ্ছবি।

And now the ants seem to stagger
as the dawn sun has trapped their shadows,

Cythera, here are lynxes
Will the scrub-oak burst into flower ?
There is a rose vine in this underbrush
Red ? white ? No, but a colour between them
When the pomegranate is open and the light falls
half thru it (p. 68)

যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর হাওয়া আলো এসে পৌঁচচ্ছে; স্মৃতির উজ্জ্বলতরতায় লাল গোলাপের লাল আরো স্পষ্ট তুলিতে রঙিন, দেখাচ্ছে যেন ডালিমের দানার মধ্য দিয়ে আলো ভিতরের দিক থেকে রক্তিম। Pound-এর Cantos রূপের নেশায় ভরা; ছোটো-ছোটো গীতিকাব্যের মুক্তো ছড়ানো।

this breath wholly covers the mountains
it shines and divides
it nourishes by its rectitude
does no injury
overstanding the earth it fills the nine fields
to heaven *(p. 109)*

মাটির জগতে সূর্যের করোজ্জ্বল দানে তো অবিচার নেই। কেননা সমতার নিয়মে সৃষ্টিলোক চলেছে, সেখানে অমোঘ নিয়ন্ত্রণের প্রতীক সূর্য।

Boon companion to equity
it joins with the process
lacking it, there is inanition

*

If deeds be not ensheaved and garnered in the heart
there is inanition

*

the sun as a golden eye
between dark cloud and the mountain (p. 109)

দেখতে-দেখতে বন্দীশিল্পীর দৃষ্টি সমস্ত যা-কিছুর সঙ্গে ছবিতে এক হয়ে যায়। সেই ছবিতেই মুক্তি।[৩]

---

৩ *Pisan Cantos* ছবিতে ভরা :

ক morning moon against sunrise
like a bit of the best antient greek coinage (p. 113)

*

খ And the sun high over horizon hidden in cloud bank
lit saffron the cloud ridge
dove sta memora

*

............Primavera
in the timeless air......... (p. 30)

গ the olives grey over grey holding walls
and their leaves turn under Scirocco . . . . (p. 31)

ঘ corn flower, thistle and sword-flower
to a half metre grass growth,
lay on the cliff's edge

When the mind swings by a grass-blade
an ant's forefoot shall save you
the clover leaf smells and tastes as its flower (p. 111)

Shall save you— তা না হলে তিনি বাঁচতেন না, অথবা ধ্বংস হয়ে বেঁচে থাকতেন। কিন্তু যদিও কড়া শাসনে দিনের পর দিন আসে—

With drawn sword as at Nemi
day comes after day (p 45)

তবু পৃথিবীর ভাণ্ডার বন্ধ হয় না। হঠাৎ প্রজাপতি ঘরে ঢোকে, বেরিয়ে যায়[১], অনেক অন্যায়ের প্রতিকার মনে হয় তার পাখার ছন্দে, রঙে; সূর্যাস্তের মেঘ পাহাড় মনে হয় স্বর্গলোকের[৫]; যার পক্ষে "a day as a thousand years" (p. 9) তারও কাছে ইটালীয় বসুন্ধরা শাদা রাস্তায় প্রাণপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে থাকে[৬]। যখন মন ভেঙে পড়ছে তখন "a lizard upheld me"— তাঁকে স্থির ক'রে দেয় বিশ্বের প্রাণ; ঝিনুকের মধ্যে সবুজ আলো, পুণ্য চাষের ক্ষেত্রে লাঙলের দাগ, পশমের গুটিপোকা তাঁর কাছে অত্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে[৭]।

---

to Helia the long meadow with poplars

the mountain and shut garden of pear trees in flower
here rested. (p. 36)

মধ্যধরণীসাগরবেষ্টিত দক্ষিণ-য়ুরোপের পথ ঘাট দৃশ্য, বিশেষ করে ইটালির, এই কবিতায় চিত্রময়। দক্ষিণ-ফ্রান্সের ছবিও মনকে মুগ্ধ করে।

That butterfly has gone out thru my smoke hole (p. 39)

as a corona of angels
one day were clouds banked o. Taishan
or in glory of sunset (p. 8)

and there was a smell of mint under the tent flaps
especially after the rain
and a white ox on the road toward Pisa
as if facing the tower,
dark sheep in the drill field and on wet days were clouds
in the mountain as if under the guard roosts.
A lizard upheld me...... .. (p. 6)

whose prayers,
the great scarab is bowed at the altar
the green light gleams in his shell
plowed in the sacred field and unwound the silk worms early
in tensile. . . . (pp. 6-7)

এজরা পাউণ্ডের বক্তব্য তিনি কবিতায় একত্র স্পষ্ট বলেননি, পাথরের নুড়ির মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর এলোমেলো মনোময় ছন্দের তলে-তলে তা প্রত্যক্ষ দেখা শক্ত নয়। ছবির সঙ্গে গাঁথা হয়ে তাঁর মনের অব্যবহিত ধারণা প্রকাশ পায়, প্রকাশ্য ধার্মিকতার প্রয়োজন হয় না :

without a painted paradise at the end of it
the dwarf morning-glory twines round the grass-blade (p.14)

যারা নিতান্ত মানচিত্রময় নির্ধারিত স্বর্গ চায় তাঁদের ভাষা তাঁর কাছে তাই দুর্বোধ্য—

I don't know how humanity stands it
with a painted paradise at the end of it (p. 14)

এ-সব কথা হাস্যময়, নিগূঢ়, যারা বোঝে না তাদের বোঝানোর উপায় নেই। কিন্তু *Pisan Cantos*-এর লেখক জানেন যে যারা বন্দী, যারা দাসের সঙ্গে দাসত্বের সাহচর্যে বর্বরতার দিকে চালিত, তারাও চিরন্তন সত্য প্রকৃতির সঙ্গতায় বিধৃত, তারা কখনো একাকী নয়[৮], তাদেরও অন্তরে মুক্ত হতে বাধা নেই। কেননা বন্ধন নিজের মনের বন্দীদশায়, সেখানে আলো প্রজ্বলিত হলে বোঝা যায়

Sunt lumina
that the drama is wholly subjective
stone knowing the form which the carver imparts it
the stone knows the form (p. 8)

আত্মসৃষ্টির রহস্য এই শিল্পীর অজ্ঞাত নয়। ধ্বংসের রহস্যও নিজের মধ্যে তিনি জানেন[৯], দোষ দেওয়া চলে না। বাহিরে সম্পূর্ণ আশ্চর্য এই যে অত্যন্ত খেয়ালী

---

৮ a man on whom the sun has gone down
and the wind came as hamadryas under the sun-beat
Vai soli
are never alone
amid the slaves learning slavery
and the dull driven back toward the jungle...... (p. 9).

a man on whom the sun has gone down
nor shall diamond die in the avalanche
be it torn from its setting
first must destroy himself ere others destroy him. (p. 8)

অদ্ভুত বিচিত্রমানস, এমনকি উদ্‌ভ্রান্ত কবি এই-সব কথা বলতে পারলেন, যদিও তাঁর রচনার স্বেচ্ছাকৃত গোলক-ধাঁধায়— অনেকটা তার কারণ আত্মবিনয়— অনেক পাঠকের লক্ষ্য স'রে যাবে। য়ুরোপে এবং আমেরিকায় যে এজরা পাউণ্ডের এ-সব কথা আজকাল অনেকে ধরতেই পারে না তা আশ্চর্য নয়। হয়তো বুঝতে চায়ও না। কেননা শাদা চোখের দৃষ্টিতে, হোক না তা অর্ধ-পাগল বা নির্লজ্জ শিশুভাবের দৃষ্টি, সংসারের অনেকখানি আবছায়া অপচ্ছায়া ধরা প'ড়ে যায়, সভ্যতার পক্ষে সেই নিরাবৃতা সহ্য করা শক্ত।

Ezra Pound-এর *Pisan Cantos* সম্বন্ধে এই কথা বলা প্রয়োজন যে, আধুনিক হিংস্র পক্ষ-প্রতিপক্ষের সাম্রাজ্য, জাতি বা সম্প্রদায় যত বৃহৎ কপট সাধুনামেই আপন নরঘাতবৃত্তি ঢাকুক না কেন, তিনি তাতে ভোলেননি। তাঁর দুঃখে শোধিত দৃষ্টিতে যুদ্ধ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, যদিও তার পুরো হিসাব এখনো অঙ্কের অতীত—

we have not yet calculated the sum   gorilla + bayonet
(p. 23)

কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ নেই যে,

woe to them that conquer with armies
and whose only right is their power.   (p. 41)

তাই ধুয়োর মতো তাঁর সৈন্যপরিবৃত বন্দীদশার কাব্যে বারবার ধ্বনিত হয়েছে—

there are no righteous wars in "The Spring and Autumn"
(p. 103)

In the spring and autumn
In "The Spring and Autumn"
there
are
no
righteous
wars   (p. 61)

য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরেও যে মানুষ বেঁচে আছে তার এই দৃশ্য :

As a lone ant from a broken ant-hill
from the wreckage of Europe, ego scriptor.   (p. 36)

প্রশ্ন উঠতে পারে *Pisan Cantos*-এর বক্তব্য কী? বলা ছাড়া কবিতার বক্তব্য নেই এইটেই বড়ো কথা, কিন্তু বিশেষ কোনো ভাবনা যা শিল্পের উপকরণ এবং অঙ্গীকৃত তাকেও পৃথক দেখা সম্ভব: সেদিক থেকেই পূর্বের বিশ্লেষণ করেছি। আত্মক্রুদ্ধ সমাজ ধনের অসমতায়, জাতি-বিদ্বেষে যন্ত্রে-বাঁধা কুশ্রীতার চরম দুর্যোগে উপস্থিত হয়েছে, এই নিয়ে বন্দী শিল্পীর আক্রমণ, কিন্তু মানুষের স্ববিরোধিতার হিংস্র পর্ব হতে মুক্তির নির্দেশ তাঁর পক্ষে শিল্পের পথেই নির্দিষ্ট, অন্য প্রতিকারের ইঙ্গিত থাকলেও তা উপস্থিত আলোচনার বহির্গত। কনফ্যুসিয়ান নীতি অনুসারে সভ্যতার পুনর্গঠন এজরা পাউণ্ডের বহুকালের ঈপ্সিত বিশ্বাস, বিশেষ ক'রে খাজনা দেওয়া এবং আধুনিক ধনতন্ত্রের উপর তাঁর আক্রোশ— বস্তুত অর্থনীতির তত্ত্ব এবং দৃষ্টান্তে বেশির ভাগ Cantos জর্জর ভারাক্রান্ত।[১০] নিশ্চয় তারও সূক্ষ্ম তারতম্য-বিচার প্রয়োজন, কিন্তু শিল্পের মধ্যেই যে উত্তর নিহিত আমার কাছে তারই মূল্য চরম। কেননা দৃষ্টির যে-স্বচ্ছতায় সত্য আপনি বিচারিত এবং প্রকাশিত, তার শিল্প শুধু সাহিত্যে নয় সমস্ত সভ্যতার উৎকর্ষে ক্রিয়াশীল। সেইখানেই সন্ধান।

Under white clouds, cielo di Pisa
out of all this beauty something must come, (p. 117)

---

১০ অনেকেই কবির প্রথম লাইনে কবির সঙ্গে স্বস্তি অনুভব করবেন; পরের পদগুলিতে নানা তথ্য ও তত্ত্বের মিশোল আছে,—

Oh to be in England now that Winston's out
Now that there's room for doubt
And the bank may be the nation's
And the long years of patience
And labour's vacillations
May have let the bacon come home, (p. 92)

"may be" কথাটা লক্ষণীয়। এ-সব বিষয়-ব্যাপারে পাউণ্ডের উত্তেজনা তীব্র এবং নানা অতিনির্দিষ্ট মতামতের উদ্ভত ইতিহাসে জটিল; সাধারণের পক্ষে কবিতায় তাঁর বক্তব্য নির্ধারণ করা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু এ-সব কথা বোঝা কঠিন নয়—

to look at the fields; are they tilled?
is the old terrace alive as it might be
with a whole colony
if money be free again? (p. 92)

Pisan Cantos-এও পুরোনো চীন ধন-নীতি, কর বা শুল্ক আদায়, Griselle বা Douglas-এর অর্থনীতি ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে মধ্যযুগের ইতালীয় এবং বর্তমান মনুষ্যসমাজের অবশ্যম্ভাবী যোগ, John Adams-এর স্তুতি, ইতিহাস পুরাণ কিংবদন্তী জনশ্রুতি, স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় প্রাপ্ত অবোধ্য বা অর্ধবোধগম্য নানা উল্লেখের কাণ্ডকারখানা আছে।

অনুভূতিই উত্তর; বাহিরের শুভ্রা প্রকৃতিও মেঘে, শান্ত গাছের ছন্দে, সমধর্মিতার অপেক্ষা মেলে আছে। শিল্পের আলোক এখানে অবাধে সঞ্চারিত,

for those trees are Elysium
for serenity
under Abélard's bridges
for those trees are serenity (p. 90)

পুরোনো আঁকা ছবির প্রসঙ্গে Cantos-এ এই শান্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে; অন্যত্র বলছেন—

in the stillness outlasting all wars (p. 5)

সেই নিবিষ্ট মৌনই তাঁর কেন্দ্র।

"OMNIA,
all things that are are lights" (p. 7)

To study with the white wings of time passing
is not that our delight (p. 15)

যে-মানুষের মৃত্যুধৌত দৃষ্টি বারবার চরম মুহূর্ত স্পর্শ ক'রে খুলে গেছে

sinceritas
from the death cells in sight of Mt. Taishan @ Pisa
as Fujiyama at Gardone (p. 5)

তার শিল্প নিয়তই স্বচ্ছতায় পর্যবসিত।[১১] তখন সে বলতে পারে

what whiteness will you aad to this whiteness,
what candor ? (p. 3)

Pisan Cantos-এ সাযুজ্যের শুভ্র একদৃষ্টি— যাকে শিল্পযোগ বলা যায়— তা বারবার প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণানেকান্‌-এর দোয়াতে কলম ডুবিয়ে সেই কেবলমাত্র অস্তিতার শিল্প এজরা পাউণ্ড দেখাতে পেরেছেন, মনে হয় যা দেখছি তার সঙ্গে দৃষ্টির বাধা নেই—

ক What you depart from is t the way
and olive tree blown white in the wind (p. 3)

---

১১ Hast 'ou seen the rose in the steel dust
(or swansdown ever ?)
so light is the urging, so ordered the dark petals of iron
we who have passed over Lethe. (p. 27)

লক্ষণীয়: "we who have passed over Lethe."

খ till the shrine be again white with marble
till the stone eyes look again seaward

(গ্রীক দেবমূর্তির কথা বলা হচ্ছে)

The wind is part of the process
The rain is part of the process

and the Pleiades set in her mirror
Kuanon, this stone bringeth sleep...[১২] (p. 13)

সেখানে সময় পৌঁছয় না—

ক no vestige save in the air
in stone is no imprint and the grey walls of no era
under the olives (p. 16)

খ as grape flesh and sea wave
undying luminous and translucent[১৩] (p. 10)

গ autumnal heavens *sha-o* (চীন উল্লেখ)
with the sun under its melody
to the compassionate heavens (p. 18)

ঘ . in the soft air (গ্রীক উল্লেখ)
with the mast held by the left hand
in this air as of Kuanon
enigma forgetting the times and seasons
but this air brought her ashore a la marina
with the great shell borne on the seawaves[১৪] (p. 21)

---

১২ Pisa-র বন্দীশালায় নিদ্রাহীন মন পাথরের স্পর্শে শান্তি পেয়েছে, নানা স্থানে তার উল্লেখ আছে, কখনো গাছের মর্মর শোনা যায় ; যদিও অবান্তর ভাবে বলার ভঙ্গি—

ক for this stone giveth sleep
staria senza piu scossa
and eucalyptus that is for memory (p. 13)

খ Her bed-posts are of sapphire
for this stone giveth sleep. (p. 37)

১৩-১৪ আরো দৃষ্টান্ত :

This Goddess was born of sea-foam
She is lighter than air under Hesperus

a petal lighter than sea-foam (p. 70)

ঙ (পূর্বে দ্রষ্টব্য) . Primavera
in the timeless air (p. 30)

Pisan Cantos সম্প্রতি পেয়েছি, পড়তে-পড়তে সেদিন অনেক রাত হয়ে গেল। পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা করবার আগে মনকে ডুবিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, দেখি অনেক জায়গায় কবিতা অতি গভীর। তাঁর আধুনিক জীবনের প্রাসঙ্গিকতায় এই কাব্য বোঝা সহজতর হবে, তাই দুইয়ে মিশিয়ে কিছু নমুনা দিলাম— সমস্ত রচনা নানা ভাবে প্রশস্ততর বিবিধ বিষয়াক্রান্ত। এর মধ্যে Yeats-এর কথা বহুবার আছে, রবীন্দ্রনাথের বাক্যের উল্লেখ এবং কবীরের নাম এক জায়গায়, আর্ট, শিল্প, বাণিজ্য, বহু লোকজন, দেশবিদেশের ছিন্ন ইতিহাসের অসংলগ্ন সঙ্গতায় ভরা স্মৃতি ও খেয়ালে মেশা ব্যক্তিগত যাতায়াতের চিহ্ন। কিন্তু পড়তে গিয়ে হঠাৎ মন চমকে ওঠে, কোথায় যেন দরদের হাওয়া দেয়, ছবির মাধুর্যে থেমে যেতে হয়। শিল্পদৃষ্টির যাথার্থ্য, যা সর্বমেবাবিশন্তি, তার উদাহরণ কিছু দিয়েছি, কিন্তু সেই চোখের ধ্যানের মূল কোথায়। সেটাও এই কাব্যে গোপন নেই, যদিও সকল নিয়ম ও চিহ্ন অনুযায়ী *Pisan Cantos* ঘোর আধুনিক। মূল কথা বলার লজ্জা তাঁর ঘুচেছে, বোধ হয় এইটেই শেষতম আধুনিকতার লক্ষণ। বন্দী কবি জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, ধারিণী ধরিত্রীর বৃক্ষলোক আলো ও অন্ধকার মণ্ডলের খুব কাছে এসে হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে এই জীবন উর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ, এর শিকড় খুঁজতে অভিজ্ঞতার ভিড়ে নামলে চলে না ; যেখানে প্রিয়তা, শিল্পের ভাষায় ভালো লাগা, সেইখানে ফিরলেই দরজা খুলে যায়। বাহিরের দরজায় বারবার মাথা ঠুকে লেখক নম্র স্বরে— কতখানি স্বরের বদল— দ্বিধাহীন নম্র স্বরে বলছেন—

filial, fraternal affection is the root of humaneness
the root of the process
nor are elaborate speeches and slick alacrity. (p. 15)

এখানে আর-একটি সদৃশ সুন্দর লিরিকের মতো টুকরো উদ্ধৃত না ক'রে পারছি না—

This fruit has a fire within it,
Pomona, Pomona,
No glass is clearer than are the globes of this flame
what sea is clearer than the pomegranate body
holding the flame ?
Pomona, Pomona, (p. 68)

বলছেন,

to have friends come from far countries
is not that pleasure
nor to care that we are untrumpeted? (p. 15)

অত্যন্ত যুদ্ধং-দেহি আধুনিক, যিনি শিল্পের প্রাচীন ভাবভঙ্গির গাম্ভীর্য এবং কলাবিদ্যার দস্তুররীতি লঙ্ঘনে সিদ্ধহস্ত, যাঁকে চতুর্দিক থেকে সংঘবদ্ধ আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে, অথচ পশ্চিম-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা যাঁর অনুকরণ করেছেন, তাঁর কলমে এই স্নিগ্ধতা অনেকের কাছে নতুন ঠেকবে। কিন্তু যারা পাউণ্ডের যথার্থ পাঠক তারা জানে প্রথম হতেই নিজের সম্বন্ধে এঁর আশ্চর্য মৃদুতা এবং সলজ্জ ভাব প্রকাশ পেয়েছে— তাতে অবশ্য মত নিয়ে মহাতর্কে একটুও বাধেনি[১৫]। কবি য়েট্‌স্ তাঁর "A Packet for Ezra Pound"-এ যা লিখেছেন তাতেও আভাস পাওয়া যায়। য়েট্‌স্ একটি কবিতায় জনাথান স্যুইফ্‌ট্ -এর "fanatic heart"-এর কথা বলেছেন, অত্যন্ত দরদী হৃদয়, অথচ কারো প্রতি কারো একটুও অন্যায় বা মতামতের যথার্থ কিংবা কল্পিত অন্যায় সহ্য করতে না পেরে যেরকম একরোখা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, Poundও সেই বিশেষ শ্রেণীর দরদী। এই বইয়ে পাউণ্ড যে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে আরো সহজ ও নিবিড় হৃদ্যতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

nothing matters but the quality
of the affection—
in the end— that has carved the trace in the mind
dove sta memoria (p. 35)

এই ভাষা একটু অন্য; পূর্বেকার cantoগুলি হতে দ্রুততর গভীর লক্ষ্যভেদী, লক্ষ্য ফিরে এসেছে নিজের দিকে।

"Missing the bull's eye seeks the cause in himself" (p. 46)

জনাথান স্যুইফ্‌ট্ -এর কচিৎ পত্রে যে-সুর পাওয়া যায়, যা তাঁর অন্য রচনায় নানা আওয়াজে চাপা পড়েছে, *Pisan Cantos*-এ সেই সুরই মূল ধুয়ো।

---

১৫ আধুনিক এক সমালোচক লিখছেন, "He has always been, as Eliot has recently said, quite unassuming about his own poetry; his arrogance has sprung mainly from his zeal for artistic creation, wherever it is found. That almost impersonal zeal......"— Louis L. Martz

What thou lovest well remains,
the rest is dross
What thou lov'st well shall not be reft from thee
What thou lov'st well is thy true heritage
Whose world, or mine or theirs
or is it of none ? (pp. 98-99)

কেবল মানুষের তৈরি পৃথিবীতে থামলে পৌঁছনো যায় না, প্রাণের সর্বাঙ্গীন স্তরে শিল্পীকে আসতে হয়, পূর্ণতর দৃষ্টি সেইখানে। তাই পাউণ্ড লিখেছেন,

What thou lovest well is thy true heritage

The ant's a centaur in his dragon world.
Pull down thy vanity, it is not man
Made courage, or made order, or made grace,
Pull down thy vanity, I say pull down.
Learn of the green world what can be thy place…(p. 99)

যাকে অন্য পরিভাষায় আধ্যাত্মিক বলা হয়— শিল্পের আপন শব্দাবলী ভিন্ন, এবং দুইয়ে মিশিয়ে লাভ নেই— তার কারুভাষা এই পর্যন্ত। এর থেকে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু এর ইঙ্গিত কেবল স্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে চুপ ক'রে থাকা নয়, কেননা যখন দেখা যায় তখন চলাও সোজা হয়। বলা বাহুল্য চলা একরকম নয়। মানুষের সৃষ্টির চলা কী এবং কতরকম সে-তর্ক এখানে তুলব না।

But to have done instead of not doing
this is not vanity
To have, with decency, knocked

To have gathered from the air a live tradition
or from a fine old eye the unconquered flame
This is not vanity. (pp. 99-100)

শিল্পেরও কয়েকটি আশ্চর্য সংজ্ঞা পাওয়া গেল। বোঝা যায় এজরা পাউণ্ডের তুলির জোরও একটুমাত্র কমেনি। তাঁর নিজেরই ভাষায় (অন্যের সম্বন্ধে) "the old hand as stylist still holding its cunning" (p. 56)। যে-অবস্থায় এই কবিতা লেখা তা কল্পনায় ধারণ করলে এই কৃতিত্বের দাম দিতে বেশি ভুল হবে না। মনে রাখা চাই জীবন-মৃত্যুর মহানতা নয়, তার হীন,

সঙিন-খোঁচানো চীৎকৃত পরিবেশে এই পদগুলি রচিত হয়। রচনার মধ্যে মধ্যে সেপাই-সান্ত্রির কুচকাওয়াজ, রুক্ষ রসিকতা, কখনো বা কৌতূহলের ছুটো কথা ধরা দিয়েছে, এ-ও বোঝা যায় খাঁচা থেকে তাঁবুতে লেখকের বাসস্থান বদল হয়।[১৬] কিন্তু স্বকৃত এবং সর্বজনকৃত বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার তাঁবুতে নেই, পরিবেশের উন্নতিও শেষ কথা নয়, হয়তো অন্য উপায়ের মধ্যে শিল্পের কাছে এমন কোনো চাবি আছে যা কেবল পলায়নী বিদ্যা নয়, যথার্থ শিল্পিত মুক্তি। বিকেল তিনটের ঐ মুহূর্ত পেরোনো তাতে আবো সম্ভব হয়,—

...of the wave receding
but that a man should live in that further terror, and live
the loneliness of death came upon me
(at 3 P. M., for an instant)

three solemn half notes
their white downy chests black-rimmed
on the middle wire
periplum (pp. 104-5)

এইখানে পূর্বে উদ্ধৃত লাইন আবার মনে প'ড়ে যায়,

When the mind swings by a grass-blade
an ant's forefoot shall save you
the clover leaf smells and tastes as its flower (p. 111)

তখন বুঝতে পারি এই পরের লাইনগুলির গভীর ইঙ্গিত—

A fat moon rises lop-sided over the mountain
The eyes, *this time my world,*
(ইটালিকস আমার)
But pass and look *from* mine
between my lids

---

১৬ The shadow of the tent's peak treads on its corner peg
marking the hour. The moon split, no cloud nearer than Lucca.
In "The Spring and Autumn"
there
are
no
righteous
wars (p. 61)

sea, sky, and pool
alternate
pool, sky, sea, (p. 113)

সমস্ত অস্তিত্ব যখন অন্তরে প্রবেশ ক'রে শিল্পিত হয় তখন বাহিরের উপর একান্ত নির্ভরতা ঘোচে। সমুদ্র, আকাশ, জল অন্তরের চক্ষুকে পূর্ণ ক'রে বাঁচায়, সেই চক্ষু ঐ অমন আশ্চর্য চাঁদের শৈলশীর্ষে অভ্যুদয়ের দৃষ্টির চেয়ে কম নয়। এই-সব কথা বলতে-বলতে হঠাৎ কাব্যের যবনিকা পড়ল। কবিতার শেষ হঠাৎ মিলান্ত দুই লাইন সেক্‌সপীয়রের কোনো মহাশক্তি সনেটের হাতুড়ির মতো। ভাব এবং কারিগরির পূর্ণ একটি ছেদ টেনে সমস্তটাকে প্রোজ্জ্বল ক'রে তোলা।

তাঁবুর চার দিকে শীতের বরফ-জমা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, রাত্রিকাল ;

If the hoar frost grip thy tent
Thou wilt give thanks when night is spent. (p. 118)

তিন

মনে হতে পারে রামায়ণে রামের ব্যক্তিগত কথা না বলে তাঁর একটি কীর্তির প্রসঙ্গেই আখ্যান শেষ করছি ; উপায় নেই। পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছি, কিন্তু ইন্টারভ্যু অর্থাৎ কথাবার্তার নির্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশ করা এখনো চলে না। হয়তো পূর্বে যা লিখেছি তার মধ্যে বহু তথ্য অন্তর্লীন হয়ে আছে। পাউণ্ড ডে ন নিয়ে জানলার ধারে বসালেন এবং সব আলোচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন, স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ, তাঁদের লণ্ডনে প্রথম চেনার উৎসুক বর্ণনা দিলেন। রবীন্দ্রনাথই তাঁর কাছে ভারতবর্ষ, বলতে-বলতে তাঁর চোখে জল এল, বললেন জীবনে এসে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একদিন বাংলা গান শুনেছি। এই কথা আমার কন্যা সেমন্তীর হাতের-লেখা খাতায় লিখে দিলেন। গীতিকাব্য যে কোথায় পৌঁছতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনা, তার তুলনা নেই ; সুর বাদ দিয়েও ছন্দে, মিলের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে, গঠনের সৌকর্যে এবং ভাষার ভাবে-ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার সম্রাট্‌শিল্পী। আরো বললেন, বাংলা কবিতার প্রত্যেক আলাদা বাংলা কথা উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে বুঝে নিতেন, ছন্দের কূট আলোচনা করতেন, এমনি ক'রে তাঁর খুব সুস্পষ্ট ধারণা হয়। লিরিক অর্থাৎ লঘুচারী অথচ রূপে ভরা, ভাবের ভাস্কর্যে গড়া গীতকাব্য, বাদ্যযন্ত্রের সংগত বাদেও

আদিম সংগীতভাবাশ্রয়ী যার ছন্দ, যার মধ্যে বেদনা অক্ষরের অন্তর্ধ্বনিতে পদান্তে পূর্ণ হয়ে উঠে একটি বিশিষ্ট অনুভূতির মণ্ডলী সৃষ্টি করে এবং তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দৃশ্য ও পরিবেশকে ভাবের উজ্জ্বলতায় অব্যবহিত দেখা যায়, সেই সর্বাতীত কারুসৃষ্টির জগৎশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। বলতে-বলতে কথায় একটু যে খেই হারিয়ে যায় না তা নয়, উৎসাহে সবারই তা হতে পারে, কিন্তু চীনেরা আর্টকে কেন চারিত্র বলে তা এরই সাংলগ্নিক; অনেকখানি সেই বিষয়ে বললেন। Fenellosa আবার পড়তে অনুরোধ করলেন; পাউণ্ডের কৃত ইংরেজি তর্জমা এখনো পাওয়া যায়। তুলির প্রত্যেক টানেই চরিত্র ধরা পড়ে, অর্থাৎ শিল্পী যা বলতে চায় শুধু তা নয়, তার মনের গড়ন আঁকা প'ড়ে যায়; ছবির বিষয়বস্তু অনেক সময় আপেক্ষিক অদরকারী, কিন্তু সব মিলে শিল্প মানুষকে বলায় গড়ায় আঁকায়। রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, এবং তাঁর শিল্পে যেটুকু বেশি বলে তা একই ধর্মী এবং চারিত্রিক— এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। মনে পড়ল য়েট্স্-এর মধ্যে এই চরিত্রের অভাব, যদিও তিনি উজ্জ্বল শিল্পী, তার কারণ পরিভাষায়, উপমায় এমনকি উল্লেখ, প্রসঙ্গ এবং ঘটনার অবতারণা করার ছলে তাঁকে অনেকখানি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে; তিনি যা বলতে চান তার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য তাই তাঁর রচনার গায়ে লিখিত এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। যা বিশ্বাস করতেন না, যে-সব নিকৃষ্ট ভৌতিকতার জঞ্জালকে তথ্য না মেনেও তথ্যরূপে ব্যবহার করেছেন, তার অলীকতা য়েট্স্-এর গদ্য ও কবিতার অনেক স্থানে দুর্বলতা এবং কৃত্রিমতা এনে দিয়েছে, পাউণ্ডের আলোচনার প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল। পাউণ্ডের কবিতা স্পষ্টবাদী, সত্যবাদী, প্রত্যক্ষ জানা এবং ধারণা বাদে তিনি কাব্যে কিছু বলেন না, তাঁর কবিতার বিপদ একই সঙ্গে অতিমাত্র ভাষণের উৎসাহ অথচ সচেতন শিল্পের হাল ছেড়ে দিয়ে ভাষাকে অবচেতনার স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়া; সংসর্গ এবং সংলগ্নতার গোচর পথ একান্ত পরিহার করা। এইখানে শিল্পীজনিত সুবুদ্ধি কবি য়েট্স্কে রক্ষা করেছিল; তাঁর গভীরতম আলোকিত বেদনা ও মনোদৃষ্টির শক্তি তাঁর আশ্চর্য শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতায় চিরন্তন হয়ে রইল। পাউণ্ড বললেন, "যদি বাংলা শিখতে পারতাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্তরে-স্তরে যদি অক্ষর ছন্দ মাত্রা ভাবের যাতায়াত গুনে দেখবার সময় থাকত। কিন্তু এই কাজ এলিয়টের করা উচিত ছিল,— তিনি সংস্কৃতে আমার চাইতে অনেক দূর এগিয়েছিলেন।" এলিয়ট ১৯ নবেম্বর এখানে Library of Congress-এ কবিসভায় আসছেন, নোবেল প্রাইজ

তিনি পাবার পূর্বেই কয়েকজন আধুনিক কবিকে নিয়ে এই আয়োজন হয়েছিল, পাউণ্ডের সঙ্গেও দেখা করবেন : সেই সময়ে সব কথা হবে। ঠিক এখন পাউণ্ড কনফ্যুসিয়সের সাত হাত জলে নিমগ্ন; বললেন, ত্রিশ বছর এই ডুবুরির কাজ করছি। তাঁর *Confucius* সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এখন কনফ্যুসিয়সের Analects নিয়ে বসেছেন, দেখলাম পাতার পর পাতা চীনে কবিতার পদান্ত-মিলের বিচিত্র পদ্ধতিকে ইংরেজিতে ছকেছেন, স্বরলিপির মতো দেখাচ্ছে।

এর মধ্যে ডরথি পাউণ্ড এলেন, তাঁর শান্ত দুঃখজয়ী মুখে স্বামীর সমস্ত দুর্গতির অতীত সাক্ষ্য রয়েছে— দুজনে সংসারের কোন্ প্রতীতির উপর ভর ক'রে আছেন তাই ভাবলাম। ইনি য়েট্স্-এর পত্নীর আত্মীয়া, য়েট্স্-পরিবারের নানা কথা হ'ল। দুই বন্ধুকবি মহাতর্কে রাপালোর ঘর ভরে তুলেছেন, কেউ ছাড়বার পাত্র নন, শিল্পের ভাষা নিয়েই বিরোধ। য়েট্স্ কল্পনার সূক্ষ্ম বিলসিত কাহিনী বা ছন্দেও চেতনার উজ্জ্বল রাজ্য ছাড়েননি, আর আমাদের উপস্থিত এই কবি তো চেতনা-অবচেতনার পার্থক্য না মেনেই দোভাষী। অথচ পাউণ্ডের প্রথম গভীরতর পরিচয় দেন য়েট্স্, য়ুরোপীয় সংগীতের fugue -এর সঙ্গে Cantos -এর তুলনা করেন। শুধু তা-ই নয়, পাউণ্ডের সঙ্গে কথা ব'লে ও তাঁর রচনার বাঙ্ময় প্রহেলিকার মধ্যেও বাক্‌শিল্পের অতুল্য পরিচয় পেয়ে য়েট্স্‌কে নিজের রচনার সংস্কারে প্রবৃত্ত হতে হ'ল। যদিও পুরোনো কবিতাকে বদলানোর ফল ভালো হ'ল না— যৌবনের ভাষা ও ভাব তনুগত যে-রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল সেখানে পরিবর্তনের চেষ্টা ''রিণত বয়সের কবির পক্ষে অন্য কোনো কবির মতোই অনধিকারপ্রবেশ— কিন্তু পরবর্তী য়েট্স্ -এর শিল্পে অনেকখানি রূপের দৃঢ়তা দেখা দিল। এর পূর্বেই এই দুই ক' ।র সাহিত্য ও জীবনের সন্ধিস্থল তাঁদের জীবনে রবীন্দ্রনাথের আগমন : ভাষা, শিল্প ও ধ্যান, বা "চারিত্রে"র সম্পূর্ণ সৃষ্টিলোক হঠাৎ তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ হ'ল। পশ্চিমের দুই কবিই এ-কথা বারবার স্বীকার করেছেন, যদিও অনুৎসুক ভারতীয় এবং উদাসীন বা অবজ্ঞাশীল বর্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যিকেরা আধুনিক জগৎসাহিত্যের একটি বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা ভুলতে বসেছেন। এলিয়ট তখনো অনেক পিছনে, তিনি সাবধানী পদক্ষেপে পাউণ্ডের অনুসরণ করেছেন, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানে পূর্বতনের মতো পা ফেলেননি, নূতন উপায়ে পেরিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর গীতাঞ্জলি তর্জমার মধ্য দিয়ে, দু-চারটি ইংরেজি প্রবন্ধে এবং বিশেষ ক'রে এজরা পাউণ্ড ও য়েট্স্ -এর মধ্য দিয়ে কী ভাবে এলিয়টের উপর ক্রিয়াশীল তা খানিকটা

বোঝা যায়, কিন্তু অনুশীলনের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের পরে— এবং অনেকখানি পরে, কালের দিক থেকে নয়, সাম্প্রতিক মূল্য ও চিরকালের দিক থেকেও অনেকটা পরে— য়েট্‌স্ এলিয়ট ও পাউণ্ড শিল্পশক্তির ক্রমিকতায় এই তিন কবি আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। এঁদের তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে যাথার্থ্যরক্ষা হবে না। রিল্কে এই প্রভাবচক্রের একটু বাহিরে, স্থান এবং কালের বাধা তখন এর চেয়ে বেশি ছিল, যদিও পূর্বের মিস্‌টিক্‌ মনোদর্শন রিল্কের শিল্পে পৌঁচেছিল মনে হয়— কিন্তু লর্কা এবং প্রাচীনতর ভালেরির শেষদিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রপ্রভাবান্বিত ত্রয়ী ইংরেজি কবির অনুপ্রেরণা লক্ষ করা কঠিন নয়।

আরো অগ্রসর হলে এই হাওয়াই চিঠির মাশুল দিতে বহুদুঃখার্জিত ডলারেরও শূন্যদশা ঘটবে। তাছাড়া বর্ণনা লিখেও ইনটারভ্যু না-লেখা চাই তো। পরিশেষে পাউণ্ডের দু-চারটি বাক্যস্ফুলিঙ্গ উদ্ধৃত করতে দোষ নেই ; তর্জমা করতে গিয়ে নিষ্প্রভ ক'রে দেব না, টীকাভাষ্যও দিতে যাব না। দীর্ঘ স্বগতোক্তি তাঁর প্রায়ই জটিল, অনেক সময় দুর্বোধ্যতায় তলিয়ে যায়, কিন্তু কথা থামিয়ে নির্দয় প্রশ্নোত্তরে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে ঝলমলে বাক্যবর্ষণে তাঁর একটুও দেরি হয় না, সেই বাক্য যেমন সংহত, সংস্কারে সুদৃঢ়, তেমনি দূরগামী।

"আপনার Cantos কবিতায় 'কাল'-এর নির্ণয়পদ্ধতিটা কীরকমের ?"

"Eternity is all at once." আবার যোগ করলেন, "Elsewhere I have said, It will never be one hour more than it is at present." আবার যোগ করলেন, "Confucius knew that you cannot reduce or formulate Time." অনেক কষ্টে বার করা গেল যে প্রথম পঞ্চাশ Cantos-এর পরে রীতিমতো "সময়" দেখা দিয়েছে, সেই সময়ের আরম্ভ চীন-জগতের ভূমিকা থেকে। তার পূর্বে "সময়"কে অনন্ত সময় (আমাদের ভাষার "মহাকাল") থেকে পৃথক করবার চেষ্টা করেননি। যেমন ভারতীয় সংগীতে রাগিণীর আলাপের পর স্পষ্ট সময় ছন্দে তালে দেখা দেয় সেই উদাহরণ আমার মনে এল।

"আপনার কবিতায় সংলগ্নতা বা সংসর্গতার রহস্য অনেকের কাছে দুর্গম। যে-পথ আপনার মনের মধ্যে, সে-পথে পাঠকের পক্ষে যাতায়াতের বাধা আছে।" "Heraclitus said, All is fluid. But, of course, the leaf flows into form." "There is a pattern." ঘটনার পরস্পরসম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা

হয়েছিল; অনেক কিছু আছে এবং ঘটছে, তাদের যোগাযোগ নির্ণয়ের বুদ্ধির তো একটা চর্চা আছে, অন্ততপক্ষে অনুভূতির রাস্তায় তাদের একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করা শিল্পের জগতে প্রচলিত। উত্তর এল, "No connection between the Lion and the Rose. Links are not provided. Both exist. But unless you know them both there is some lacuna in your knowledge." যোগ করলেন, "There is very little that man can ignore without being ignorant." আলোচনা চলল। জানার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের বিচিত্র বস্তুকে ক্রমে কোনো একটা সম্বন্ধে জানা সম্ভব হতে পারে, সে-পথে চলতে হবে, কিন্তু আসল তাদের মধ্যে যোগ অস্তিত্বের যোগ। সেই যোগের হেতু এবং সেতু দুই-ই মানুষের শিল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। ("Coexistential Poetry.")

বললেন, বিজ্ঞান যে-যোগ দেখাতে চায় তা কালের যোগ। "Any child can take an alarum clock into pieces. Beasts can make atom bombs. But an Indian Yogi does not force the pace of a rose. He sees. Connections. Healing. Growth."

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ বললেন, পৃথিবীর নেতা গান্ধী। যখন তাঁর মৃত্যুর খবর পেলেন হঠাৎ তাঁকে চিনলেন। তার আগে মনে করতেন গান্ধী বিশেষ ক'রে ভারতীয়ের। আবার যোগ করলেন, কিন্তু *Pisan Cantos* লেখবার সময় বারবার গান্ধীর কথা ভেবেছি। জেলের চেয়ে বড়ো। শুধু তাই নয়, সব প্রাণের কাছে আসা। বললেন, গরাদের বাইরে পিঁপড়ে পোকা সবই আপন হ'ল। একটা কাগজ নিয়ে যা আমাকে লিখে দিলেন সেটা উদ্ধৃত ক'রে এই চিঠি শেষ করব। কিন্তু তারও আগে বললেন, আশ্চর্য গান্ধী; এবং পেন্সিল নিয়ে লিখে দিলেন, "E. P. Guide to Kulchur 1935 (?) Gandhi perceived that India would attain freedom if we don't buy any cotton and at the same time don't buy any guns."

এজরা পাউণ্ড যে নরহত্যা ব্যবসায়ের বিরোধী, এবং যুদ্ধকে কী চক্ষে দেখেন তা পূর্বেই বলেছি। প্রশ্ন করাতে বললেন, মুসোলিনী? এই কারণেই তাকে ঘৃণা করেছি। পাউণ্ডকে মুসোলিনীর ভক্ত বলা হয়েছে, এবং অপরাধের বিষয়ে মন্তব্য করাতে তিনি হেসে উঠলেন। যে-সব কপটেরা মুসোকে দোষ দেয় তারাও একই হিংসার ব্যবসায়ী, তাদেরও ঘৃণা করি, এই আমার বিষয়ে

প্রকৃত অভিযোগ। যে-সব ব্যবসায়ী জাতির তালিকা দিলেন তাতে য়ুরোপের পূর্ব বা পশ্চিম কোনো মহাখণ্ড বা ভগ্নাংশ বাদ পড়ল না তা বলা বাহুল্য।

কবিতায় ফিরে আসা যাক। তাঁর Cantos-এর কবিতা free verse কি না জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "Eliot has said, no verse is free for a man who wants to do a good job." তারপর যোগ করলেন, "Theory of counterpoint is not musical composition." অর্থাৎ দুই ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ভুল, কারিগরি যেন কারাগার না হয়। এর পরে যেন বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের মতো বললেন, "Ploughing has nothing to do with the quality of the seed." আবার যোগ করলেন, "You cannot organise form by theory." তারপর: "Barometer follows nobody's direction." তারপর: "The cherry cannot grow peaches. In the brain of the cherry there is only one idea— the cherry."

আজ এই পর্যন্ত। পাউণ্ডের সঙ্গে পুনর্বার দেখা হয়েছে। এমন অদ্ভুত প্রতিভাবান এবং অপরিকল্পনীয় আশ্চর্যভাষী মানুষের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। যে-বিষয়েই কথা বলেছি কী ধরনের উত্তর এসেছে তার নিদর্শন উপরেই রইল, তার চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত কী হতে পারে। আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে তাঁর সংজ্ঞা এই— হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "World of robots is not One World. One World is Indians more Indians, English more English."

যেখানে মানুষের যথার্থ মিলন তার স্তরে শিল্পীকে পৌঁছতে হবে। *Pisan Cantos*-এর শেষ দিকে সেই কথাই আছে। সেই একই মনের ভাব নিয়ে এজরা পাউণ্ড আমাকে কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, "The necessary component of world thought from India is reverence for life in any form however small. Ezra Pound."

Washington D. C.
৮ নভেম্বর ১৯৪৮

এলিয়টের নতুন কবিতা

শাদা পাথরকে স্তবকে-স্তবকে পুষ্পিত ক'রে তোলা আশ্চর্য কবি-কারিগর এলিয়টের সাধ্য। এমনতর বাক্যের প্রত্যক্ষ মাধুর্য যে-কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ।

When the short day is brightest, with frost and fire,
The brief sun flames the ice,.........
A glare that is blindness in the early afternoon.
And glow more intense than blaze of branch, or brazier,
Stirs that dumb spirit : no wind, but pentecostal fire
In the dark time of the year.........

বলা যেতে পারে এ তো বরফের ফুল, পাথরের নয়, কিন্তু শিল্পীর মনের শাদা জ্বলন্ত আগুন প্রকাশিত হয়েছে কত কঠিন, কত সংহত লীলায়িত কথার বৃন্তে।

...Now the hedgerow
Is blanched for an hour with transitory blossom
Of snow, a bloom more sudden
Than that of summer,.........
Where is the summer, the unimaginable
Zero summer ?

কেবলমাত্র এই মন্ত্রধ্বনিত কাব্য, বিরল দৃঢ় চিত্রণের ভাষা মনে ধারণ ক'রেই এলিয়টের নবতম কবিতাটিকে উপভোগ করা চলে।

কিন্তু জানি চতুষ্কোণ হীরের মতো চারটি কবিতায় একক এই প্রকৃষ্ট রচনায় বিশেষ একটি নিগূঢ় তত্ত্বের আলো ঠিক্‌রেছে। নিরবধি কাল এবং প্রতি মুহূর্ত, এই দুয়ের অবাঙ্‌মানসগোচর মর্ত্যযোগে আমরা আছি; এরই রহস্য এলিয়টকে এই নতুন বিচিত্র কাব্যদর্শনে প্রবৃত্ত করেছে। বোধ করি তাঁর বিশেষ নির্দিষ্ট প্রতীতি সৃষ্টির রহস্যময়তাকে অতিক্রম ক'রে স্থিরদৃষ্টির সাক্ষ্য দিতে চায়; কাল ও মহাকালের দ্বন্দ্ব তিনি স্বীকার করেন না, অতএব রহস্যকেও নয়; কিন্তু তাঁর বাক্য যে-সংকল্পই প্রকাশ করুক, আমাদের কাছে কাব্যের আভাময় বিস্ময়টুকু উপভোগ্য।

কালের পরমতত্ত্ব এই চারটি কবিতাকে ছেয়ে আছে। ছোটো-ছোটো গ্রামের নামে এই কবিতাগুলি রচিত— Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little Gidding;— তার চতুর্দিকে বৎসরে-বৎসরে এলিয়ট তাঁর ভাবনার আকাশ বিস্তার করেছেন। মোটামুটি একই ভাবের নানারঞ্জিত প্রয়োগ এই রচনাধারায় দেখতে পাই। আমরা যেখানে আছি তার এক দিকে শেষ, এক দিকে নতুন আরম্ভ; অথচ সমস্ত মহাকালের মধ্যে আরম্ভও নেই, শেষও নেই। বসন্তের গোলাপ, শীতের তুষার-ফুল, হেমন্তের রাঙা ঝরা পাতা— দূরে নদীর রৌদ্র জল— এরই ধার দিয়ে আমরা চলেছি। মনে হয় চলেছি। আসলে চলা আর স্থিরতা তুই-ই এক আকাশে বিধৃত; যার মধ্যে দিয়ে চলছি তা আছে, এবং ছিল, শেষ হবে না। কিছুই তাই হারায় না, হারাবে কোথায়? চেয়ে দেখো অবচেতনার স্তরে-স্তরে জড়ানো সময়কে, সেখানে ভাঙা চাঁদের আলোয় দেখা হাড়, পায়রা উড়ছে উজ্জ্বল তুপুরের হাওয়ায়, সিঁড়ি থেকে দেখা যায় বাগানের সবুজ, কাকে কী বলেছি বা মনে করেছি যে বলেছি; শামুক, ঝিনুক। মনের রঙ্ দিয়ে চাইলে কোনোটা সত্য, কোনোটা মায়িক, ভালো বা মন্দ, কিন্তু এই সবই স্রোতেব ঢেউ, স্রোতের গতি কিছুতেই নির্ভর কবে না। আবাব বলছেন, মহাকাল বা মহাকাশ তার স্বরূপ কী; আমাদের মন-গড়া কম বেশি স্থিতি বা পরিমাণেব বিচারে তা ধরা পড়ে না,—

The moment of the rose and the moment of the yew-tree
Are of equal duration.

পরেই যোগ করলেন,

for history is a pattern
of timeless moments.

অর্থাৎ চৈতন্যের ভাস্বরযোগে সময় আরো একটি মহাকালকে উদ্‌ঘাটিত করে, সেইটেই হ'ল আসল ইতিহাস।

এতটা এগিয়ে পাঠকের মন ব'লে উঠতে পারে, তবে তো কিছুই করবার নেই। সমস্তই ঘুরছে, স্থির হয়ে আছে "at the still point of the turning world;" অনন্ত আবর্তন। অন্যায়কে দূর করব না, সুন্দর করব না পৃথিবীকে, চাষ করব না মাটি, সংসার এগোবে না বীর্যের দিকে? এলিয়ট তো বলতে চান করাও যা, না করলেও তাই, সব হয়েই আছে। চিরন্তন

স্বর্গীয় আমাদের এই সৃষ্টির জেলখানা। অথচ স্বর্গ ই বা একে বলি কী ক'রে; স্পষ্টই দেখছি পাপ বেড়ে উঠল সংসারে, এলিয়টের দেশও সংহারী যুদ্ধে লিপ্ত, সকলের মুখেই ধর্মের নাম। সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই আমাদের চৈতন্য জাগবে স্বাধীন সমাজ রচনার কাজে, চক্রাবর্তন ছেড়ে আমরা নামব সৃষ্টির কাজে। তাই তো পেয়েছি আমার হাতে জোর, মনে শক্তি, নিকৃষ্টতার বিরুদ্ধে রুদ্র রাগ। শিল্প এবং কাব্যও তো সেই সক্রিয় চলোর্মি-মুখরিত প্রাণের বাহন।

এলিয়ট হয়তো কিছুই অস্বীকার করবেন না। এই কাব্যে তিনি বলেছেন, "still point -এ চেয়ে দেখো। তার পরে কী হবে তা স্পষ্ট ক'রে তিনি বলেননি। কিন্তু আজ তিনি যা জানাতে চান, তাঁর ব্যাখ্যাত সেই আত্মসাধনার চরম দাবিব সঙ্গে বিশ্বগত কল্যাণসাধনার বিরোধ নেই। "Miracle"-এব জন্য অপেক্ষা ক'রে লক্ষ বুভুক্ষু আতঙ্কিতের দল চকিতে রক্ষা-কবচ পাবে বিশেষ কোনো ধর্মনেতাব স্বেচ্ছামৃত্যুতে— এই ছিল তাঁব একটি শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রামাণ্য বিষয়। এখন একটু বদলে বলছেন

> And all shall be well and
> All manner of things shall be well
> When the tongues of flame are in-folded
> Into the crowned knot of fire
> And the fire ar. the rose are one.

এখানে খৃষ্টীয় ধর্মসাধনাব বিশেষ উল্লেখ আছে; দ্বাদশ ভক্তের জীবনে "pentecost"-এব দিব্যাগ্নি যখন পৌছল তাঁদের জ্বলন্ত জীবনে বেদনা ও করুণার দান এক হয়ে উঠল মানুষের সেবার দুরূহ কাজে তখন তাঁরা পথে বেরোলেন। প্রেমের নবীন মঞ্জরিত গোলাপ এবং রাঙা আগুনকে এক ক'রে দেখে যে অনন্য দৃষ্টি, তারই কাছে পথের বাধা ঘুচে যায়। পূর্বতনদের সঙ্গে যোগও হয় সেই মুক্ত দর্শনেব ক্ষেত্রে; প্রাচীন সংস্কৃতির হাওয়া যে-তীর্থে আজও সহজ হয়ে জেগে আছে সেখানে গিয়ে নিজের দীক্ষাকে জ্বালিয়ে নিতে হবে তাহলে খুঁজে পাব সোজা রাস্তা। এলিয়ট বরাবরই ট্রাডিশনে বিশ্বাসী, অত্যন্ত আধুনিক হয়েও তিনি জেনেছেন,

> the communication
> Of the dead is tongued with fire...

এবং এই "communication"-এর সন্ধানে তিনি উপস্থিত হলেন Little *Gidding নামক পূর্ব-ইংলণ্ডীয় গ্রামে, যেখানে প্রথম চার্লস্ -এর সময়ে বিশেষ* একটি মিস্টিক ধর্মসম্প্রদায় একত্র হয়ে নিভৃতে তাঁদের উপাসনার কেন্দ্র রচনা করেন।[১] ভাঙা গির্জা আজও পড়ে আছে, বাহিরের ঐশ্বর্য আগেও ছিল না, এখন আরো নেই, কিন্তু সেখানে বিত্তহীন মন্দিরহীন অনাড়ম্বর প্রার্থনার ঐশ্বর্যরূপ এলিয়ট আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করলেন।

You are here to kneel
Where prayer has been valid. And prayer is more
Than an order of words, the conscious occupation
Of the praying mind, or the sound of the voice praying.

এলিয়টের কাব্যে-নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়। তার মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠান, প্রতীক-প্রবণতা, বিজ্ঞান দর্শন ঐতিহাসিক উল্লেখের সংমিশ্রণ আছে যা বাহিরে রাখতে চাই। কেবলমাত্র মূল ভাবনায় গ্রথিত শিল্পরূপটির স্বল্প পরিচয় এখানে দেওয়া চলে। অন্তর্ভাবিত সেই রূপটি অতি সূক্ষ্ম আনন্দিত মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে; এলিয়টের কাব্যের গড়ন অপূর্ব ভাষায় সমন্বিত সেই কথাই বলতে চাই।

Only by the form, the pattern.
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness.
Not the stillness of the violin, while the note lasts,
Not that only,... (Burnt Norton)

সচেতন শিল্পের এইরকম বিশিষ্ট সুযৌক্তিক অথচ কল্পরঞ্জিত বাক্য, দৃঢ়বদ্ধ গদ্যকাব্যধর্মী প্রাঞ্জল এই ছন্দের অন্তর্লীন তরঙ্গ মনে একটি অপূর্ব নিবিষ্টতা সঞ্চার করে; পূর্বতন কাব্যে এর ঠিক তুলনা নেই। একেই য়েট্স্ একজায়গায় বলেছেন আধুনিক কবিদের প্রবর্তিত the precision of good prose, যা কাব্যে প্রবেশ ক'রে তাকে নতুনতর নির্মিতির মাধুর্য দিয়েছে। ("No poet of my generation would have written 'moderate' exactly there......the close of a long period, the ear expecting some

১ এই তথ্য রেডিয়োতে বলা E. M. Forster -এর মন্তব্য হতে সংগ্রহ করেছি।—লেখক

poetic word, checked, delighted to be so checked, by the precision of good prose") য়েট্‌স্‌ -এরই কথায় বলা চলে, "*the true* poetic movement of our time is towards some discipline"— এই "heroic discipline" চরম প্রকাশ পেয়েছে এলিয়টের শেষ চারটি কবিতায়।

সময়ের বিস্ময়মন্ত্রে আমরা সকলেই দীক্ষিত, কেননা এই যুগের বিজ্ঞান-দৃষ্টি লক্ষকোটি বিগত বৎসরকে লুকোনো ভূ-স্তরে, কঙ্কালের হারানো পুনরাবিষ্কৃত যোগসূত্রে, আদিম তারা থেকে অণুতম কণিকার আকাশে ব্যক্ত করেছে— ইতিহাসের মানসিক মহাকালও চতুর্দিকে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এক হিসাবে যতই আমরা এগিয়ে চলেছি ততই পিছনেরও অতি কাছের খবর আমাদের কাছে ধরা পড়ল, পূর্বতর যুগের মানুষ পূর্বতমদের কাছ থেকে আরো দূরে ছিলেন। মনের কাল তাই আমাদের আজ আরো ব্যাপক, এবং একই কালে বৃহৎ বিশ্বের বৈচিত্র্য কতরূপে প্রকাশিত হয়ে চলছে সে সম্বন্ধেও আমরা সচেতন। সুতরাং আমাদের কবিতায় গল্পে কালের নূতন দৃষ্টি এসে পৌছল ; আপেক্ষিক কাল, প্রাণীদের মধ্যে চৈতন্যের ভিন্নতায় কালের ভিন্নতা ; ঘুমের কাল এবং জাগরণের কালের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকদের প্রমাণিত পার্থক্য— এই সকল বিষয় আজ কাব্যের অন্তর্গত। আমরা জানি বিশেষভাবে স্পেণ্ডর ঐতিহাসিক কালের কাব্যব্যাখ্যাতা, এমনকি তাই নিয়ে তিনি অতি সুন্দর লীরিক রচনা করেছেন যাতে বিস্ময়ের সহজতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ঘটনা ; অডেন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি-পাওয়া, নানাজাতীয় ভাবনার সময়কে নিয়ে তিনি অদ্ভুত ক'ব্য বেঁধেছেন। কিন্তু যে "heroic discipline"-এর শিল্পদক্ষতায় কবি এলিয়ট সময়ের ভাবনাকে কাব্যে চির-কালীন রূপ দিতে পেরেছেন তার তুলনা পশ্চিম-দেশের কোনো কাব্যেই পাওয়া যাবে না। অভিনব বিষয়বস্তু বা আবেগের অসংস্কৃত বেগ, এর কোনোটাই কাব্যে যথার্থ নূতনত্ব অর্থাৎ প্রাণসঞ্চার করতে পারে না ; এলিয়ট কবি, তাই কাব্যের উপকরণ, বা শিল্পের জ্ঞানকে ছাড়িয়ে তিনি আধুনিক যুগের একটি অন্তরতম মনোধারাকে এমন আশ্চর্য প্রকাশ করেছেন। আধুনিক জীবনের অনেক দিক তাঁর কাব্যে অনভিব্যক্ত— তার জন্যে যেতে হবে অন্য কবির দরবারে, যাঁদের চিত্তের সঙ্গে আমাদের যোগ হয়তো নানা ভাবে ঘনিষ্ঠতর— কিন্তু এলিয়টের এই নতুন কবিতাগুলি বিশেষ অর্থে এবং সাধারণ অর্থেও কালধর্মী এ-কথা স্বীকার করতে হবে।

এলিয়টের শেষ চারটি কবিতার মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অথচ চিত্রধ্বনিময় কয়েকটি ছিন্ন পদ এখানে উদ্ধৃত করি।

ক

After the kingfisher's wing
Has answered light to light...... (Burnt Norton)

খ

Now the light falls
Across the open field, leaving the deep lane
Shuttered with branches, dark in the afternoon...
(East Coker)

গ

[2]Where you lean against a bank while a van passes
And the deep lane insists on the direction
Into the village, in the electric heat
Hypnotised. In a warm haze the sultry light
Is absorbed, not refracted, by grey stone.
The dahlias sleep in the empty silence......
(East Coker)

ঘ

The river is within us, the sea is all about us...
(The Dry Salvages)

ঙ

At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall
And the children in the apple-tree...
(Little Gidding)

চ

Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden. My words echo
Thus, in your mind... (Burnt Norton)

ছ

What we call the beginning is often the end
And to make an end is to make a beginning.
The end is where we start from...(Little Gidding)

---

২ দ্বিতীয় লাইনে "insist" কথাটা লক্ষ করতে হয়। তাছাড়া "electric heat," "absorbed," "refracted" এ-সব কথার ব্যবহার বিশেষভাবে আধুনিক, এবং গদ্যের সুরে মননশীল।

জ If you came this way in may time, you would find the hedges
White again, in May, with voluptuary sweetness.
It would be the same at the end of the journey...
(Little Gidding)

ঝ So I find words I never thought to speak
In streets I never thought I would revisit
When I left my body on a distant shore.
(Little Gidding)

ঞ Here, the intersection of the timeless moment
Is England and nowhere. Never and always.
(Little Gidding)

কবি য়েট্‌স্‌

য়েট্‌স্‌-এর সঙ্গে লণ্ডনে প্রথম দেখা হবার পর ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— আধুনিকেরা কাব্য-জগতের কবি, য়েট্‌স্‌ বিশ্বজগতের কবি। প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল মনে আছে। বর্তমান যুগে বই হতে বইয়ের উৎপত্তি : সাহিত্যিক মালমশলার অভাব নেই, বুদ্ধি যথেষ্ট, ছাপাযন্ত্র উদ্যত, ভুলে যাচ্ছি লণ্ডনের জঠরে কত মন কাগজের বরাদ্দ। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল য়েট্‌স্‌ এই কাব্যিক কারখানা হতে দূরে— তাঁর কবিতার শিকড় নেমেছে চিরন্তনের মাটিতে, যেখান থেকে ফুল ফোটে, চিত্ত রসিত হয়ে ওঠে।

দূরত্বের জন্যে আর্টিস্টকে বিশেষ জরিমানা দিতে হয়, কেবল সামাজিকতায় সাহিত্য-ব্যবসায়ে নয়, মানসলোকে বেড়া-বাঁধার জন্যে। ভিড়-ঠেকানোর আয়োজন শুরু হয় মনে— কল্পনাকে প্রথমটা সরিয়ে রাখতে হয় প্রাত্যহিক টানের বাহিরে। অভ্যাসের গণ্ডি-বাঁধা হলে ক্ষতির সম্ভাবনা, স্বেচ্ছায় ভিড়ে বাহিরে যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটে। স্বপ্নসুদূর গর্বিত ছন্দে য়েট্‌স্‌কে পরাভবের সুর ঢাকতে হয়েছিল ; প্রথম যুগের কাব্যে সংসারকে সরিয়ে রেখে বেদনার অলংকার দেখা দিয়েছে, ঘরে-বাহিরে মিলন ঘটেনি আলোজ্বালা সৃষ্টির পথে। হাটের চলচ্ছবি হতে একান্তে মনেব মিনারেট উঠল আকাশে, ঘুরোনো তার সিঁড়ি, কিংবদন্তী শুনেছি হাতির দাঁতে তৈরি তার দেয়াল, শুভ্র অলৌকিক কারুকাজ গায়ে-গায়ে, চুড়োর আগাগোড়া কোথাও বাস্তবের ইটপাথরের ব্যবহার নেই। য়েট্‌স্‌ চান্দ্রিক স্বপ্নে, কেল্‌টিক্‌ কুয়াশায়, গানে ধ্যানে ছেঁড়া জোড়া দিদিমার গল্পে মিশিয়ে তাঁর কবিতার সৌধ গড়লেন।

ভিক্টোরীয় অবসানের যুগে এক দল সাহিত্যিক এমনিতর স্বপ্নচূড় কবিতায় নাম করেছিলেন : নব্বুইয়ে-পাওয়া আখ্যায় তাঁরা পরিচিত। শতাব্দীর শেষ আলোয় তাঁরা উপরের বাতায়নে ব'সে "হল্‌দে পুঁথি" পড়তেন, তারই পৃষ্ঠায় তাঁদের ছবি গল্প কবিতা বার হ'ত ; য়েট্‌স্‌ও তাঁদের শৌখিন মজলিসে ক্লান্ত মধুর কল্পনা নিয়ে যোগ দিতেন। প্রচলিতের চয়নিকায় তথ্যের চেয়ে আকাশ-কুসুমের প্রাদুর্ভাব, সমালোচকের কৃতিত্ব সেইখানে। তবু নব্বুইয়ের দলের এই বর্ণনায় কিছু সত্য আছে। বিংশ শতাব্দীর দুরন্ত দিনালোকে অবসন্ন

মাধুরীর দল বিদায় নিলেন, য়েট্‌স্ রইলেন বেঁচে। "দি ট্রাজিক জেনারেশন্" নামক বইয়ে তিনি বন্ধুদের কাহিনী লিখেছেন দরদে হাসিতে মিলিয়ে— বোঝা যায় চূড়াবিহারীর দলে থেকেও তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন। তার প্রধান একটা কারণ, কল্পনার পথ বেয়ে দৈবক্রমে তিনি আইরিশ যুগের কেন্দ্রে পৌছলেন, নতুন প্রাণ পেলেন সজীব জাতীয় সত্তায়। ক্ষণজীবী বন্ধুদলের কাব্য ইংলণ্ডের অভ্যস্ত ভূমিকে অবজ্ঞা ক'রে অন্য কোথাও পৌছতে পারেনি। ফরাসী সমুদ্রপারের হাওয়ায় তাঁদের মন উতলা : প্রতীকে, উপমায়, অনুপ্রাসে বাণীকারের দল মেতেছিলেন। আরো জানা গেল, অতীব দূরবিলাসিতা ছিল যাঁদের পেশা তাঁরা যখন হাটে নামতেন, লণ্ডনের তলানিতে ঠেকত তাঁদের লক্ষ্যহারা গতিবিধি। "রাইমার্স ক্লাব" গড়েছিলেন য়েট্‌স্ তাঁদের দু-চার জনের সঙ্গে; "চেশায়ার চীস্"-রেস্তরাঁয় ব'সে তিনি এঁদের আবর্তযাপন চক্ষে দেখেছিলেন; উদ্ধার করবার উপায় তাঁর হাতে ছিল না। লায়োনেল্ জন্‌সন্, ডাউসন, লে গালিয়েন্ প্রমুখ বন্ধুদের ইতিবৃত্ত সকরুণ গদ্যে লিখেছেন; এর ভিতর দিয়ে স্বজীবনী ফুটে উঠেছে। "অটোবায়োগ্রাফিস্" গ্রন্থে য়েট্‌স্ -এর স্মৃতিচ্ছবি একত্র বার হয়েছে— কবির প্রথম পর্বের ইতিহাস তাতে পাওয়া যায়।

দুই

য়েট্‌স্ -এর জন্ম ডব্লিনে, ১৮ই জুন, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা ছিলেন আর্টিস্ট, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন; মায়ের পরিবারে অনেকে ছিলেন জাহাজ-ব্যবসায়ী, স্লাইগোর গ্রামাঞ্চলে তাঁদের নিবাস। পল্লীশ্যামল স্লাইগোর ছোটো পাহাড়-হ্রদের সঙ্গে তরুণ য়েট্‌স্ -এর জীবন জড়িয়েছিল; শেষ প্রান্তের কাব্যেও তার ডাক শোনা যায়। য়েট্‌স্ -এর জন্মের কিছু পরেই তাঁর পিতামাতা চলে যান লণ্ডনে; হ্যামারস্মিথ স্কুলে তিনি দশ বছর বয়সে ভর্তি হন। পাঁচ বছরের শেষে পুনশ্চ ডব্লিনে ফিরে ইরাসমস্ বিদ্যালয়ে যোগ দেবার পূর্বেই বালক য়েট্‌স্ প্রায়ই ছুটিতে আসতেন স্বদেশে। ছাত্রের পালা ফুরোতেই য়েট্‌স্ -এর পিতা তাঁকে প্রবৃত্ত করলেন ছবি-আঁকার সাধনায়। কিন্তু কবির বেলা যেত ম্যুজিয়মে, গ্রন্থাগারের কোণে, তর্জমা পড়তেন প্রাচীন সাহিত্যের, কখনো নিজে করতেন তর্জমা, কখনো পালাতেন পুরনো কনট্ গ্রামের দিকে, পল্লীপ্রবীণদের কণ্ঠে বিস্মৃতপ্রায় স্বদেশের কাহিনী শুনতেন মুগ্ধ হয়ে। উনিশ বছরে প্রথম বেরোল তাঁর কবিতা

"ডব্লিন্ য়্যুনিভার্সিটি রিভিয়ু"-এ, রচনা দেখা দিতে লাগল ছাপায়; একুশ বছর বয়সে "মোসাডা" নামে নাট্যরসাত্মক কবিতার বই ছাপালেন। প্রবীণ য়েট্‌স্ -এর নিড়নিতে এই-সব প্রথম বয়সের পল্লব রক্ষা পায়নি,— আজ তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সহজ হবে না। ১৮৮৭ সালে য়েট্‌স্ এলেন লণ্ডনে— কবি এবং জর্নলিস্ট— অন্য পরিচয় ঘুচল। "দি ওয়ান্‌ডারিং অফ্ অয়সিন্" কাব্যসংগ্রহ বেরিয়েছিল এই সনে; সাধারণ্যের কাছে তাঁর প্রথম রচনা ব'লে পরিচিত। স্লাইগোর পলায়নীতে লিখেছিলেন এই কবিতা।

চব্বিশ বছরের তরুণ সাধক ক্রমে শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় কবির আসন নিলেন; পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস রয়েছে ১৯৩৯ এবং সেদিনের মধ্যে। কত প্রভাবের রশ্মিপাতে তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকশিত হ'ল, গড়ে উঠল স্বকীয়তায়। মিস্টিক্ কবি ব্লেকের রচনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল; কেল্‌টিক লোকগাথা এবং নানা দেশীয় পৌরাণিক কল্পকথা তাঁর মনকে চিরন্তন আদিমতায় অভিষিক্ত করে। প্রথম জীবনেই তিনি ভারতবর্ষের স্পর্শে এসেছিলেন। হোন্ -এর বই আজকাল পাওয়া যায় না; তাতে য়েট্‌স্ -এর নিজেব উক্তি আছে; ডব্লিনে ভারতীয় কোনো দার্শনিকের মুখে তত্ত্বকথা শুনে তাঁব মন নতুন উপলব্ধিতে ভরেছিল। আত্মজীবনীতেও এ-বিষয়ে উল্লেখ আছে। "অনসূয়া অ্যাণ্ড্ বিজয়া," "দি ইণ্ডিয়ান্ আপন্ গড," "দি ইণ্ডিয়ান্ টু হিস্ লভ্"— কবিতাগুলি আমাদের সুপরিচিত, ১৮৮৯ সালে "ক্রস্‌ওয়েস্"-সংগ্রহে বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, গীতাঞ্জলির সুন্দর ভূমিকা; "দি ওয়াইণ্ডিং স্টেয়ার্" নামক কাব্যগুচ্ছে "মোহিনী চ্যাটার্জি"র উপর অপূর্ব কবিতা,— নানা সূত্রে তাঁর রচনা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। অল্পদিন হ'ল মেয়র্কা দ্বীপে বসে শ্রীপুরোহিত স্বামীর সাহচর্যে য়েট্‌স্ উপনিষদের তর্জমা করেছিলেন, বইখানি ত্রুটি সত্ত্বেও য়েট্‌স্ -এর ভাষায় অলংকৃত। আহরণশীল সৃজনীশক্তি পূর্বে-পশ্চিমে পাথেয় খুঁজেছিল, যুগের কবি তাই সর্বকালীন উৎকর্ষের মূলে পৌঁছলেন। বাইজান্‌টিয়াম্ পর্যন্ত তিনি পূর্বপথে এসেছিলেন— ঐ নামে চিরোজ্জ্বল কবিতা রেখে গেছেন— কিন্তু এসিয়ার গভীর চিত্তে কোনো বিদেশী কবি এমন ক'রে প্রবেশ করেছেন ব'লে জানি না।

সাহিত্যিক লণ্ডনে যুবক য়েট্‌স্। চোখে স্বপ্ন, মাথায় লম্বা চুল; দীর্ঘ, ঋজু তাঁর দেহ, মুখে তাপসিক ভাব। "দি ল্যাণ্ড্ অফ্ হার্টস্ ডিসায়ার্" নাটিকার অভিনয় চলছে। জর্জ মূর ছিলেন উপস্থিত— তাঁর কলমে ১৮৯৪ সালের য়েট্‌স্ -এর বর্ণনা পাই। মাথায় মস্ত বড়ো কালো টুপি, গায়ে কালো ক্লোক,

কলার থেকে ঝুলছে অনেকখানি কালো সিল্কের টাই, পাজামার ভাঁজ গেছে নষ্ট হয়ে— উদ্‌ভ্রান্তভাবে য়েট্‌স্ ঘুরছেন থিয়েটারে। বেশি বয়সে চেহারার অনেক কিছু বদলেছিল; তবু সব মিলে সেই পুরনো ভাবই মনে পড়ে। শরীরের রেখা ভরে উঠেছে, মুখে পূর্ণতার দীপ্তি, কিন্তু সেই তাপসিক দূরত্ব, বেশে ব্যবহারে আর্টিস্টের ঔদাসীন্য— দু-বছর আগেও ওঁকে দেখে অগস্টস্ জন্ -এর আঁকা প্রসিদ্ধ ছবির নতুন সংস্করণ ব'লে মনে হয়েছে। ইতিমধ্যে য়েট্‌স্ হয়েছিলেন সেনেটর স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্রে, কবির একাকিত্ব ঘুচেছে পরিপূর্ণ গার্হস্থ্য সংসারে, নোবেল প্রাইজ সম্মানিত হ'ল তাঁর নামের যোগে। কিন্তু যৌবনের ঔৎসুক্য নেবেনি, মনে করা যায় না তাঁর পথিক-দশা ঘুচেছে। মূর বলেছেন— সাহিত্যলোকে য়েট্‌স্ ছিলেন সন্ন্যাসীগোছের মানুষ। কথাটা সত্য।

১৮৯৯ সালে য়েট্‌স্ "আইরিশ লিটেররি থিয়েটর" স্থাপন করলেন ডব্লিন-এ; তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন লেডি গ্রেগরি এবং দু-এক জন লেখক বন্ধু। থিয়েটরকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র আয়র্লণ্ডে নতুন উৎকর্ষের চেতনা দেখা দিল। স্বদেশী সাহিত্যে নতুন পাতা খুলল এবং তাতে লেখা হ'ল সীন্‌জ্ এবং প্যাড্রায়িক কলাম্ -এর নাম— যাকে বলে, জ্যোতির অক্ষরে। য়েট্‌স্ -এর তাগিদ বিনা এঁদের রচনা হতে আমরা বঞ্চিত হতাম।

য়েট্‌স্ -এর সাহিত্য-জীবন চুয়াত্তর বৎসর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনার ইতিহাস; বাহিরের ঘটনা প্রায় নেই। নিভৃতে পড়বার ঘরে অনেক রাত্রি অবধি আলো জ্বলেছে; জ্ঞানের অধ্যবসায়ে, সুন্দরের ধ্যানে, কত বেদনা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যের দীর্ঘ অভিসার। গদ্যরচনায় তিনি অমরত্বের অধিকারী— "কেল্টিক্ টোয়াইলাইট্" (১৮৯৩), "আইডিয়স্ অফ্ গুড্ অ্যাণ্ড ইভ্‌ল" (১৯০৩), এবং জীবনস্মৃতিসংগ্রহ পাঠকের সুপরিচিত; সংহত সরস গদ্যের ভাষা কবির অন্তর্দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি সূক্ষ্ম বিচারের সঙ্গে দরদী চিত্তের স্পর্শ রেখে গেছেন। গদ্যে তাঁর মনের বিশিষ্ট পরিচয়, কিন্তু কাব্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অধিকার। তিন স্তর দে" "য় তাঁর কবিতার ক্রমবিবর্তনে।

জীবনের প্রথম গভীর শোক প্রেমের অশ্রুপ্লুত গানে তাঁর কবিতায় আভাসিত হয়েছে। আত্মসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে দেখি "প্রি-রাফেলাইট্" রূপকে তাঁর বাণী অলংকৃত, আইরিশ রূপকথা দিয়েছে সুর, কথাকে সাজিয়েছেন নির্জন কারুকাজে। ভিড়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কবি শুনছেন মানস-হ্রদের জলধ্বনি "ইনিস্‌ফ্রি"র তটে, বিশ্ববেদনা শান্ত হয়েছে কল্পছবিতে। আধুনিক কবিদের মতে

"পলায়নী" কবিতার মূল্য চিরদিনই থাকবে— অডেন্ বলছেন, গভীর ঘুমের মতো, ক্ষুধার খাদ্যের মতো, মানুষ চায় সব থেকে দূরে যাবার মন। অথচ, এ-কথাটাও ঠিক যে বিজনতায় সমাশ্রিত কাব্যে সৃষ্টির প্রাচুর্য ধরে না। ১৯১০-এ দেখি কবি য়েট্‌স্ অস্থির হয়েছেন; বলছেন, কল্পনার কারুশিল্পে তাঁর মন ক্লান্ত। আয়র্লণ্ডে তখন জাতীয় স্বাধীনতার ঢেউ উঠেছে, স্বদেশের ধ্যান তাঁর কাছে বাস্তব হয়ে উঠল। নতুনে প্রাচীনে মানুষের উৎকর্ষধারা অধিকার করল তাঁর মনকে। রচনার আঙ্গিকে দৃঢ়তা দেখা দিল। "দি গ্রীন হেল্‌মেট্" কাব্যের আধুনিক বাক্-সংহতি এবং বিরল মাধুর্য মনকে জাগিয়ে তোলে। তৃতীয় পর্যায়ের আরম্ভ স্পষ্ট দেখি "রেস্‌পন্সিবিলিটিস্" কাব্যে। নির্মম সাধনায় য়েট্‌স্ নামলেন বাহুল্যবর্জনের পথে; বললেন, পুরনো রূপকথায় চিত্রিত কোটের চেয়ে কাব্যসৃষ্টিতে নগ্নতাই ভাল। তখনো এজ্‌রা পাউণ্ড -এর মন কিছু প্রকৃতিস্থ ছিল, খ্যাপামির ফাঁকে-ফাঁকে তাঁর প্রতিভার ঝলক পড়ত নতুন যুগের ভাষায়। মার্কিন আধুনিকতার প্রভাবে পড়েও য়েট্‌স্ গদ্য-কবিতায় নামলেন না, কিন্তু পদ্যের কোঠায় আরো সাবধানে চলাফেরা শুরু করলেন। অতিচেতনতার প্রকোপে য়েট্‌স্ তাঁর কিছু পুরনো কবিতা বদলে অঙ্গহানি করেছেন, মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে প্রথম পাঠই থেকে যাবে। হঠাৎ উৎসারিত হয়ে উঠল তাঁর কাব্য নব-নব সৃষ্টিতে; কবি নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে চললেন। এমনতর পরিণত যৌবনেব উদ্দীপনা গীতিকাব্যেব ইতিহাসে দুর্লভ। "দি ওয়াইল্‌ড সোয়ান্‌স্ অ্যাট্ কূল্" (১৯১৯) হতে "দি টাওয়ার" (১৯২৮), "দি ওয়াইণ্ডিং স্টেয়ার্" (১৯৩৩) এবং ১৯৩৫ সালের "দি ফুল্ মূন্ ইন্ মার্চ" পর্যন্ত প্রতিভার ঐশ্বর্য নতুন-পুরনো সব দলকেই আশ্চর্য ক'রে দিল। শেষ কয়েক বছরে তাঁর আরো কবিতা পত্রিকায় বেরিয়েছে, তারও তুলনা নেই। বোধ করি জানুয়ারির "লণ্ডন মার্করি" এবং "আটলাণ্টিক মনথ্‌লি" কাগজে যে-কবিতাগুলি ছাপা হয়েছে য়েট্‌স্ -এর শ্রেষ্ঠ কবিতার আসনে তাদের স্থান। দুই যুগকে তিনি মিলিয়েছেন; দ্বন্দ্ব ঘুচেছে প্রত্যক্ষ জীবনে এবং স্বপ্নেব সত্যে; খরধার ভাষায় তিনি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন ঘননিবিষ্ট গীতিকবিতায়।

তিন

আবার উঠলেন কবি য়েট্‌স্ ঘুরনো সিঁড়ি বেয়ে উচ্চ চূড়ায়,— কিন্তু এ কোন্ চূড়া? পাথর আনলেন আইরিশ পাহাড় ভেঙে; ছাতের সবুজ স্লেট

এল খনি কেটে; গল্ওয়ে প্রদেশে সমুদ্রের কাছে পুরনো দুর্গ পড়ে ছিল, মেরামত ক'রে সেখানে সংসার বাঁধলেন। সত্যকার বাড়ি। স্মরণীয় কবিতায় বলেছেন, তাঁর স্ত্রী জর্জ— জর্জি লীস্— তাঁর এই চূড়ার অধিকারী : আমি কবি উইলিয়ম্ য়েট্‌স্ সংস্কার ক'রে উপহার দিলাম তাঁকে; আমার এই বাণী বেঁচে থাকুক যখন সব মিলেছে আবার ধূলিতে চূর্ণ হয়ে। অপরূপ সৌধের চার পাশে ভিড় ক'রে দাঁড়াল নবীনের দল। বিস্ময়ে দেখল প্রাচীন চিত্রিত দরজা, রঙিন জানলার কাচ, দৃঢ় হয়ে নীল আকাশে উঠেছে খেয়ালের সৃষ্টি। হাটবাজারের বুকেই এই বাসা; চূড়ানিবাসী দৈত্যকে দেখা গেল ভালোমানুষ, আমাদের ভাষাতেই কথা কন যদিচ তাঁর আপন ধ্যানের ভাবে। দল বা গোষ্ঠীর বা যুগধর্মের ছাপ-মারা নেই কোথাও, স্বাধীন সৃষ্টির রহস্য কবিতায় স্বপ্রকাশ।

কবি য়েট্‌স্ তাঁর সংসারেব খবর দিলেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে— চিঠিতে লিখলেন—

"আমাদের দেখা হওয়ার পর আমি বিবাহ করেছি। আমার এখন দুই সন্তান, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, আর মনে হয় জীবনের সঙ্গে আমি আরো ঘন গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছি। জীবনকে যখন তার আপন রূপেই দেখি, যা-কিছু বাহিরের তাকে বাদ দিয়ে, যা-কিছু যান্ত্রিক এবং জটিল তার থেকে ছাড়িয়ে, তখন আমার কল্পনায় তা এসিয়ার মূর্তি নিয়ে দাঁড়ায়। এই মূর্তি প্রথম দেখেছিলাম আপনার লেখায়, পরে কিছু চীনে কবিতায় এবং জাপানী গদ্যে। কী উত্তেজনা হয়েছিল সেই প্রথম আপনার কবিতাগুলি পড়ে— যেন তারা প্রান্তরনদীর মধ্য হতে জেগেছে এবং তারই অপরিবর্তনীয়তা তাদেব অন্তরে।..."

ববীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে লেখা এই চিঠিখানি বেরিয়েছিল ইংরেজি "গোল্‌ডেন্ বুক্ অফ টেগোর"-এ। "জীবনের সঙ্গে ঘন গ্রন্থিতে বাঁধা"— শেষ কবিতার মূল সুর তাঁর ঐ কয়েকটি কথায়। প্রশস্ত ভূমিকা ছিল না তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার, কল্পনা দিয়ে ঘিরেছিলেন জীবনের একটি অঙ্গন; তারই মধ্যে সত্যের চেতনা, সুন্দরের তপস্যা, জাগ্রতের বিশ্বের স্বীকৃতি এসে মিলেছি। নতুন যুগের ক্ষুব্ধ আবরণ ভেদ ক'রে তার সাধনার মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন।

পাস্‌টেরনাক -এর প্রসঙ্গে দুটি চিঠি

বস্টন, ম্যাসাচুসেট্‌স্‌
১৮ ডিসেম্বর '৫৮

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পাওয়ামাত্র পেপার-ব্যাক্‌গুলি অর্ডার দিয়েছিলাম। সব বই এসেছে; একত্র কাল রওনা ক'রে দেব। সামান্য উপহারস্বরূপ আপনাকে কিছু সদ্যপ্রকাশিত বা অধুনামুদ্রিত গ্রন্থ পাঠিয়েছি। আপনি গ্রহণ করবেন। সঙ্গে রইল পাস্টেরনাক -এর "আত্মজীবনী"-সংবলিত ক্ষুদ্র রচনাসংগ্রহ।

পাস্টেরনাক -এর গল্পসংকলনে পেলাম উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। হয়তো বইটা আপনি পূর্বেই পড়েছেন। ভ্রামণিক চিত্র ভোলবার নয়— যেমন ভেনিসের অনুভব-দৃশ্য— সব-সুদ্ধ বড়ো আশ্চর্য এবং যথার্থ। শুধু ভাব নয়, আবির্ভাব। আর্শির কাচে বিশিষ্ট একটি মনের নিভৃত বার্তার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে বাহিরের সূক্ষ্ম চলচ্ছবি। ধরনটা মনে করিয়ে দেয় Kafka বা Rilke-র একটা দিক। যেখানে তাঁরা ডুব-সাঁতারি। ডাঙার ঘটনা জলের তল থেকে দেখেন অথচ অবতরঙ্গে মেলানো পটে খুঁটিনাটি বাস্তবের ভিড়। কখনো যে সরাসরি রাস্তাঘাটের সংবাদ ধরা পড়ে না তা নয়, কিন্তু সলিল থেকে ওঠা চুল-চেরা ক্যামেরার দলিল এঁরা পেশ করেন প্রতিভার বিকল্পে। কথাবার্তা কখনো ঘনধারা, এবং জরুরি; কখনো জড়োয়া মেঘে অন্তর্হিত; আকাশের পরিচয়ে তাদের উদ্দেশ্যবিচার সম্ভব, বক্তব্য হিসাবে ততটা নয়। পাস্টেরনাক্‌ও বিচিত্র ভঙ্গির অনুসারে ভোগ্য, ভাব্য, স্পর্শিত বা দর্শনীয়কে তুলির টানে ঐক্য দিয়েছেন, মন-কেমনের প্রেক্ষিতে তাদের গূঢ় সত্তা ধরা পড়ে, কখনো পড়ে না। স্মৃতির সুতো অদ্ভুত, যা হয়নি তাও যেন বাঁধা হ'ল; যা ছিল বা আছে তার পারম্পর্য খুঁজতে হবে শিল্পীর দারুণ ইচ্ছায়, কালের বাহিরে। আগন্তুকের চুলে বা কণ্ঠের ধ্বনিতে প্রমাণিত হ'ল বিদীর্ণ ভুলে-যাওয়া সংকট, কেউ জানে না ঠিক কী হ'ল, লেখকও নয়, কিন্তু স্বীকৃত হ'ল নির্ঘাত সত্য। গল্পের ধারা বইছে ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ে নয়, মর্জির সমন্বয়ে। মধ্যে যদি জোর তুষার প'ড়ে থাকে তাহলে বাড়ির বা রাস্তার নামঠিকানা পর্যন্ত আদৌ বদলে যাবে, হয়তো রঙের

বদল বেদনার চেয়ে বড়ো পরিবর্তন, ঐ শহরে থাকা সইল না। অথচ তলে-তলে যেন যুক্তির চেয়ে বড়ো মুক্তি ক্রিয়াশীল, অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, হয়তো প্রতীক হয়ে। মার্বুর্গে অধ্যয়নকালে পাস্টেরনাক্ জর্মান দর্শনের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, অথচ সরকারীভাবে Existentialism -এর পশ্চিমী অস্তীতি-তত্ত্ব দেখা দেবার পূর্বেই তাঁর লেখায় ছুঁয়েছিল আধুনিক জর্মান এবং ফরাসী শিল্পদর্শনের প্রাথমিকতা।

বই থেকে নেয়া, বা কাল্পনিক আরো উদাহরণ। ন্যায়ের যুক্তি পাখা মেলে উড়ে গেছে, মুক্তি ঠেকল তিনটে নোনা লাল ফলে, গাছের তলায় ছড়ানো। এরা আছে, এই। ভালো ক'রে ঠাহর হলে মন যে-কোনো-কিছুতে যুক্ত হয়, তাতেই সম্বন্ধের তৃপ্তি উছলিয়ে ওঠে। গ্র্যাণ্ড ক্যানালের বিখ্যাত জল দেখলেন রুশীয় কবি, প্রাচীন মলিন অথচ তার মসৃণ প্রবাহ— সন্ধ্যায় জ্ব'লে উঠল ইতালির তারা, ধরা দিল গণ্ডোলার বিহ্বল ফোটোগ্রাফ। কত যুগের মহান সভ্যতা প্রক্ষিপ্ত কোনো-একটি মুহূর্তকে অবলম্বন ক'বে দৈবে দেখা দেয়, এবং বিশেষ নির্ভর যেন এই দূরাগত কবির চোখে। যা মনে হয় আকস্মিক, বা অকিঞ্চিৎকর তারই উপরে পাস্টেরনাক -এর ঝোঁক; তিনি উদ্ধার পেয়েছেন হঠাৎ সংলগ্নতায়। ঝরনার শব্দ বা স্রোত তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু, সাংঘাতিক অবস্থায় তাঁকে বহুবার আশ্রয় দিয়েছে (স্বজীবনীতে; ডাক্তার জিভাগো উপন্যাসে); মর্মরজালে বেঁধেছে চুরমার অথবা ঠিকরে-পড়া বর্তমানকে। না হলে ট্রেনযাত্রীর মহাদুঃখ, অন্যমনস্ক বড়ো-বড়ো গাছ, রক্ষা করা যেত না। খিদের গেলাস, চিরুনি, পুঁটুলি-ভরা বাসনার উদ্বেগ অতীতের ঝড়ে অথবা নব্য প্রলয়ে তছনছ হয়ে চৈতন্যে হারাত। অনির্দেশ সন্ধান আছে প্ল্যাটফর্মের পাশে দরিদ্রা দোকানি-মেয়েদের চীজ্ বা সসেজ্ বিক্রির আশায়, যার প্রান্তে ঘন অরণ্য। যুদ্ধেব অশ্লীলতায় বা সামরিক ক্রেতার ভস্ত-বাক্যে ও ব্যবহারে প্ল্যাটফর্মের কোণে সেই কেনা-বেচার অপমৃত্যু ঘটল না। তার একটা কারণ তখনো ঝরনার ধ্বনিতে একটি দিন জেগে আছে।

বলা বাহুল্য, এই দিকটাই শিল্পী পাস্টের- ক -এব সম্পূর্ণ প্রাক্-জিভাগো পরিচয় নয়, কিন্তু তাঁর অনেকখানি মিল নব্য-ইয়ে-পাওয়া (এবং কিছু আধুনিক) পশ্চিম-য়ুরোপের সঙ্গে। সেই য়ুরোপ যা গভীর, অথচ অত্যন্ত ডুবে-যাওয়া; যা স্নায়ুর ভারে আচ্ছন্ন অথচ শিল্পে যার পরিচ্ছন্ন মূর্তির অভাব নেই; যেখানে যুগ-সন্ধির চেয়ে যুগ-সন্ধ্যার প্রাদুর্ভাব।

মাত্রা নিয়ে কথা। বোঝা যায় এই ধরনের একান্ত আত্মকেন্দ্রিক লেখকের

পক্ষে উৎকেন্দ্রিক হবার বাধা কম। ভাগ্যক্রমে রাশিয়ায় এঁর জন্ম, প্যারিসের গলিতে নয়; তাই সাইবেরিয়ার দিগন্ত-জোড়া টুনড্রা, জনসংঘের দোল এঁর পৃষ্ঠায় হঠাৎ অবতীর্ণ হয়। টলস্টয় টুর্গেনিভের ইনি সগোত্র তা-ও বোঝা যায়, কিন্তু কতক্ষণ? শেষ পর্যন্ত ইনি ভয়ার্ত; শুধু বহির্গত কারণে নয়, আত্মস্বভাবের বশে।

কোথায় যেন দুই জগতের মিল ঘটেনি এই যুগশেষ-বিলাসীদের শিল্পে। যা উজ্জ্বল অথচ প্রাচীন, যা আগামী অথচ সূর্যসম্ভাবী তার সংগম যেন এঁরা চৈতন্যের সাধনায় জানেননি। হয়তো সংকীর্ণ অর্থে চৈতন্যসাধন— কেবলমাত্র যা মনস্তাত্ত্বিক, বা সৌন্দর্যপিপাসায় অবসরহীন— মানুষের পূর্ণ দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের প্রতিভা অন্যতর। অনুভূতির সূক্ষ্মতম তারে কবি কালিদাস বা শেলি ধরেছিলেন অপরাজেয় মানবচিত্তের ভবিষ্যৎ। দুঃসাধ্য জাতীয়, অথবা মহাজাতীয় বিপর্যয়-পারগামী উজ্জীবনকে পাস্টেরনাক এখনো গূঢ় অভিজ্ঞতায় স্বীকার করতে পারলেন না। তর্জমায় কবিতার বিচার হয় না, তাই তাঁর কাব্যের প্রসঙ্গ এখানে বহির্গত। কিন্তু তাঁর নতুন বা পুরোনো গদ্যের ঝলমলে পরিচয়ে আজ পর্যন্ত চারিত্রের ঔদার্য প্রসন্ন হয়ে দেখা দেয়নি অনাগত বা সমাগতের বৃহৎ জগতে। যেখানে দগ্ধ বাসনা, আত্ম-রতি বা বিরতির চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের অধিকারী মানুষ পথ খুঁজছে, সেই মানুষের শিল্প-নির্ভর অন্যত্র। প্রাত্যহিক আলো এমনকি ধুলোর সংসারে আছে সেই অন্নজল, যা নিরস্ত আত্ম-জর্জর হৃদ্‌গত সাহিত্যে দুর্লভ্য।

বিশ্বপ্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছে প্রাণের আয়তনে সম্পৃক্ত, অথচ বিপুল অপার তৃণতম থেকে সৌরতর সেই প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যের অনেকখানি মূলধন সেখানে। কিন্তু ইতিহাসের তুমুল বিবর্তনে, কোটি আগ্রহের প্রকাশরঙ্গী নাট্যে পর্বে-পর্বে যে জনানীর যাত্রা খুলে যাচ্ছে, তা-ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। সেখানেও কখনো প্রতিহত স্ববিরোধী, কখনো দ্রুত অভিযানী জনস্রোতে সাহিত্যের মহাধন খুঁজে নিতে হয়। শিল্পী এই ত্যাগের বীর্যের ঐতিহাসিক মানবিকতাকে অস্বীকার করলে অনেকখানি বঞ্চিত হন; পাস্টেরনাক-এর মতো শ্রেষ্ঠ লেখক এই স্বনির্বাসন মেনে নেবেন তা মনে করা যায় না। যদি জবাবদিহি আসে কোনো রাষ্ট্রিক ঘটনার যোগে তাহলে বোঝা যাবে শিল্পের দিক থেকে পুরো উত্তর দেওয়া হ'ল না।

বুঝতে পারছেন "ডাক্তার জিভাগো"র প্রসঙ্গ এড়াতে পারিনি। শৈল্পিক

বিবিধ অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও এত মহান শক্তিশালী রচনা যে-কোনো যুগেই আন্দোলন তুলত। কিন্তু এই অর্ধ-পোলিটিকাল নোবেল-প্রাইজের যুগে (যেখানে জেনারেল মার্শাল শান্তির বক্‌শিশ পান, মহাত্মা গান্ধীর নাম পর্যন্ত ওঠে না) পাস্টেরনাক বিপর্যস্ত হলেন উভয় পক্ষের মল্লদের হাতে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রুক্ষেরা তাঁর নামকে টেনেছে বারুদ-ভরা বাক্যের মিথ্যায়। কোনো পক্ষেরই জিৎ হবে না ঐ বইয়ের জোরে। কারণ যদিও তিনি রুশ-বিপ্লবের দাহ-চিত্র এঁকেছেন— শাদা-লাল কা'কেও সমর্থন না-ক'রে— শেষ পর্যন্ত তাঁর শিল্প নিভৃতচারী, এমনকি সংকুচিত; ধীর নৈঃশব্দ্যে তাঁকে শোনা যায়। অবাক কাণ্ড এই যে সুচারু শিল্পীকে নিয়ে ঘনিয়ে উঠল অব্যবসায়ীদের ঝড়। যাঁরা লেখক বা রুচিশীল পাঠক তাঁরা এই বাগ্‌-যুদ্ধে বিরত হলে ভালো করতেন, এখন উপায় নেই। কৌতুকের বিষয় এই যে, নানা দেশে রেডিও এবং হলদে-কাগজি পত্রিকায় যাঁরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্য বিতরণ করছেন তাঁরা কৃষ্ণের ব্যাখ্যায় ক-উচ্চারণ জানেন না, জিহ্বাগ্রে জ়িভাগো তাঁদের কাছে নামমাত্র, কিংবা কলহের উদ্যত চিহ্ন।

বইখানি আদ্যোপান্ত ভালো ক'রে প'ড়ে দেখেছি। যথাযথ আলোচনা পত্রে অসাধ্য, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় কোনো আধুনিক বইয়ের প্রতিক্রিয়া হৃদয়ে এত আঘাত, এত অনির্বচনীয় ধন্যতা, এত নৈরাশ্য এবং ক্ষোভ একই সঙ্গে জাগিয়ে তুলবে ভাবিনি— শুধু সেইটুকু বলতে চাই। আমার ধারণা বইখানির বিশ্বজোড়া ফল মোটের উপর সোভিয়েটের সপক্ষেই মর্যাদা বাড়াবে, যদিও ঠিক বলতে পারি না। তার একটা কারণ এই যে গল্পের সব-চেয়ে প্রচ্ছন্ন অথচ স্মরণীয় পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে প্রধান বোধ হয় স্ট্রেল্‌নিখভ। অথচ তিনি সোভিয়েট-কর্মী। তাঁর স্বভাবজাত কঠিন বীর্য হঠাৎ জ্ব'লে উঠল চরম ত্যাগের মহিমায়, যদিও তারও চেয়ে মহিমার জন্য চাই বাঁচবার কল্যাণসাধনা। তুলনায় ডাক্তার জ়িভাগোকে অতি বাক্যশীল এবং বিলুব্ধ মননজীবী ব'লে ভ্রম করা পাঠকের পক্ষে আশ্চর্য নয়। মনে পড়ছে স্ট্রেল্‌নিখভ -এর শেষ জীবনরাত্রি। অবিস্মরণীয় লারিসা-র সম্পর্কে দুই পুরুষকেই শিল্পী উর্ধে ..ল ধরেছেন, কিন্তু নতুন কালের উদ্যোগী বীরের প্রতি মানুষের বেশি আকর্ষণ, বিশেষ ক'রে যখন তা অপ্রত্যাশিত ক্ষমা এবং করুণায় দেখা দেয়। লারিসা-র চোখে স্ট্রেল্‌নিখভ -এর মূর্তি চিরদিনের মতো সাহিত্যে আঁকা রইল।

পাস্টেরনাক -এর সৃষ্টিশীল মনকে জ়িভাগোর সঙ্গে একীভূত করা সুবিচার নয়, কিন্তু মূলত এই আত্ম-বিভক্ত, জটিল, স্ববিলাসী ডাক্তারকে তিনি বড়ো

জায়গা দিয়েছেন। সেই জায়গা আমরাও দিতে রাজি, কিন্তু যদৃচ্ছাচারী অসম জীবনের অন্য নানা দিক আমরা লক্ষ না-ক'রে পারি না। মারিনা-র প্রতি বৃদ্ধ জিভাগোর ব্যবহার ধিক্কারের যোগ্য বললে কম বলা হয়। কতকগুলো পুরোনো মতামত লেখবার বিরাট দায়িত্ব নিয়ে এই লেখকবীর ডাক্তার সংসারকে পায়ে মাড়িয়ে যাবেন, অথচ লোকেরা যশোগান করবে এমনটা আশা করা যায় না। বায়রনী-বৃত্তিকে আর্টের মূল্যে আজ কেউ বেচতে গেলে ব্যর্থ হবেন, এমনকি স্বয়ং পাস্টেরনাক-ও। জানি, জিভাগোর ঐ অবস্থা তার পতনের চিহ্ন ব'লেই আঁকা হয়েছে এবং এক পক্ষের সমালোচকেরা খুশি হয়ে ঘোষণা করেছেন এই পতনের (এবং বিশ্বজোড়া যত-কিছু পাপের) একমাত্র কাবণ বিশেষ একটি রাষ্ট্র। কিন্তু এই ধরনের যুক্তিকে গ্রাহ্য করতে নেই। আর্টের সঙ্গে সমগ্র মানুষেব এবং সমাজের যে-যোগসূত্র আছে তার উজ্জ্বলতর পরিচয় পাস্টেরনাক কোনোদিন লেখায় ব্যক্ত করবেন আশা বইল।

পলিটিক্সের দিক থেকেও পাঠকমাত্রই বুঝবেন অন্ধ বিপ্লবই রুশ আন্দোলনেব বা অন্য কোনো জাতীয় আন্দোলনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। কল্যাণে বিজ্ঞানে শিল্পে মানুষ এগিয়ে গেছে, বিপ্লবকালেব এবং পববর্তী কালের শত-শত অবর্ণনীয় অমার্জনীয় পাপ সত্ত্বেও। আবার বলি, অমার্জনীয়, কেননা কোনো উদ্দেশ্যেই বিভীষিকা অত্যাচার বর্বরতা আমরা মানি না। কিন্তু এই ব্যাপার একটি-কোনো দেশের স্কন্ধে চাপিয়ে আমরা উদ্ধার পাব না। পাস্টেরনাক -এর ঠিক সেই ইচ্ছা ছিল না, যা তিনি নিজের জীবনের বিশেষ ঘের দিয়ে জেনেছেন তাই নিয়েই লেখা তাঁর বই। কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপকতব জ্ঞান কোথাও ফুটিয়ে তুললে তিনি ভালো করতেন। ফরাসী-বিপ্লবে, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে অথবা এসিয়ার বহু "ধর্মযুদ্ধে" পাপের রক্তবন্যা ব'য়ে গেছে। পাস্টেরনাক -এর বুলি বজ্র হয়ে সকল বর্বরতাকে বিদ্ধ করলে নানা পক্ষ হতে ঘোর আপত্তি উঠত জানি— হয়তো দেশে-দেশে তাঁকে ধিক্কৃত স্থান দিত— কিন্তু স্বাধীন সাহিত্যবিচারের পক্ষ হতে আমরা আপত্তি জানাবার দলে নই। আমরা অর্থে ভারতীয় নয়, সকল দেশের সেই আমরা, যারা এখনো রাষ্ট্রিক আঁধিতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হারাইনি। এই-সব তীব্র প্রসঙ্গে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, বহুজনীন সমাজের অন্য আর-একটা দিক উদঘাটিত হলে জিভাগো-গ্রন্থের মর্যাদা বাড়ত। আপন দেশের উল্লেখে সেই অপরাজেয় কল্যাণশক্তির নতুন পরিচয় জানালে ক্ষতি কী? নৃশংসতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত অস্বাধীনতার বিরুদ্ধে বর্ষিত শিল্পবাক্য

কোনো তথ্যের স্বীকারে দুর্বল হ'ত না, প্রবলতর হ'ত, কেমনা "সার্বিক রাষ্ট্র"-যন্ত্রের ফাটলে কোথাও একটু মনুষ্যত্ব মাথা তুলেছে, সেই মনুষ্যত্ব থেমে নেই, ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই কথা বলার দ্বারা অসত্য বা অন্যায়ের সমর্থন করা হয় না। এই সহজ সত্যটি মহা প্রতিভার আলোয় দৃপ্ত হয়ে ওঠেনি ব'লে পাস্টেরনাক -এর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল পাঠকের মনও ক্ষুণ্ণ হয়।

খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে ডাক্তার জিভাগোর ব্যবহার অতি বিচিত্র। চরিত্র বা আচরণের ক্ষেত্রে ন্যু টেস্টামেণ্ট কেবল আপ্তবাক্যের মতো শূন্যে ঝুলে আছে। বারংবার শ্লোকোচ্চারণ চলেছে, কিন্তু একান্ত স্বার্থপরতা, দুর্বল মননের ক্রিয়াকাণ্ড তারই ছায়ায় লালিত হ'ল, যেমন শুনেছি জুয়োখেলার সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বতী প্রার্থনাচক্র আবর্তিত হ'ত। মোক্ষের এই উৎকৃষ্ট উদাহরণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পশ্চিমী ধার্মিক অনায়াসে গ্রহণ করেছেন, জিভাগোর খৃষ্টধার্মিকতার উপর কত ডজন উপদেশ আমরা শুনলাম তার ঠিক নেই— অথচ যথার্থ খৃষ্টধর্মীদের কথা আলাদা। তাঁরা ঠাণ্ডা-গরম কোনো হত্যাকাণ্ডের সপক্ষে নন। অন্যান্য ধর্মা-বলম্বীদের মধ্যেও এই শুভ্রতা বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই ছড়ানো। কিন্তু খবরের কাগজে সেই খবর নেই কেন ? যতদূর মনে পড়ছে ভারতবর্ষের কোনো কাগজে জিভাগো গ্রন্থ বিষয়ে পশ্চিমের প্রতিধ্বনি বা তারই সমধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু শুনিনি। আমার দূর কানে ঠিক আওয়াজ মাতৃভূমি থেকে এসে পৌঁছয়নি, এখনো এই আশ্বাস চিঠিতে ব্যক্ত কবি।

হাওয়াই-ডাকের দীর্ঘ পত্রে হুহু ক'রে যা-কিছু লিখে ফেললাম তা বইয়ের আসল মর্মকে বাদ দিয়ে রচিত। স্তব্ধ হ'' যাই যখন লারিসা-র কথা ভাবি। জিভাগোর জীবনের উচ্চ শিখরে-শিখরে যে-আগুন আলো হয়ে উঠল, নত হয়ে উন্নত হয়ে তাকে পাঠকের নমস্কার জানাই। অন্য কোনো চিঠিতে হয়তো সেই চিরন্তন দীপ্তির পবিচয়ক্ষেত্রে নামব, যেখানে পাস্টেরনাক -এর রচনা মৃত্যুহীন। জিভাগোর মৃত্যুর অপ্রত্যাশিত পরমুহূর্তে সেই অমরতা দেখতে পাই। লারিসা-র কয়েকটি কথায় শিল্পের মন্ত্রোচ্চারণ হ'ল, জীব যার শেষ নেই। তার পরে তার নিজের নামহীন অনির্দেশ এবং মৃত্যুর সম্ভবপর ঘটনা যেন মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে। যেখানে পাস্টেরনাক আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন শিল্প সেই অঙ্গনের চতুর্দিকে, তার তলে, তার ঊর্ধ্বে। জীবনে-জীবনে বিস্তৃত আলো দেখা গেল, হয় তা বহু গৃহদীপের, নয়তো আকাশের গ্রহমালার।

পাস্টেরনাক -এর কাব্যের প্রসঙ্গ তুলব.না বলেছিলাম, যদিও ইংরিজি তর্জমার

বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে যা দেখেছি তাতেও মুগ্ধ হয়েছি। জালি-কাজ করা ছায়ায় আলোয়, কাচের ছাঁকনিতে উদ্ধৃত কতটুকু কী দেখেছি তা যাচাই করবার সাহস নেই। কিন্তু পাস্টেরনাক আসলে কবি। যদিও তাঁর গল্পে চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনার আবহরচনার শক্তি অসামান্য, শেষ পর্যন্ত গদ্যেও যেখানে তিনি কবির যথার্থ অবসর পেয়েছেন সেই-সব মুহূর্তেই তিনি জয়ী। তাঁর জয়লাভ সেখানে সকলের সঙ্গে এক হয়ে, হোক তা মানুষ, বা সংসার বা পৃথিবীর অন্য কোনো দান। এই অর্থে তিনি বলেছেন—

> "The nameless ones are part of me
> Children also, the trees, and stay-at-homes,
> All these are victors over me—
> And therein lies my sole victory."

দুই

বস্টন এয়ারপোর্ট
৯ এপ্রিল ১৯৫৯

প্রিয়বরেষু,

টেক্‌সাস -এর দিকে চলেছি,— আপনাকে তার আগে আমার গভীর হৃদয়-জাত সেদিনকার একটি কবিতা পাঠিয়ে দিই। কিছু ছন্দের পরীক্ষা লক্ষ করবেন, কিন্তু এই কঠিনসাধিত অথচ বিস্রস্ত বাক্যের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি-ময় কুহকে যদি সমস্ত জীবনেব অগ্নিকণা হঠাৎ না-দেখা দিয়ে থাকে তাহলে রচনা ব্যর্থ হ'ল। U. N.-এ যাতায়াতের পথে বৃষ্টিবাদলের শহরে থেমে-থেমে লিখেছিলাম, তারপর রোদ্দুরে-ধোওয়া ইস্ট নদীর ধারে পাথবের সাঁকোতে ব'সে মিছিল-যাত্রার ক্ষুদ্র কাব্য শেষ করেছি।[১] ন্যুইয়র্কের আলোয় মনে-পড়া সেই আমার পৃথিবীর দিন।

আপনি ঠিকই লিখেছেন, সাহিত্যের বিচার তার অন্তর্গত মতামত বা রাষ্ট্রিকতা যাচাইয়ে সম্পন্ন হয় না। আমিও সেই কথাই বলতে চেয়েছিলাম "কবিতা'র ঐ চিঠিতে। অথচ কোথাও একটি গভীর যোগ আছে, তাও মেনে নিতে হয়। সেই যোগ মতামতের উৎসে পৌছিয়ে ধরা যায়। "গোরা" উপন্যাসে

১ 'কবিতা', বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩-এ প্রকাশিত 'পৃথিবীতে'।

যদি রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের ইতর দিককে উঁচু দামে পুজো করতেন তাহলে গল্পের শিল্পমূল্যও হ্রাস হ'ত বৈকি— কোথাও ধরা পড়ত শিল্পীর মাত্রাবোধের অভাব। সমগ্র দৃষ্টিতেই ক্ষুদ্র জিনিসকেও দেখা যায়, ভগ্নদৃষ্টিতে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের বাংলা সমাজে আনন্দময়ী আছেন; পানুবাবুর পাশাপাশি পরেশবাবু; অভিযানী নতুন বাংলার দৃশ্য। অথচ কেবলমাত্র যথার্থের জন্য কবি ক্রমাগত ভারসামঞ্জস্য দেখাতে অগ্রসর হননি, গোরা-সুচরিতায় প্রাণের স্বচ্ছ ভাষণে তিনি স্বভাবতই মাত্রা রেখেছেন,— সামনে চেয়ে দেখেছেন। সমাজের উজ্জ্বল নিষ্প্রভ, জীর্ণ উদ্যত দুই দিককেই বেদনায় বিশ্বাসে বীর্যে তৌল করেছেন— মতামতের তাগিদে নয়, সেই প্রাণশিল্পের আগ্রহে যা অতিমমত্বে ক্ষুণ্ন নয়, কামুকতায় দুর্বল নয়, স্বাধীনতার নামে যা উচ্ছৃঙ্খল ঔদাসীন্যকে কখনো মানেনি।

পাস্টেরনাক -এর মতো কবির কাছ থেকেও রাশিয়ার, অর্থাৎ তাঁর গভীর-জানা সামাজিক জীবনের, আর-একটু প্রশস্তদৃষ্টিসম্পন্ন পরিচয় পাব আশা করেছিলাম। তার জায়গায় পেলাম অতি আশ্চর্য গভীর রচনা যা কখনো হঠাৎ ভেঙে গেছে শিল্পীর আত্মজীবনের বিরুদ্ধতায়, শিল্পের প্রসাদগুণের অভাবে। একেবারে শেষ প্যারাগ্রাফে এবং মধ্যে-মধ্যে অন্যতর ইশারা আছে। কিন্তু গল্পে তার জায়গা এত কম যে অতবড়ো দিগন্তজোড়া দৃশ্য হঠাৎ দিগন্তহীন রুদ্ধতায় অলীক এবং সংকুচিত হয়ে বিশ্বাসবোধকে ঠেকিয়ে রাখে। সব মিলে কোথায় যেন অসংগতি আছে। অত আশ্চর্য রচনাও পাঠকের মনে প্রশ্ন তোলে লেখকের শৈল্পিক বিচার সম্বন্ধে। এইখানে জিভাগো পৌঁছল না টলস্টয়, টুর্গেনিভ, চেখভের কাছে, যদিও অন্য নানা দিকে এই বই তাঁদের লেখার সমকক্ষ এমনকি শ্রেষ্ঠ।

সমাজ বা ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কাব্যের যোগ প্রাণধারায়, জীবনের ভিতর দিয়ে। ঔদার্যের সাহসে, শিল্পীর চৈতন্যে সেই প্রাণ ধরা দেয়, ছন্দে-বর্ণে তাঁর জীবন থেকে রচনায় চারিয়ে যায় সমগ্র সত্যের বোধান্বিত কম্পনে। জিভাগো উপন্যাসে মহাসৃষ্টিশীল প্রতিভা হঠাৎ কোনোখানে অপ্রতিভ হয়ে দেখা দিলে আমরা ক্ষুব্ধ না হয়ে পারি না। যদি তাঁর দেশের লোক হতাম, তাঁরই মতো দুঃখ-তীব্রতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতাম, তাহলে আমাদের এই ক্ষুব্ধতা আরো দারুণ হ'ত। যে-সব তথ্য আজ বিশ্বপ্রতীতির ক্ষেত্রে সকলে স্বীকার করতে রাজি— এখানে রাষ্ট্রিক তর্ক বা পক্ষের কথাই ওঠে না— এবং যা তিনি

নিজেও ভিতরে-ভিতরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তাকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর অধিকারে বা অভিমানে বাধল। তাঁর দ্বিধা গল্পের ফাটলে যেখানে দেখা দিয়েছে সেখানে সেই পরিমাণে শিল্পীর নির্ভীক সত্যদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন হয়েছে। অথচ তাঁর বেদনায় আমরা ব্যথিত, যেখানে তাঁর শিল্প নৈরাশ্যের অতিভারে ভেঙে পড়েছে, আমরা চিত্ত দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তা খুবই বুঝে নিতে পারি। কিন্তু এই সমহৃদয়তার ফলে গল্পের অসম দৃষ্টিকে মূল্য দেওয়া চলে না। স্নায়বিক আক্রোশের অতি প্রকাশ বাধা হয়ে উঠল,— দুর্যোগের তলে-তলে নবযুগসৃষ্টির সত্যকে জিভাগো দেখতে পেল না। সাংঘাতিক ঐ আত্মবন্দীদশার ক্রিয়া পাঠককে আহত করে যখন জিভাগো একেবারে নিছক গুণ্ডার হাতে জেনে-শুনে প্রাণতুল্য লারিসাকে তুলে দিল। রাত্রে ঘরে ব'সে ভড্‌কা খেলে কী হবে, ঐ মানবত্বহীন অবস্থায় লেখা কবিতার দৌড়ও তথৈবচ। বোঝা যায় রীতিমতো শিল্পবিরুদ্ধতা, চারিত্রিক ভগ্নবিলাসিতা লেখককে এবং তাঁর রচনাকে বারে-বারে প্রতিহত করেছে। নতুন গ'ড়ে-ওঠা তাঁর দেশে অন্য যে-সব বিষম দুর্বিচার অন্যায় থাকুক না কেন, তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালে, সাম্প্রতিক লেখক, কবি, চিত্রী ঐ বই প'ড়ে কেন যথার্থ আঘাত পেয়েছে তা বোঝা যায়। মূর্খ রাষ্ট্রিক ভাড়া-করা বীরদেব কথা বলছি না, সব দেশেই তারা আজ ঘৃণ্যতায় জর্জরিত, পরুষ-বাক্যের কৌশলী খেলোয়াড় ওরা উভয়পক্ষেরই চরম লজ্জার বিষয়। অর্থের লালসায় এবং মিথ্যার উত্তেজিত তামাশায় তারা তমসাবৃত।

তাছাড়া স্বাধীন মতাবলম্বী অন্যদের বিরুদ্ধতা অবশ্য "সার্বিক" রাষ্ট্রেও বরাবরই আছে, অন্য দেশেও তাই। কিন্তু তাদের সুর একটু অন্য।

পাস্টেরনাক সবই জানেন এবং সম্ভবত নতুন বইয়ে অতিমাত্রায় ধার-শোধ করতে গিয়ে আবার তাঁর শিল্পকে অন্যভাবে আহত করবেন। আমরা যারা তাঁকে চরম শ্রদ্ধা করি, তাঁব বিভক্ত জীবনের উপর জয়ী তাঁর কবি-মানসকে চিনেছি, আমাদের কাছে তাঁর আশ্চর্য উপন্যাসের মহিমাই চিরন্তন বিস্ময়ের ব্যাপার। অথচ মণিমালায় যেখানে গ্রন্থনের শিথিলতা, অথবা যেখানে হঠাৎ মণির বদলে কাচের তীক্ষ্ণ টুকরো জায়গা পেয়েছে দরদের সত্যভাষিতায় সেই আত্যন্তিক ত্রুটিগুলোকেও ঢাকা দেব না। কেননা আসল প্রসঙ্গ মানবজীবনের সর্বতম সূক্ষ্মতম বোধকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"তে ঐ দেশ সম্বন্ধে যে-সকল স্পষ্টদর্শিতা আছে সমগ্র আন্দোলনের একটি "বড়ো" দিক সম্বন্ধে জিভাগোতে সেই দৃষ্টি নেই।

দান্তের *Divine Comedy* বহু স্থানে নকল ধার্মিকতার দোষে রীতিমতো নিম্নতাদুষ্ট তা আমরা তাঁর কাব্যের পূজারী হয়েই ব'লে থাকি। উগ্র ক্যাথলিক-রূপে তিনি মুসলমান ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বীদের "নরকে" পাঠিয়ে তৃপ্ত হলেন না, মহম্মদকে লাঠি মারিয়ে তেলে পুড়িয়ে অপমান ক'রে আপনাকেই এবং আপন শিল্পকে অপমানিত করলেন। *Divine Comedy* কাব্য হিসাবে এই প্রসঙ্গের দ্বারাই বিচারিত হবে না, ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে কবির দৃষ্টি যেখানে তিনি যথার্থ জ্যোতির্দৃষ্টিময়— কিন্তু শিল্প জিনিসটা অনেক সূক্ষ্ম তন্তুর সমবায়ে গড়া, তাই যেখানে কোনো সুতো ছিঁড়েছে বা তা কৃত্রিম বা মিথ্যা— সেখানে শিল্পের দিক থেকেই ক্ষতি ঘটেছে স্বীকার করব। *Divine Comedy* -র অনেকখানি আজ তাই শিল্পাগ্রহীর কাছে বর্জনীয়; কী আর করা যাবে।

পাস্টেরনাক অতদূর যাননি, বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু জিভাগো যত জোরেই জাহির করুন না কেন যে, "সমস্ত মানুষের ইতিহাসের উৎপত্তি যীশুখৃষ্টে"— এরকম অদ্ভুত অতিধার্মিকতার উৎপাত বইয়ে কিছু রয়েছে— এমনকি খৃষ্টীয় পাঠকের কানেও তা বাধবে। যদি পাঠক যথার্থ সাহিত্যিক হন, যাই হোক না কেন তাঁর "ধর্ম"। সাধারণ নীতিরক্ষার দিক থেকেও নব-দীক্ষিত পাস্টেরনাক এখানে ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে খাঁটি খৃষ্টানি প্রচার করেননি। আবার ফিরে আসিতে হয় অপ্রত্যাশিত চারিত্রিক ভগ্নতার প্রসঙ্গে। এক দিকে ধার্মিক গোঁড়ামি অন্য দিকে জিভাগোর চরিত্র মানবিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উদ্‌ভ্রান্ত বা ক্লান্ত ঔদাসীন্যে ক্ষয়শীল। "মরালিটি"র দরিদ্র আখ্যা নিয়ে তর্ক করব না, চিত্ত-ধর্মের অভাব যেখানে মানবধর্মের প্রকাশে বাধা দিয়েছে সেখানে আপত্তি জানিয়ে রাখব। সেই আপত্তি শিল্পরুচির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সবাই যদি লামা-ধর্মাবলম্বী হয়ে প্রার্থনাচক্র ঘোরাই তাহলে এত-সব সমস্যার কথাই ওঠে না। ধর্মের নামে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবজ্ঞা তিব্বতী ছায়ায় ঢাকা প'ড়ে যাবে। কিন্তু সাহিত্যধর্ম লামাধর্ম নয়, যা অনায়াসে শিশুহত্যা, জুয়াখেলা, পবিত্র কুসংস্কারের বিরাট চক্রান্তে আবর্তিত হয়ে চলেছে, অর্থাৎ অচল হয়ে রয়েছে। লামায়িত হবার বিরুদ্ধে যে চৈনিকতা উদ্যত তার সঙ্গে সাহিত্যিক চিত্তের যোগ প্রায় শূন্য— যদিও তাদের মূল উদ্যোগ হয়তো কিছু পরিমাণে উজ্জ্বল— কী জানি। ভাগ্যের কথা, আমাদের অনেকের ধর্ম বা পাস্টেরনাক -এর খৃষ্টধর্ম লামাপূজার স্তরে নামেনি, (লামা-বিচ্ছেদ-যজ্ঞেরও নয়), তাই রাশিয়ান কবির সঙ্গে ধর্ম এবং ধার্মিকতার আলোচনা আমরা

নির্ভয়ে চালাব। ভরসা আছে তাঁর গোঁড়ামি কিছু কমে যাবে বৃহত্তর জগতের যোগে।

…এখন প্লেন ধরবার সময় হলো— চলি।

আমাদের প্রীতি জানবেন।

পুঃ— আপনাদের প্রতিবাদী কোনো পত্রেব সঙ্গে এই চিঠি ছাপালে সুখী হব। যত দিক থেকে আজকের সাহিত্য এবং সমাজসমস্যার বিশ্বজোড়া আলোচনা হয় ততই ভালো।

বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত চিঠি। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত

জয়েস্ প্রাসঙ্গিক

প্যারিস। কুয়াশাচ্ছন্ন অপরাহ্ণ ; রাস্তায় আলো জ্বলছে। য়ুরোপ ছাড়বার সময় হয়ে এল। সীরিয়া হয়ে দেশে ফেরবার উদ্যোগ করছি, বেশির ভাগ দিনটা তাই কাটল বিভিন্ন টুরিস্ট আপিসে। হঠাৎ মনে হ'ল যাই জয়েস্ -এর কাছে ; শেষ ফরাসী সন্ধ্যাটা ভ'রে তুলি। সেদিন দেখা হয়েছিল এক সম্মেলনে, আসতে বলেছিলেন।

জেম্‌স্ জয়েস্ -এর লেখা কখনো ঠিকমতো পড়িনি, এখনো আমার অসাধ্য। শব্দসমুদ্রে এক ডুব দিয়ে চলে আসি, তা-ও নানারকম শ্যাওলা এবং অদ্ভুত জীব গায়ে লেগে থাকে। অস্বস্তি বোধ হয়। অভিজ্ঞতার গভীরতাও চোখে-মনে ঝলকে দেয়, ভোলা যায় না। কত রং, কত গতি, জলের নিচে ভাঙাচোরা টলমল দৃশ্য। নোনা জলে চোখ জ্বালা না করলে আরো দেখা যেত— এই বাক্-সমুদ্রে বেশিক্ষণ থাকতে ডুবুরির বিশেষ কৌশল-সরঞ্জাম চাই। অথচ এও জানি যে আমাদের ভাষা, চিন্তাধারার ভঙ্গি কোন্ দূর সূত্রে ঐ উত্তাল খ্যাপা জিনীয়সের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। অর্থাৎ আজ আমরা যা, তার খানিক অংশ এই প্যারিসীয় আইরিশ লেখকের যদৃচ্ছ রচনার ফল। দশ হাজার মাইল পারের আগন্তুক বাঙালির মনে এই আত্মীয়তার রহস্য আশ্চর্য ঠেকছিল।

উঠলাম সিঁড়ি বেয়ে। জয়েস্ -এর ঘন পর্দা দেওয়া ফ্ল্যাটের দরজায় লেখক স্বয়ং দাঁড়িয়ে। খুব একটা পুরু কার্পেট ; প্রশস্ত, সজ্জিত, অথচ পুরোনো ভাব ঘরটায়। বহু আলো জ্বালা। জয়েস্ -এর চোখে অত্যন্ত মোটা চশমা, অস্বচ্ছ দৃষ্টির কাচে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে যায়। আবার মনে পড়ল সামুদ্রিক জগতের কথা। ইনি ঠিক শক্ত ডাঙার লোক নন।

উঠল ভারতীয় প্রসঙ্গ ; সেখানে লেখক... কী করছে? খুব সশ্রদ্ধভাবে রবীন্দ্রনাথের নাম করলেন। বললেন তর্জমা পড়তে নেই, তর্জমা সাহিত্য নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই বাঙালি-প্রতিভাকে তবু চেনা যায়। তাঁকে

জেম্‌স্ জয়েস্ (১৮৮১-১৯৪১)। প্রধান গ্রন্থ: (ছোটোগল্প: *Dubliners* ; উপন্যাস: *A Portrait of the Artist as a Young Man*, *Ulysses*, *Work in Progress* (ছোটো-ছোটো অংশে প্রকাশিত) ; কবিতা: *Chamber Music*.

দেখেওছেন প্যারিসে। বাংলাভাষায় কি বহুদেশের শব্দ মিশেছে ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ? ভাষা সম্বন্ধেই সব-চেয়ে কৌতূহল দেখলাম।

নিজের কথা বিশেষ বলতে চান না। কিন্তু *Work in Progress* সম্বন্ধে কিছু ইশারা পাওয়া গেল। একদিন জয়েস্ এক বন্ধুকে (মনে পড়ছে না Ogden না Richards) নতুন লেখার অংশ পড়ে শোনাচ্ছেন। ডিনার খাওয়া হয়ে গেছে ; টেবিলটার ধারে দু-জনে তখনো ব'সে। হঠাৎ কী-একটা কথা মিলিয়ে দেখবার জন্যে জয়েস্‌কে অন্য কামরায় যেতে হবে, দরজা খুলে অন্ধকারে একেবারে দাসীর গায়ে গিয়ে পড়লেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দরজায় কান দিয়ে সে শুনছিল। ফরাসী দাসী, তাছাড়া অশিক্ষিতা বললেই চলে— রচনার এক বর্ণও তার বোঝা অসাধ্য। (ইংরেজ এবং শিক্ষিতা হলেও বুঝত না।) বললেন, দেখো, যারা বোঝবার তারা বোঝে। কেন কে বোঝে তার উত্তর নেই। যারা শোনে বা পড়ে, শোনবার এবং পড়বার জন্যেই, তাদের বুঝতে বাধে না। কারণ, বোঝাটা উপলক্ষ। পণ্ডিতেরাও সাহিত্যে কখনো প্রবেশ করে না তা নয়। কিন্তু সব-চেয়ে বড়ো কম্‌প্লিমেণ্ট পেয়েছি মূঢ় দাসীর কাছে।

শুনে গেলাম। মার্কিন-ঘেঁষা উচ্চারণ, খানিক ব'লে অনেকক্ষণ থেমে যান, আবার কথাটা শেষ করেন। ফুট্‌কি দেওয়া, আলগা কথার প্যারাগ্রাফ। কিন্তু চিত্তহারী। দু-চার মিনিট চুপ করে বললেন, গ্রামোফোনের রেকর্ডে আমার কণ্ঠের গদ্য পাঠ আছে। অনেকে শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। এর নানারকম কারণ রয়েছে। রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গেও আচ্ছন্নতার যোগ হয়তো আছে। কিন্তু গান শুনে এমনি হয়। সেটা মানের জন্যে নয়।

তাঁর স্ত্রী এলেন। চা খেতে হবে। পুরোনো রুপোর চা-সামগ্রী নিয়ে যে ঢুকল, সাজিয়ে দিল, এই কি সেই শ্রেষ্ঠ সমঝদার প্রাচীনা গৃহসেবিকা ? প্রশ্নটা মনেই রয়ে গেল। চায়ের সময় জয়েস্ -এর মুখ গম্ভীর, কথা গম্ভীর। প্লেট, চামচ, আহার্য, কে খাচ্ছে, কেন খাচ্ছি এই-সব নিয়ে যেন অত্যন্ত কী-একটা ভাবছেন। চায়ের জিনিসগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। মধ্যে প্রশ্ন ক'রে নিলেন কবে যাব, ঠিক কোন্ সময়ে, ঠিক কোন্ ট্রেনে। মনে হচ্ছিল গভীর কোন্ রহস্যের সন্ধান দিচ্ছি।

আর-একটা কথা মনে আছে। ছোটো ছাপানো পুঁথি দেবেন আমাকে, নতুন গ্রন্থের টুক্‌রো। বললেন, জাহাজে উঠে যেন পড়ি। এবং জাহাজ থেকেই সঠিক জানাই কীরকম লাগল। বইয়ের বক্তব্য এবং ভাষা সম্বন্ধে বললেন, শোনো।

যে-কোনো য়ুরোপীয় বন্দরে মদের আড্ডায় দু-দশ দেশের নাবিক জোটে, তারা কেউ নেমেছে দু-ঘণ্টার, কেউ দু-দিনের জন্য। এসেছে সন্ধ্যায় একটু মিলতে-মিশতে। কী তাদের বক্তব্য, কী তাদের ভাষা? কেউ নরোয়েজিয়ান, কেউ লেভান্টাইন জু, ডচ্, স্প্যানিয়ার্ড কি মার্কিন বা ইংরেজ। ভাষার কোনো রাস্তা নেই অথচ বেশ কথাবার্তা চলে। হাতে বোতল, চোখে হাসি, মুখে কথার ফোয়ারা, কেউ দীর্ঘ গল্প বলছে, অন্যে দরদ দিয়ে শুনছে, যা বুঝছে তাই যথেষ্ট। কেউই প্রমত্ত বা বিরক্ত, এমন অবস্থার কথা হচ্ছে না। দেখো, কেমন জমে।

বললেন, তাঁর বইয়ে অনেক বাক্যই নানা ভাষার টুক্‌রোয় বা আবহাওয়ায় রচিত। কখনো দুয়ে তিনে মিলে স্বতন্ত্র এক হয়েছে, কখনো বা কথার ভগ্নাংশ ধ্বনিতে বিধৃত। কখনো সমস্ত পদটাই পাঁচ-দশটা ভাষা বা জাতীয় ভঙ্গির সৃষ্টি। ভাষা বা বক্তব্যের মূলে যারা যাবে তারা মনের কথা, শরীরের কথা সব মিলিয়ে মানুষের কথা শুনবে। লেখাও সেইজন্যে।

শুনে মনে হচ্ছিল যাঁরা নিজেদের রচনায় আইডিয়া বা বিষয় কিছু আছে স্বীকার করতে নারাজ তাঁরাই বক্তব্য সম্বন্ধে আরো সচেতন। ভাষার নীহারিকা জয়েস্ -এর সচেষ্ট মননজাত সৃষ্টি। ভাবও অনেকাংশে থিয়োরির অনুশাসনে গাঁথা। মগ্ন মনের ঢেউ মেশাবার কৌশলে আত্মবিস্মৃতির দীর্ঘ অভ্যাস দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য সব মিলে যে অদ্ভুত প্রবর্তনা সেইটেকেই প্রধান ব'লে মানব।

টুক্‌রো পুঁথিটা জাহাজে পড়েছিলাম। স্বীকার করব ব্যাপার সহজ হয়নি। কেননা প্রায় কিছু ধরতে পারিনি। বোঝবার চেষ্টা করলে মাথা ফাটবার অবস্থা, না করলে কালো অক্ষরের স্রোতে ভাসতে হয়। কখনো গূঢ় বর্ণোজ্জ্বলতার আভাস পাই। হাওয়ায় হারানো কোন্ চেনা কথা কানের পাশ দিয়ে হারিয়ে যায়। মনে খুব একটা স্পন্দন অনুভব করি। তার পর বিশ্রী একটা কথা এসে ধাক্কা দেয়। যেন অশুচিতার ভয় দেখানো। শেষ পর্যন্ত কথার স্তূপে, কথার অঙ্কশাস্ত্রে, ভাবের ল্যাবরেটরির গন্ধে বিরক্ত হয়ে বই ফেলে দিয়েছিলাম। সরকারী পোশাক-আঁটা জাহাজী ইংরেজের কথাও তখন শুনতে ভালো লাগছিল। মেডিটেরেনিয়নের নীল অর্থহীন শব্দ ঢের বেশি বুঝি। অথচ বইটার সুদূর সান্নিধ্য মনে অনুভব করলাম; পড়াটার দরকার ছিল। *Finnegans Wake*-গ্রন্থে ঐ অংশ আবার পড়েছি। ঠিক একই অভিজ্ঞতা।

জয়েস্‌কে কিছু লিখতে পারলাম না। কেননা অমনতর গ্রথিত একনিষ্ঠ রচয়িতাকে বাহিরের কথা শোনানো বৃথা।

জয়েস্‌ -এর চেহারা মনে পড়ে। শুষ্ক সকৌতুক ভাব ঠোঁটের কোনায়, মুখে নিগূঢ় ঔদাসীন্য— খানিকটা বোধহয় চোখের জন্যে— অথচ হৃদ্যতার অভাব নেই। সৌজন্য অশেষ।

এইখানে মজার কথাটা বলি।

চলে আসবার ঠিক আগে জয়েস্‌ বললেন, তোমাকে একটা পুরোনো বই দেব, তোমার নামের অর্থ একটু স্পষ্ট বুঝে নিই। পাশের ঘরে চলে গেলেন।

যে-বইখানি এনে দিলেন তাতে লেখা To Mr. Ambrose Wheelturner। বললেন, য়ুরোপে তোমার এই নাম ঠিক হবে। শুধু তর্জমা-নাম নয়, এটা সত্যি নাম।

দুই

জয়েস্‌ -এর লেখায় হাসির দিকটা আমাকে মুগ্ধ করে। *Ulysses*-এ অত্যন্ত উপভোগ্য প্রহসন আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে মিশেছে উদার চিত্তরস ; রসিকতা বললে কম বলা হয়। ভাষার সন্ধানেও কৌতুকের দীপ্তি দেখতে পাই, শুধু বৈজ্ঞানিকতা নয়। তা না হলে এ-সব আশ্চর্য বাক্য কে লিখতে পারত ?

Satisfiction (গল্পপড়ার তৃপ্তি, অলীক কিন্তু মন্দ কী।)
Bluey-silver ; Rainbowl ; silvamoonlake (দেখতে, অনুভব করতে।)
Clapplause (চরম উৎসাহবাচকতায়)
Shampain (পরের সকালের অবস্থা)
Hierarchitectitoploftical (Skyscraper -এর অভ্রভেদী ঠাট্টা)

মাত্র এক মুঠো। এমন শব্দবাক্যের ফুলঝুরি লেখায় সর্বত্র জ্বলছে, প্রতিভার অনায়াস অজস্রতায়। বুঝতে পারি ইনি না হলে "Orientourist" হতাম না, "portmanteau words" হাতের কাছে থাকত না। "Eglintoneyes looked up skybrightly" না পড়লে ভাষার ঘনিষ্ঠ দীপ্তি চোখে কমত। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাসিটুকুও ধরা চাই। মগ্নমন হতে বর্ণপ্রলাপ বিস্তার করায় অসম্ভবের দরজা খুলে যায়। এই অহেতুক উৎসাহ ক্রতস্পর্শী।

"Bronze by gold heard the hoofirons, steelyringing...
Blew. Blue bloom is on the
Gold pinnacled hair...
Lost. Throstle fluted. All is lost now."

খ্যাপামি নিশ্চয়, কিন্তু ঝোড়ো মেঘে সোনার পাড় বসানো। মনে বিদ্যুতের চমক লাগে।

"She was just a young thin pale soft shy slim slip of a thing then, sauntering, by silvamoonlake, and he was a heavy trudging lurching lieabroad of a Curraghman, making his hay for whose sun to shine on."

অত্যুক্তির মজা এখানে নিগূঢ় শিল্পমাধুর্যে পরিস্থত। এরকম ইন্দ্রজাল বুনোনির পথ বন্ধ করলে দিগন্ত শীর্ণ হয়ে যাবে। সাহিত্যে সম্ভবপরতা ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য কার?

Finnegans Wake -এর অনেক পৃষ্ঠা এমনিতর বিভান্বিত। *Anna Livia Plurabelle* -এর শেষ অংশ সায়ংসৌন্দর্যের গভীরতায় ডুবে গেছে— ভাষার মধ্যে কেমন ক'রে প্রবেশ করেছে দিনের ধূসর শেষতা।

অরণ্যে লুকোনো হ্রদে চন্দ্রালোক দেখবার ভাগ্য সহজে ঘটে না। স্বীকার করেছি জয়েস্ -এর লেখায় বাক্যের জঙ্গল, পথ-হারানো ক্লান্তিকর আবর্তন; হোঁচট-খাওয়ার অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। অতটা ভেদ করে হাঁটতেই হবে এমন পণ করব না। কিন্তু দৈবে যদি অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যের তটে পৌঁছই তা মানব না কেন? সার্থকস্মরণ কতদিনের ঘটনার জন্যে জয়েস্ -এর কাছে আজ ধন্যতা জানাতে চাই।

ভাষার ভাণ্ডারে আবিষ্কার চলেছে— জয়েস্ যা দিয়েছেন তার বিচার এই পরিসরে চলবে না, আমার যোগ্যতাও নেই। তবু সেই দিকটাই খানিক বলতে চেয়েছি।

ভাষার সঙ্গে দেখি মনোধারা প্রকাশের এবং তার অতলে প্রবেশের টেকনিক। সাধারণ একটি মানুষের জীবন, ষোল পনেরো ঘণ্টা ধরে দেখাতে যে মননশিল্পীকে হাজার পাতা লিখতে হয় তিনি গভীর সন্ধানী। তাঁর কাছে মনোরাজ্যের চেতন, অবচেতন, অর্ধচেতন স্রোত, গতিবেগ এবং ঘূর্ণি কত পরমাশ্চর্য রহস্যময় তা বলা বাহুল্য। জয়েস্ কলম ধরেছিলেন ব'লে নিহিত-লোকের পরিচয় নূতন ভাষায় উত্তীর্ণ হ'ল— পরিচয় সম্পূর্ণ নয়, আকস্মিক এবং

অসম ; ভাষা প্রহেলিকাগ্রস্ত এ জেনেও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। সমগ্র পশ্চিমী সভ্যতা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। চৈতন্য জলের ডুবুরি, ভাষার পসারী, অনুসন্ধানী, হাস্যরসিক অতিশয়োক্তিপ্রিয় এই অনম্য আইরিশ লেখককে।

এতখানি সাহসিক অনন্যসাধনা, একদেশদর্শিতার বলে অর্জিত নবভাষ্য সাহিত্যে দুর্লভ। সাহিত্য অভিমানী, তাকে চলতে হয়। যাঁর রচনায় এগিয়ে চলার হাওয়া বয় তিনি আমাদের মুক্তির ব্রতী, তিনি নমস্য। জয়েস্ -এর পূর্বদিকের রচনা *Dubliners* এবং *The Portrait of the Artist as a Young Man* সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। শেষদিকের রচনার খণ্ডাংশে অতুল্য সম্পদ আছে যার আলোচনা চলেছে। সেই হিসাবে স্রষ্টার উচ্চলোকে তিনি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে তিনি পাথর ভেঙেছেন, গন্তব্যের সন্ধান দেননি প্রবর্তনা দিয়েছেন, সেখানেও তাঁর মর্যাদা সাহিত্যলোকেই। ঐতিহাসিক মূল্যেও রচনা মহার্ঘ হতে পারে ; আন্তর মূল্যের সংযোগে এমন রচনা সাহিত্যে স্মৃতিফলকরূপে দীপ্যমান হয়েছে। জয়েস -এর বহু বিচিত্র সৃষ্টিপ্রসঙ্গে এই কথাই মনে হয়।

তিনি উজ্জ্বল বাচস্পতি। "গল্পসল্পে"র বাচস্পতি প্রতিভায় রূপপরিগ্রহ করলে এই মূর্তি দেখা যেত। যে-মূর্তি চোখে জেগে ওঠে কাল্পনিক লেখক সম্বন্ধে তাঁর এই বর্ণনায় :—

"The phrase and the day and the scene harmonized as in a chord. Words. Was it their colours? He allowed them to glow and fade, here after here : sunrise gold, the russet and green of apple orchards, azure of waves, the grey fringed fleece of clouds. No, it was not their colours : it was the poise and balance of the period itself. Did he then love the rhythmic rise and fall of words better than their association of legend and colour? Or was that being weak of sight as he was shy of mind, he drew less pleasure from the reflection of the glowing sensible world through the prism of a language many coloured and richly storied than from the contemplation of an inner world of individual emotions mirrored perfectly in a lucid supple periodic prose ?"

—*Dubliners*

কম বয়সের এই লেখায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সৃষ্টিমানসের আলো পড়েছে।

সাহিত্যগুরু প্রমথ চৌধুরী

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে বোধ হয় উৎকর্ষের দুই মূল পরিচয়ে পৃথক ক'রে দেখা যায়। একটি হচ্ছে গীতঝংকৃত ভাবের বাণীপ্রবাহিণী, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানা ছন্দে ব'য়ে চলেছে; আর-একটিতে মননালোকিত ভাষার শুভ্র স্থাপত্যই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। রসধারার আশ্চর্যতা এক-জাতীয় সাহিত্যে রূপের সংহত ঐশ্বর্যে স্থির প্রকাশমান, অন্য ক্ষেত্রে তা অজস্র ছন্দোময় লীলালাবণ্যে গতিশীল। সংহত শিল্পের বৈদগ্ধ্য এবং জ্ঞানবিধৃত কল্পনা মহাকবি দান্তের রচনায় বিশেষ লক্ষণীয়; অপর পক্ষে ইংলণ্ডের নাট্যসম্রাটের গীতিকাব্যে ও নাটকে দেখি, অজস্র সৃষ্টির সমবায়, সংসারের বিপুল তরঙ্গায়িত ধ্যানে ভাবনায় মিশ্রিত হয়ে অলোক-দিগন্তের সঙ্গে তাঁর রচনা মিশে আছে। রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বগুণান্বিত শিল্পীর রচনায় অবশ্য দুই-জাতীয় সাহিত্যেরই সন্ধান মিলবে। কারুদক্ষতায় তিনি জ্ঞানী অথচ তন্ময়ী, প্রকাশের এমন কোনো বিশিষ্ট সৌকর্য নেই যা তাঁর কবিতায় বা গদ্যে অবর্তমান। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মুখ্যত প্রবাহধর্মী এবং চলোর্মি-চঞ্চল। ভাবনার হিমাদ্রি তাঁর রচনার আদিতে, অন্য প্রান্ত ছুঁয়ে আছে অন্তহীন প্রাণসমুদ্রকে, কিন্তু সামনে চোখে পড়ে আনন্দোজ্জ্বল স্পন্দিত তাঁর উৎসারিত বাক্যের নদী-নির্ঝরিণী। প্রমথ চৌধুরী একান্তভাবেই স্থাপত্যশিল্পী। কবিতায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সনেটে; গল্পে প্রকাশ পেয়েছে নিখুঁত নির্দিষ্ট চিত্র এবং প্রতিকৃতি; প্রবন্ধে সমালোচনায় ভাবের প্রাঞ্জল অনুশীলনই ছিল তাঁর স্বধর্ম। বস্তুত দান্তে-জাতীয় স্থির বৈদ্যুতিক আলোর অনন্যসাধক ও শিল্পী বাংলা দেশে বোধহয় আর কেউই দেখা দেননি। প্রমথবাবুই বাংলার সর্বপ্রথম এবং শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞাবান শিল্পী যাঁর রচনা আত্মচেতন, হৃদয়াবেগ যাঁর ঘনসিবদ্ধ ভাষায় নির্মাণ-শিল্পের করায়ত্ত, যাঁর প্রগাঢ় মননশীলতা স্বচ্ছ সুদৃঢ় বাক্যের সমন্বয়ে বিভূষিত। অনেকে এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত বা টেকচাঁ[illegible] নাম করবেন, কিন্তু ভাষার স্থাপত্যশিল্প এবং বহুব্যাপক মনোধর্মের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রমথবাবুই বাংলা সাহিত্যে অগ্রণী, তিনিই আমাদের শিল্পজগতে এই নূতন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং একনিষ্ঠ প্রবর্তক।

প্রমথবাবু সেইজন্য বিশেষভাবে আধুনিক লেখকদের শিক্ষাগুরু। বাংলা সাহিত্যের ভাষা এবং ভাবপ্রকাশের রীতি তাঁর রচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে,

তাঁর সূক্ষ্ম বিচারের মানদণ্ডকে আমরা অজ্ঞাতসারে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। প্রমথবাবু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য অথচ ভাষার টেকনিকে এবং প্রসাধন সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ঋণী— এ-কথা বহু পত্রে কবি জানিয়ে গেছেন। সবুজপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথের ভাষা বিশেষ উজ্জ্বল পরিণতি লাভ করেছিল। শুধু তা-ই নয়, গল্প ও প্রবন্ধের এমনকি কবিতার রূপ-সংগঠন সম্বন্ধে তিনি নূতন ক'রে যত্নবান হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে, সবুজপত্রে পাঠাবার আগে তাঁর নূতন রচনা বিশেষ সাবধানে সংশোধন না করলে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন না; ইতিপূর্বে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কখনো এত বর্জন পরিমার্জন হয়নি। "চোখের বালি" ও "ঘরে-বাইরে" এই দুই উপন্যাসের ভাষার তুলনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এজন্যে প্রমথ দায়ী।" এ-কথা সত্য যে, পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষা ব্যবহারে তুলনাহীন শিল্প দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সে যেন ক্বচিৎ ঘটনাক্রমে; সজ্ঞানভাবে এবং স্থায়ীরূপে সবুজপত্রের যুগেই তিনি চলতি ভাষাকে সকল প্রকার গদ্য-রচনার ভাষা ব'লে গ্রহণ করলেন। প্রমথবাবুর লঘু বর্ণোজ্জ্বল স্মিত ভাষায় রচিত প্রবন্ধগুলি বাঙালীর মনোরাজ্যে নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল— সম্পূর্ণভাবে তা আধুনিক, একেবারে আমাদেরই যুগের উপযোগী। তা বাংলাদেশীয়, অথচ পশ্চিম দেশের শিল্পচেতনা তাতে মিশেছে। প্রমথবাবুর প্রতিভা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রতিষ্ঠিত, অথচ তিনি প্রাচীন গ্রীক এবং আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের নিগূঢ় রসে নিমজ্জিত ছিলেন। এই পরমাশ্চর্য সংমিশ্রণের ফল দেখতে পাই তাঁর গল্প ও প্রবন্ধে। "চার-ইয়ারি কথা" খাঁটি বাঙালী মনোমণ্ডলে রচিত, কিন্তু য়ুরোপের আবহাওয়া শুধু গল্পের পটভূমিকায় নয়, ঘটনায় নয়, মানসলোকে অবাধে সঞ্চারিত হয়েছে। 'বড়োবাবুর বড়ো দিন'-এর মতো ছোটোগল্প অন্য যুগে বা অন্য কারো দ্বারা লেখা হতে পারত না; পূর্ব ও পশ্চিমের হাস্যরঞ্জিত সূক্ষ্ম বিমিশ্র দৃষ্টি এমন করে মেলানোর ক্ষমতা একমাত্র ছিল তাঁর। বীরবল একাধারে মোঘল আমলের বিদগ্ধবান হিন্দু এবং ভল্‌টেয়ার মেরিমে মোপাসাঁর ভক্ত নূতন আমলের লেখক। এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের নবমানসযুগের প্রতীক হিসাবে প্রমথবাবুর নাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে-সঙ্গেই করতে হয়।

প্রমথবাবুর "নানা কথা", "বীরবলের হালখাতা" প্রবন্ধ-সাহিত্যে যে-পথ খুলে দিয়েছে সেই পথেই আমরা চলেছি, বিশেষ করে উচ্চতর সমালোচনার বিভাগে এবং সংবাদপত্রের শ্রেষ্ঠ সাময়িক তথ্য পরিবেশনের মহলে। তাঁর প্রবন্ধের রচনা-প্রণালীর কথাই বিশেষভাবে বলছি— তার ভিতরে যে জ্ঞানের

ঐশ্বর্য, মনের প্রসাদগুণ এবং মৌলিক অনুপ্রেরণা আছে, তা এখানে বিচার্য নয়, নূতন বাংলাদেশের ছোটোগল্প সুভাষিত বাক্য ও রূপের উৎকর্ষে এখনো প্রমথবাবুর শ্রেষ্ঠ গল্পের সমকক্ষ হতে পারেনি, যদিও উৎকৃষ্ট ছোটোগল্পের অভাব নেই বাংলা সাহিত্যে। 'বীণাবাই' অথবা 'আহুতি' একক হয়েই থাকবে ; কারণ শিল্পের রাজ্যে একই দৈব ঘটনা দু-বার ঘটে না ; তৎসত্ত্বেও এ-কথা বলতেই হবে যে, মনের দীপ্তি, প্রসার ও চিত্তের অমন সর্বানুভূতিসম্পন্ন মানবিকতা আমাদের কারো নেই। তাঁর মতো ভাষার তীক্ষ্ণ ধার, তাঁর স্নিগ্ধ অথচ মর্মস্পর্শী দৃষ্টি, তাঁর মতো যথার্থ মহাচরিত্রবান শিল্পীকে হারিয়ে আমরা বাংলায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ই যেন খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী বাঙালীর সত্তায় চিরদিনই রইলেন, তাঁকে আমরা বারবার আবিষ্কার করব। বাংলা সাহিত্যের মানসলোকে তিনি আমাদের এই যুগের বন্ধু এবং প্রতিনিধি-রূপে প্রণতি গ্রহণ করুন।

প্রমথ চৌধুরীর গল্প

আশ্চর্য হয়ে বাংলার মূর্তি দেখি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ছোটোগল্পে। বাংলাদেশ দুর্গতির জালে জড়িয়ে নির্জীব, বাঙালীর বুদ্ধি সূক্ষ্ম কিন্তু শরীর-মন তেজালো নয়, আধুনিক এবং প্রাচীনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বাংলার গতি দ্বিধাগ্রস্ত, শহুরে বাংলা দশের করায়ত্ত এবং গ্রামের বাংলা গৃহবিচ্ছেদে অনশনে রোগে মুমূর্ষু— এই-সব কথা আমরা এতই মেনে নিয়েছি যে, মরণদশার মানস আমাদের গল্পে কাব্যে আলোচনায় ছেয়ে গেল। প্রাণের ধারাটা কোথায় বইছে তার খোঁজও প্রায় নেই সাহিত্যে। প্রাগ্রসর রচনা ক্ষোভে, বিদ্রোহে, সিমেন্ট-বন্দী ভদ্রলোকিত্বের নানা দুঃখে জটিল ; পুরোনো-ঘেঁষা সাহিত্য ছন্দে শিথিল, কল্পনায় তৃতীয় সংস্করণ, শ্যাওলা-ভরা দিঘির ধ্যানময় ভাষায় অচল। সমগ্র ফ্রান্সের সমান বাংলাদেশ তার শক্ত চাষী, বিচিত্র বর্ণসংকর সভ্যতা, গোলদিঘির উগ্রবুদ্ধি ছেলেমেয়ে, পূর্ববঙ্গের কর্মঠ জাগরুকের দল নিয়ে লুপ্তির ছায়ায় বিলীয়মান, এমন তত্ত্ব মানতে হলে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ অনস্তিত্বকে মানতে হয়।

দুর্দশার সব তথ্যই প্রমথবাবু জানেন ; বাঙালী-মনের ক্ষুব্ধ বিপ্লবান্বিত কল্পনাপ্রবণতা এবং বাঙালী-জীবনের নানা-ডিগ্রি অনশন-অপমানের দৈনিক ইতিবৃত্ত জেনেও তিনি বাংলার প্রাণকে অস্বীকার করেননি। তাঁর গল্পে খাঁটি বাংলা মরেনি, নূতন শক্তি লড়ছে পুরোনো ডাঙায়, পুরোনো কলেজার আভিজাত্য বজায় রেখে। সেখানে আজও ঈশ্বর পাটনির দু-হাত লাঠিখেলা, লাঠি-লকড়ি-সড়কি ধরার জোর দ্রষ্টব্য। "অণুকথা সপ্তক" বইখানিতে বাঙালীর মর্যাদা আছে এবং রয়েছে শক্ত হাড়ের পরিচয়, যা দেখতে পাই তাঁর অন্য ছোটো-গল্পে, "আহুতি"-জাতীয় সংগ্রহে। মাছের ঝোল, মিহি গান, বেতারে লড়াইয়ের বাজি নিয়ে মত্ত বাঙালীবাবুই সবখানি বাংলা নয়। ক'জন সাহিত্যিক দেখিয়েছেন সাবলীল, সংগ্রামী, সাত-আগুনে পোড়া মেজাজী বাংলার মনকে ? পল্লীর ঝিল্লিগান, করুণ খোড়ো ঘরে অভিমানিনী, কলাগাছের বেড়া, পচা-পুকুর, সাংঘাতিক গ্রাম্য চক্রান্ত এবং দিবান্তে শেয়ালের কোরাস নিয়ে চিত্রিত হয়েছে বিশেষ একটি দৃষ্টির সংস্কার।

বাংলার শক্ত শাক্ত পরিচয় খোঁজো "অণুকথা"র 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটিতে। তৃতীয়

গল্পে চিনিবাস 'দেবতাও নয়, পশুও নয়— শুধু মানুষ।' অর্থাৎ দোষে-গুণে সে জ্যান্ত বাঙালী। "পথের পাঁচালি" গ্রন্থে আমরা পেয়েছি গ্রামপ্রান্তের নিরালা মর্মান্তিক কাহিনী, সুন্দর কিন্তু সান্দ্র ; প্রমথবাবুর গল্পে দুপুরের রোদটাও বাদ পড়েনি। মানিকবাবুর "পদ্মানদীর মাঝি" জোরালো ছন্দে বাঁধা, মনকে ঘা দেয়, যদিও "পথের পাঁচালি"র পরিণত সার্থকতা সেখানে খোঁজা অন্যায়। তারাশঙ্করবাবু বীরভূমের একটা আশ্চর্য দিক দেখিয়েছেন। তাঁর মানুষজন পরিচিত কারুণিক প্যাটার্নের ছায়া নয়। কিন্তু নূতন নিছক বাংলা গল্প শুরু হতেই প্রমথবাবুর কলমে বেরিয়েছে। যাকে নিতান্ত আধুনিক বলা হয়, সেই পরিচ্ছন্ন মননসৃষ্টিশীল শিল্প "সবুজপত্রে" এবং তারও পূর্বে তিনি ব্যবহার করেছেন। তাতে মিলেছে ভারতীয় উৎকর্ষধারার আভিজাত্য, যা কোনো বিশেষ কালের নয়— হয়তো সাম্প্রতিক সাহিত্যে তার পরিচয় স্বল্পতর। প্রমথবাবুর লেখার তুলনা নেই, কেননা ভাষায় এবং ভাবে তিনি সহজাত শক্তির অনুসরণ করছেন যা কেবলমাত্র নূতন নয়, অভিনব। স্বকীয়তা লাভ করেন শিল্পী দীর্ঘ সাধনার ফলে ; প্রমথবাবুর রচনা কিন্তু বিশিষ্ট হয়েই দেখা দিয়েছে এবং মনে হয় যেন তার মধ্যে পরিণতির ইতিহাস নেই, পরিণতির বৈচিত্র্য আছে।

বাংলা-জীবনের মজ্জায় প্রবেশ করে প্রমথবাবুর ছোটোগল্প এমন সারালো ধারালো এবং পুরোপুরি বাস্তব। মিছু সর্দার, মনিরুদ্দি, নায়েববাবু, ঠাকুরদাস কামারকে দেখুন। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে এই বাংলার সমাজ। প্রমথবাবু 'ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষে'র সমুখে এদের দাঁড় করিয়েছেন। ভোগ শেষ হয়েছে ভালো, ভরসা জাগে চণ্ডীমণ্ডপে জমায়েত এরা ভোগের চেয়ে আহারকে মানবে। ভাঙা দালান ধসে যাক, নূতন চাষীর বাড়ি উঠুক। এই চাষীরা হাতের এবং মনের জোর রাখে, "অণুকথার" পাঠক তা ভুলতে পারবেন না।

"পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ির দাসীচাকরানীরা কখনো-কখনো রাত-দুপুরে পেতেন— ধোঁয়ার মতো যার ধড়— আর কুয়াশার মতো যার জটা। আর দক্ষিণে পুজোর আঙিনা—যে-আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল ব'লে একটি কবন্ধ জন্মেছিল। একে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।"

এই ভূতুড়ে, বলিতে-পাওয়া বাংলাকে প্রমথবাবু লুকোননি, কিন্তু 'ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষে'র মতো এর পরমায়ু গতায়ু। অদৃষ্টক্রমে যে-বাঙালী লেঠেলি জাত-ব্যাবসা ছেড়ে লগি ঠেলে মজুরি ক'রে দু-পয়সা কামাচ্ছে, তার

মধ্যে আগুন নেবেনি— এইটেই জানবার। ঈশ্বর পাটনি যখন উঠে দাঁড়ালে, তখন দেখি সে আলাদা মানুষ। "তার চোখে আগুন জ্বলছে আর শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মতো।" বঙ্গ-সাহিত্যিক যখন গলি-বিহারী উগ্র অবসন্ন সমাজের বিরুদ্ধে জাগেন, তাঁদের জানা উচিত বাংলার প্রাণ তাঁদেরই সহায়। গাঁয়ের লেঠেলরা সহজে মরবে না এবং তারা সংখ্যায় যথেষ্ট। তাদের ডাক পড়বে ভাঙবার নয়, গড়বার কাজে। সতেজ, নির্ভীক, গ্রাম্য হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর কাছে সাহিত্যের খোরাক আছে; শুধু সমাজের ভবিষ্যৎ নয়, আর্টের নূতন শক্তি সেইখানে বাঁধা।

'যখ' গল্পটি ধন নিয়ে আধুনিক রূপকথা। ছোটো ছেলের মন ভুলবে, অথচ বিজ্ঞানরসিক দেখবেন বিদ্রূপের ইস্পাতি ঝলক; গল্পের ছলে ধরা দিয়েছে ধনের প্রতীক নিয়ে মানুষের জটিলতা। ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স পাতালে সোনা রাখে যান্ত্রিক কৌশলে, যখ তার সন্ধান পায়নি। (নাৎসীরা পেয়েছে কি না, সেটা আরো আধুনিক প্রসঙ্গ।) এদিকে সোনার ঘড়াকে আগলে বসে আছে যখ-রূপী ধনহীন বাঙালীর কল্পনা। ঐশ্বর্যের লোভ এবং ভয় জড়িয়ে গল্প বানিয়েছিলেন আমাদের যখ-স্রষ্টারা, নূতন পটে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল "অণুকথা"র আখ্যানে।

'যখ' গল্পে পাড়াগাঁয়ের জীর্ণ পল্লীশ্রী শ্যাওলা এবং ম্যালেরিয়া নিয়ে আবির্ভূতা। রোগ, বিছানা, কবিরাজি লঙ্ঘন এবং পাঁচন নরম বাঙালীত্বের প্রসঙ্গে সমাশ্রিত। রমা ঠাকুর আছেন একা খোড়ো ঘরে। যখ দেখেছিলেন ইনি। "তিনি [রমা ঠাকুর] ইংরাজী পড়েননি, সুতরাং যা দেখতেন, যা শুনতেন তাতেই বিশ্বাস করতেন। আমার কথা আলাদা। আমি ইংরাজী পড়েছি, সুতরাং যা দেখি শুনি তাতে বিশ্বাস করি না।" এইখানে গল্পের ভিত। ঘুম না সত্য? যা ঘটল তা আর যা-ই হোক— খাঁটি গল্প।

মধ্যে থেকে নন্দীগ্রামে যাওয়া হ'ল বিল পেরিয়ে, মাঠ ভেঙে। কোজাগর পূর্ণিমা। খঞ্জনা নদী। "খঞ্জনা কখনো দেখেছেন? চমৎকার নদী। রশি দু-তিনের চাইতে বেশী চওড়া নয়— কিন্তু বারো মাসে তাতে জল থাকে, আর সে-জল বারো মাস টল্-টল্ করছে, তক্-তক্ করছে।" এই জলের ধার দিয়ে যাত্রা। বাঘ? "ভয় অবশ্য বাঘের আছে। কিন্তু তারাও আমাদের মতো গরীব ব্রাহ্মণকে ছোঁয় না।...বাঘরাও মানুষ চেনে, অর্থাৎ কে খাদ্য আর কে অখাদ্য।" তাছাড়া সিদ্ধির মাহাত্ম্য আছে।

"কোজাগর পূর্ণিমার রাত···আলোকলতায় ছাওয়া কুলের গাছগুলো··· যেন সোনার তারে জড়ানো।" এইবার যক্ষের দৃষ্টি। গল্পটা পড়ুন। গল্পের শেষে পাবেন এক-বাটি পাঁচন। বলছিলাম বাঙালী-জীবনের আর-একদিক। এই গল্পে দুই-ই আছে। কবিত্ব এবং কবিরাজিত্ব।

সঙ্গে-সঙ্গে পড়া চাই 'ঝোট্টন ও লোট্টন'। এই গল্পের উপাদান শুক্‌নো ডাঙা, প্রাচীন কাল, দুর্দশায় মর্মাহত কিন্তু কঠিন মনুষ্যত্ব। "গিয়ে দেখি আস্তাবলে গাড়িখানার মেঝেয় দুটি লোক বসে আছে। দু-জনেই সমান অস্থিচর্মসার, আর দু-জনেই মুমূর্ষু। রোগেই হোক, উপবাসেই হোক, তারা শুকিয়ে-মুকিয়ে আমচুর হয়ে গেছে।" এরা হিন্দুস্থানী। অনটনের স্রোতে যেখানে এসে ঠেকেছে, সেটা বাংলাদেশের যাকে বলে মফস্বলের একটি শহর। ধানের খেত-অলা জমিকে হাত করে ধনিকেরা তুলেছিলেন হাতাওয়ালা বাড়ি— সেকালের দিনে। পড়ে আছে বাড়ির খোলস, লুপ্ত বিলাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে ভেঙে-পড়া আস্তাবলের বহর। "···বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি-গোছ একটা মস্ত আস্তাবল ছিল··· সে আস্তাবলে ছিল মস্ত একটা গাড়ি-খানা, তার দু-পাশে দুটি ঘোড়ার থান, আর তার ওপাশে সইস-কোচমানদের সপরিবারে থাকবার ঘর।" গল্পের এই কলিযুগে ঘোড়া-মানুষের বদলে আস্তাবলে ছুঁচো-টিকটিকির সফর। ছিল তাজা ধানের খেতি, উঠল উদ্ধত কোঠাবাড়ি, দু-দিনেই বেরোলো তারও হাড়-বের-করা দুর্দশা; জমির এবং জমিদারের এই সংক্ষেপ ইতিহাস কারো অবিদিত ঠেকবে না। সোনার বাংলার এই পরিবেশে দুটি মুমূর্ষু হিন্দুস্থানীর আবির্ভাব— বোধ হয় নোক্‌রির চেষ্টায়। জমে উঠল দুই "দেশকা ভাই"কে জড়িয়ে তীব্র নাট্য। বুকে ধক্‌ করে ওঠে। অভ্রান্ত তুলির আঁচড়ে ফুটেছে রৌদ্ররস ছবি।

'ফার্স্টক্লাস ভূত' আধুনিক লৌহরথে ভ্রাম্যমাণ। ইঙ্গ-বঙ্গ যুগের বাঙালী তাকে চিনবেন। মজার মানুষ সারদা-দাদা— গল্প বলছেন তিনি। গল্পের সামনে তাঁকে দেখতে পাওয়া, তাঁর গলার আওয়াজ, ভাবভঙ্গি ও অদ্ভুত মেজাজ গল্পেরই সমান উপভোগ্য। প্রমথবাবুর অনেক গল্পে দেখি যিনি বলবেন তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র গল্পের সূচনা, সেইখানে আবহাওয়ার সৃষ্টি এবং অনেক সময়ে ঘটনারও গ্রন্থি বাঁধা। ঘোষালকে পুনর্বার দেখতে পাওয়া বা তার মুখের একটি কথা শোনা-ই গল্পের খোরাক। সারদা-দাদাটি কে? "কি হিসেবে আমার দাদা হতেন, তা আমি জানিনে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি নন, কুটুম্বও নন, গ্রাম-সম্বন্ধে ভাইও নন। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়।···তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন।

আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মতো দেদার জমিদারবাবু ছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা-না-একটা সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক যে কি, তা-ও কেউ জানত না ; কিন্তু এর-ওর বাড়িতে অতিথি হয়েই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।··· তিনি একে ব্রাহ্মণ, তার উপর কথায়বার্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। ···দাদা হোন, মামা হোন··· সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারো কাছে চাইতেন না।"

সারদা-দাদার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ। "কলকাতায় আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজনও ছিল না, কোনো বন্ধুবান্ধবও ছিল না·· সেকেলে কলকাতাই ছেলেদের কথাবার্তার রস কলকাতার দুধের মতোই ছিল নেহাত জলো।" (শুনতে পাই একালে জলের চেয়ে ভেজালই বেশি।)

এইবারে গল্প। "সারদা-দাদা শুধু সেই-সব ভূতের গল্প বলতেন, যাঁদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম— আপনি তো শুধু পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্প করেন, আপনি কি কখনো সাহেব-ভূত দেখেননি ?

"সারদা-দা উত্তর করলেন— দেখব কোত্থেকে ?—সাহেবরা তো আর এদেশে মরে না। না মরলে তারা ভূত হবে কি করে ?··· তবে দু-চার জন সাহেব যে মরে না, এমন কথা বলছিনে। কিন্তু যারা ম'রে ভূত হয়, তাদের দেখা আমরা পাইনে।

"কেন ? এদেশে তারা গাছেও থাকে না, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেনের ফার্স্ট'ক্লাস গাড়িতে চ'ড়ে বেড়ায়। আর ফিরিঙ্গি ভূতরা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়।···"

ট্রেনের ফার্স্ট'ক্লাস যাত্রী মানুষ, না ভূত ? "অণুকথা"র ৩৩ পৃষ্ঠায় গাড়ি চড়ুন।

ছোটোগল্প ছোটো হওয়া চাই এবং গল্প হওয়া চাই— শ্রেষ্ঠ এই সংজ্ঞা প্রমথবাবু দিয়েছেন। আর স্বরচিত গল্পে তার চরম দাবি মিটিয়েছেন। 'স্বল্পগল্প' পড়লে ঠাহর হয় গুটিকয়েক পৃষ্ঠায় কীভাবে আখ্যানের দানা বাঁধতে পারে— যদি কলমের জাদু থাকে। কুমার-বাহাদুর "যে-ঘটনার উল্লেখ করলেন, আর যার নায়ক স্বয়ং তিনি, সে-ঘটনা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তা অবলম্বন ক'রে একটি ছোটোগল্পও গড়ে তোলা যায় না।" কিন্তু তিনি মনের কথাটি এমন ক'রে বলেছিলেন যে, "আমার মনে সেটি গেঁথে গিয়েছে।"

ছোটোগল্পের রহস্যই এই মনে গেঁথে যাওয়ায়। এতটুকু ঘটনার পর্দা তুলে জীবনের দৃষ্টি পাই সেরা ছোটোগল্পে। তার মধ্যে জটিল অভিজ্ঞতার ব্যবধান নেই; অব্যবহিত রূপ আছে— কথাবার্তার হঠাৎ ঝলকে, আকস্মিক উল্লেখে, আনাগোনার সংসারে রচিত হচ্ছে "অণুকথা"; পুরোপুরি গল্পে প্রবেশ ক'রে অজানা মানুষের সঙ্গে কখন যুক্ত হয়েছি আমরা ধরতে পারি না। প্লট বেঁধে বড়ো গল্প জীবনে সচরাচর আসে না, অনেকগুলি ছোটোগল্পের মধ্য দিয়ে আমরা বাঁচতে থাকি। ছোটোগল্পের সম্পূর্ণতাগুলি জড়িয়ে বড়ো সমগ্রতা গাঁথা হয় সংসারে— সেইখানে আমরা উপন্যাসের অঙ্গ— কিন্তু অতীতের ভাণ্ডার খুললেই জীবনের দীপ্ত খণ্ডগুলি বেরিয়ে পড়ে। এমনিতর ভাণ্ডারের সন্ধান আছে প্রমথবাবুর গল্পে; তার একটা কারণ, বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা আধার পেয়েছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সুদৃঢ় ভাষায় এবং সমস্তকে আলোকিত করেছে একটি প্রসন্নতা যাকে অলংকারশাস্ত্রে প্রসাদগুণ বলা হয়।

'স্বল্প-গল্প' এবং 'প্রগতি রহস্য' শ্লেষাত্মক, হালকা কথার ছুরি গিয়ে পৌঁছয় সমাজের মর্মে। অথচ কোথাও ব্যক্তিগত বা দলগত ঝাঁজ নেই। প্রমথবাবুর এপিগ্রামের পিছনে থাকে করুণ উজ্জ্বল প্রাজ্ঞতা; কোনোখানে হৃদয়বৃত্তির বাহুল্য নেই, কিন্তু দুটি গল্পেই রসিকতার মূলে রয়েছে সমবেদনা। "জনৈক পণ্টনী" সাহেবের সংসর্গে পড়ে প্রথম গল্পটি জমে উঠেছে রেলগাড়ির কামরায়, আমরা চলেছি কার্সিয়ং-এ। দৃশ্যের বর্ণনায় তুলির টানের সঙ্গে মিলেছে নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যঞ্জনা। অথচ কত সহজ! জানলার বাহিরে চেয়ে দেখো। "চারিপাশে কুয়াশার খদ্দরে ঢাকা; তাই পাহাড়ের দৃশ্য আমার চোখে পড়ল না। যদিচ এ পথটুকুর চেহারা অতি চমৎকার। রাস্তার দু-ধারে প্রকাণ্ড গাছ, যাদের একটিরও নাম জানিনে; অথচ দেখতে বড়ো ভালো লাগে। পৃথিবীতে অনেক জিনিসেরই নামই তার রূপ দেখতে দেয় না।" কার্সিয়ং স্টেশনে গাড়ি থামতেই কাণ্ড। নাম-রূপের রহস্য ঠেকল সহযাত্রীর সিগারেট কেস-এ। চুরি-করা সিগারেটের ধোঁয়ায় জটিল হ'ল মনস্তত্ত্ব। গল্পের ধোঁয়া কখন কেটে গিয়ে সংসারে ফিরেছি তা শেষ অবধি বোঝা কঠিন।

'প্রগতি রহস্যে'র মজা সাংঘাতিক— প্রগতির নেশাখোরের পক্ষে। গল্পের পরিচয় দিতে গেলে সবটাই উদ্ধৃত করা চাই, কেননা "অণুকথা"কে অণীয়তর করবার উপায় নেই। কিন্তু বীজমন্ত্রস্বরূপ দু-চারটে কথা উদ্ধার করি।

"তিনি বললেন Brandy। Brandy না খেলে মুরগি খাওয়া যায় না, আর

মুরগির পিঠ-পিঠ আসে আর সব প্রগতি। Brandy পান করলে নেশা হয়, অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়। তখন মুরগি নির্ভয়ে খাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের জাতিভেদ থাকে না। মুরগি খেতে হলেই মুসলমানের হাতে খেতে হয়। তার পরেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কেননা, অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ওরূপ পান-ভোজনে মহা-আপত্তি করে; শিক্ষিত হলে করে না। আর স্ত্রী-শিক্ষার পিঠ-পিঠ আসে স্ত্রী-স্বাধীনতা। তারা লেখাপড়া শিখবে আর অন্দরমহলে আটকে থাকবে,— এ হতেই পারে না। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ প্রগতির মূল হচ্ছে Brandy, ইংরাজী শিক্ষা নয়।"

এই ছুরি-খেলা দূর থেকে দ্রষ্টব্য, বেশি কাছে যাওয়া প্রগতি অ-প্রগতি কোনো দলের পক্ষেই নিরাপদ নয়। খেলার শেষে দু-চারটে প্রশ্ন দর্শকের মনে জাগবে যা দিবানিদ্রার অনুকূল নয়।

প্রগতির বিষয়ে আব-একটু শোনা ভালো। কথাটা সাময়িক।

"কোনো বড়ো জিনিসের কোনো ছোটো অর্থ নেই, যা দু-কথায় বোঝানো যায়; আর অনেক কথায় তার ব্যাখ্যা করতে গেলে, লোকে সে-কথায় কর্ণপাত করবে না। প্রগতির প্রমাণ এই যে, আমি যদি বলি প্রগতি হয়নি, তবে লোকে বলবে— তুমি অন্ধ, আর না হয় তুমি সেকেলে কূপমণ্ডূক। দেখতে পাচ্ছ না যে, আমাদের কাব্যে ও চিত্রে, নৃত্যে ও গীতে কি পর্যন্ত প্রগতি হয়েছে ও হচ্ছে? তুমি প্রমথ চৌধুরী দেখছ যে, আমরা আজও পরাধীন ও পরবশ; কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে, আমাদের পরাধীনতাই আমাদের সকল প্রগতির মূলে, আর তুমি ঐ প্রগতির জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে চলেছ।"

প্রাগ্রসর তত্ত্ব শুনুন অন্য প্রসঙ্গে। কথাটা উঠেছে psalm-কে pasalma-য় রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধে; ইংরেজি উচ্চারণের যুক্তি চাই সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে।

"বাঞ্ছারামবাবু বললেন,— তিনটি vowel না জুড়ে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছেঁটে দিতে পারতে, তাহলেই তো উচ্চারণ ঠিক হ'ত। এটি মনে রেখো যে, ইংরেজরা লেখে এক, বলে আলাদা, এবং করেও আলাদা। এই হচ্ছে তাদের অভ্যুদয়ের কারণ।"

এর মধ্যে যা আছে তা উচ্চারণতত্ত্বের চেয়ে বেশি।

বাংলা-মনের আশ্চর্য নিপুণ বিশ্লেষণ আছে প্রমথবাবুর গল্পে এবং বিশেষ ক'রে "অণুকথা"য়— এইটে বলতে চেয়েছিলাম। শেষের গল্পগুলি বাংলার গ্রাম্য পরিবেশ থেকে নিয়ে এল শহরে, যদিও শহরের প্রসঙ্গ পূর্বে অনেক জায়গাতেই

আছে। বিদেশী আকস্মিকতার দোকান আপিস উদ্ধত ধনী-পাড়া এবং বহুতর ব্যবসায়ী বাধা ঠেলেও বাংলার আভিজাত্য কলকাতা শহরে প্রকাশ পেয়েছে ; যদিও সেই প্রকাশের ক্ষেত্র কথায় এবং কলমে— কাজ অবধি পৌঁছয় কম। প্রমথবাবুর লেখায় কোনো দিক বাদ পড়েনি। প্রগতির জোয়ার, জমিদারির ভাটা, ভুতুড়ে প্রহসন, গ্রাম্য প্রহেলিকার আড়ালে বাংলার তেজ— সব জড়িয়ে বিশিষ্ট বাঙালীত্ব। এবং যে বিশিষ্ট বাঙালী-দৃষ্টিতে সমস্তখানি উদ্ভাসিত তা সৃষ্টি-শক্তিমান, উদার, নির্ভীক এবং হাস্যোজ্জ্বল। পড়তে-পড়তে মনে হয় বাংলার যথার্থ গরিমার সন্ধান পেলাম যা কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ বাঙালী-প্রতিভার সম্পদ নয়, প্রচ্ছন্নভাবে বাংলা দেশে পরিব্যাপ্ত। "অণুকথা"র গল্পগুলি লক্ষণাক্রান্ত ; বাংলা দেশের কারুণিক, চিত্তবান পরিচয় বহন ক'রে যুগের এবং যুগসম্ভবপরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'মেরি ক্রিস্‌মাস' বইয়ের চতুর্থ গল্প— কিন্তু এর স্থান একটু আলাদা, তাই শেষ উল্লেখের জন্যে রেখেছি। শুভ্র বেদনা ফুটেছে মাধুরীভঙ্গিকায় অথচ যথাযথ জীবনের নির্মম আকাশকে জড়িয়ে। "চার-ইয়ারি কথা"-র সঙ্গে এর তুলনা ; সুন্দর, কঠিন, লীলায়িত চারুনির্মাণশিল্পে জীবনের একটি গভীর মুহূর্ত ধরা পড়েছে। চারিদিকে পড়েছে হাসির আলো, কিন্তু এই হাসির মর্মস্থলে আছে বেদনা।

..."অন্তরের মনসিজ ভস্ম হয়ে গেলেও, সেই ছাইয়ের অন্তরে কিঞ্চিৎ উষ্ণতা বাকী আছে। আমরা হিন্দুরা হ'লে বলতুম, দগ্ধসূত্রে সূত্রের সংস্কার থাকে। আমার মনে ঐ-জাতীয় একটা ভাব ছিল। কখনো-কখনো গোধূলিলগ্নে যখন ঘরে একা বসে থাকতুম, তখন তার ছায়া আমার সুমুখে এসে উপস্থিত হ'ত, তার পর অন্ধকারে মিলিয়ে যেত।"

এই গল্পের বাঙালী বিদেশের স্মৃতি দিয়ে অনবধান-মুহূর্তের মানসরচনা করেছেন। গল্পটি পুরোপুরি রোম্যান্টিক, কিন্তু এর রিয়ালিজ্‌মও সহজ নয়। শিল্পব্যাপারে সংজ্ঞার ব্যর্থতা যে কতখানি তা বোঝা যায়, জাগ্রত গুণান্বিত লেখায় বহু ধর্মের যোগেই স্বধর্ম।

"প্রেমের ফুল...নভেলে বিবাহের ফলে পরিণত হতে পারে, কিন্তু জীবনে প্রায় হয় না। জীবনটা romance নয়, তাইতো romantic সাহিত্যের এত আদর।"

এই গল্প যে-দরের কল্পনা জাগায় তাতে চৈতন্যের সতর্ক দৃষ্টি আছে, এবং

দেখা দেয় খোলা চোখের বিশ্ব। সিনেমার অবকাশে কোন্ রিয়ালিটি মনকে অধিকার করল? ঘটনাকে জয় ক'রে মানুষ কী লাভ করে যা মানুষের চরম সান্ত্বনা?

…"এখন আমি সুখদুঃখের বাইরে চলে গিয়েছি। আবার যখন দেখা হবে সব কথা বলব।

"—আবার দেখা কোথায় ও কবে হবে?

"—কবে হবে জানিনে। তবে কোথায় হবে জানি। আমি এখন যেখানে আছি, সেখানে। সে দেশে ঘড়ি নেই। কালের অঙ্ক সেখানে শূন্য— অর্থাৎ অনন্ত। সে হচ্ছে শুধু কথার দেশ।"

জয়ন্তীর মরসুম চলেছে বঙ্গদেশে। প্রমথ-জয়ন্তী করতে হলে গঙ্গার জলে গঙ্গাপুজো বিধেয়। অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব তাঁর সমস্ত ছোটোগল্পগুলিকে একত্র ক'রে তাঁকে দেওয়ার উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যকে উপহার দেওয়া।

যুগসংকটের কবি ইকবাল

যাকে বলে কস্‌মোপলিটান মন তা য়ুরোপের চেয়ে ভারতবর্ষে প্রবল। দুর্যোগের মধ্যেও আমরা বিচিত্র বিশ্ব সম্বন্ধে উদার মানস রক্ষা করেছি তার প্রমাণ আজও এই দেশে চতুর্দিকে পাওয়া যাবে। পশ্চিম-য়ুরোপের বৃহৎ মানবিকতা এর তুলনায় গ্রহণের চেয়ে গ্রাস করবার দিকে উন্মুখ; ষড়যন্ত্রবাহন প্রতাপের রাজনৈতিক বসুধৈব কুটুম্বকং নানা কারণে আমাদের অনায়ত্ত। প্রধান একটি কারণ আমাদের সভ্যতার ধারণাশক্তি, যা ভারতীয় মাটিতে বহুযুগের বিবিধ জাতীয় সংমিশ্রণের ফলে একটি স্থায়ী মৈত্রীসংস্কারে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর পরিচয় পাই।

উত্তর-ভারতের প্রহরী খাইবর-বোলানের দরজা বারেবারে খুলে দিয়েছে বল্লমের ভয়েই নয়, আতিথ্যের তাগিদেও; লধক-চিত্রালের তোরণ দিয়ে এসেছে চীন-মঙ্গোল; অন্যদিকে বেলুচ-প্রান্ত দুজ্‌দাব, বালুময় কলাৎ রাজ্য, পস্‌নি-র সমুদ্রতট পর্যন্ত ভূমিখণ্ডে বহুতর কারাভানের পথ ডেকেছিল ইরানী তুরানী প্রতিবেশীকে। প্রাক্‌-ইসলামীয় আরব-সভ্যতা এ-দেশে বাধা পায়নি; দীর্ঘ পরবর্তীকালে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এসেছিলেন উৎকর্ষের কৌতূহলী মন নিয়ে, ভারতবর্ষের উদারনীতির পরিচয় তাঁরা পেয়েছিলেন। যোগবিরুদ্ধ সামরিক অধ্যায় এই বড়ো যোগাযোগকে নষ্ট করতে পারেনি। হিন্দুকুশের গিরিসংকট প্রাচীনতর কালে কেবল যে আক্রমণকারী ঘোড়ার খুরকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিল তা নয়— সেরকম সংকটও বহুবার ঘটেছে— অশ্ববাহী আর্যেরা ভারতের চিত্তদুর্গকে জয় করেছিলেন। তার কারণ আফগানিস্তানের পথ বেয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা এলেন তাঁরা শতঘ্নীর চেয়ে দিব্যাগ্নির সন্ধান ভালো জানতেন, যে-আগুন হোমের, দাবানলের নয়। উত্তর-ভারতে তাঁদের প্রতিষ্ঠার মধ্যে সহযোগিতার ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রাচীনতার অর্ধব্যক্ত স্তরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা স্মরণ করেছি।

সমুদ্রের নীল তোরণ দিকে-দিকে অবারিত ছিল। ঢেউয়ের রাস্তায় মালয়, যবদ্বীপ, পূর্বতর দ্বীপাবলী হতে, চীন এবং প্রশান্ত সমুদ্রের প্রত্যন্ত আদিম

লোকালয় হতে পণ্যবাহী ভারতীয় নৌকা যাতায়াত করেছে ; দক্ষিণাবর্তের ঘাটে-ঘাটে তখন নৌ-বন্দর ; ক্রমে দেখা দিয়েছিল তমলুক থেকে আরাকান আকেয়াব পর্যন্ত জাহাজের ঘাঁটি। জ্ঞানের পণ্য, ধনের পণ্যবাহীরা আরব্যসাগর দিয়ে আফ্রিকা, আয়োনিয়া, এবং আরব-উপকূল থেকে ভারতের দীর্ঘরেখান্বিত পশ্চিমতটে এসে পৌছত। তারা নিয়েছে এবং দিয়েছে, ভারতের আন্তর্জাতিক সত্তার স্তরে-স্তরে নানা মানবিক ঐশ্বর্যের পলি পড়েছে দেখতে পাই। ভীষণ নৌযুদ্ধ বা কলোনিয়ল লুব্ধতার সংঘর্ষে ভারতবর্ষ প্রবৃত্ত হয়েছিল বলে জানা নেই। মোটের উপর এই আদান-প্রদানের সহায়তা করেছে আমাদের মহাপ্রাদেশিক স্বভাব। নেপাল-ভুটান-সিকিম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিবিধ পূর্বীয় সভ্যতার মধ্যে আত্মীয়যোগ আমাদের ঐতিহাসিক অন্যতম একটি অধ্যায়। ভৌগোলিক সংস্থান আমাদের দেশে বৃহৎ ঐক্যের ভূমি প্রস্তুত করে রেখেছিল, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে সভ্যতার যে উৎকর্ষনাট্য অভিনীত হ'ল তাতে একটি অখণ্ড ভারতীয় ধারা দেখতে পাই। শত বিচ্ছিন্নতার আঘাতে তা লুপ্ত হয়নি, আজও জেগে আছে ; প্রশস্ত সূক্ষ্ম দেশাত্মশক্তির বলেই ভাবতবর্ষ নির্ভয়ে বহুকে আপন করেছে, বাহিরকে ডেকেছে। এর জন্যে আমাদের ক্ষতিস্বীকার যাই হোক, আজ পর্যন্ত পশ্চিম-য়ুরোপ, দুই আমেরিকা, জাপান অথবা ঔপনিবেশিক ন্যুজীলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মতো আমরা মানুষকে ঠেকিয়ে রাখিনি। বলিনি, প্রবেশ নিষেধ।

ভারতবর্ষ বহিরাগতদের সঙ্গে, স্বদেশীয়দের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করেনি তা নয়— কুরুক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্রের প্রদাহ সব দেশেই অত্যুজ্জ্বল— কিন্তু খরকরবালের ধর্মকে আমরা বড়ো করিনি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই মাহাত্ম্যকে স্বীকার করতেই হবে : ক্ষাত্রধর্ম তার কাছে মাথা নিচু করেছে। সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠের বাহুবলে সাধিত হয়নি, যারা সংখ্যায় এবং বলেই গরিষ্ঠ সেই-সকল যোদ্ধজাতির স্বপ্রবৃত্ত একটি আদর্শিক স্বীকৃতির দ্বারাই ঘটেছিল। এই স্বীকারকেই ভারতীয় গ্রহণপন্থী সভ্যতার মূল জানতে হবে। তৈমুর-জেঙ্গিস-আলেকজণ্ডর-নেপোলিয়ান প্রমুখ পরস্বাপহারী বৃহৎ দস্যুব ভারতীয় সংস্করণ আমাদের পথে-ঘাটে বইয়ের পৃষ্ঠায় উদ্ধত মুষ্টিতে, ঘোড়ায় চড়ে খাঁড়া ধ'রে দাঁড়িয়ে নেই— তলিয়ে গেছে। য়ুরোপের রাস্তায় হাঁটলে বা তাদের প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরমণ্ডিতদের নাম পড়লে প্রভেদ বোঝা যায়। রাষ্ট্রিক ইতিহাসের কথা নয়, সভ্যতার প্রতীকস্থানীয় আদর্শিক চরিত্রমালার কথাই বলছি। অন্যের দেশ লুঠ ক'রে কোনো

বীরপুরুষ মহাপৌরুষের আখ্যা পায়নি ভারতীয় সভ্যতার কাছে। শ্রেষ্ঠীকে শ্রেষ্ঠত্ব অথবা পরধর্মদ্বেষীকে স্তবনীয় প্রাধান্য দিতে আমাদের ধর্মে বেধেছিল। বহু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও আমাদের সংস্কৃতির সাক্ষ্য তা-ই। অবশ্য এ-কথা আজ বলা চলে গৌরবের চেয়ে মুখ্যত আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করবার জন্যেই।

কিন্তু য়ুরোপের বুদ্ধিমন্তেরা যখন কস্‌মোপলিটান অর্থাৎ বিশ্বদরদী উদার মানসের একমাত্র দখলি স্বত্ব দাবি করেন যেহেতু তাঁরা নানা বন্দরে হোটেল খুলেছেন, ঘাটে-ঘাটে তাঁদের বৃত্তিভুক্‌ দালালেরা বহু ভাষায় সস্তা মাল বিক্রি করতে সুদক্ষ— সেই পণ্যদ্রব্য অন্যের পক্ষে সস্তা বা উপযোগী না-ই হোক— তখন অন্তত বন্ধুমহলে বসে আমাদের ঐতিহাসিক পাল্টা জবাবটা দেওয়া দরকার। দখলি স্বত্বের সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক বৈজ্ঞানিক যে-সকল দাবি উপস্থিত হ'ল তারও বিচার করতে হয়।

কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে অন্যদেশীয় সুর এবং রাষ্ট্রবাক্যের প্রতিধ্বনি করলে ভারতীয় সক্রিয়তা নয়, কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পাবে। সৃষ্টিশীল ভারতীয় কবি ভাব-নায়কেরা সমস্ত যুগের মানসে প্রবিষ্ট হয়ে কী উত্তর দিচ্ছেন সেইটে আলোচ্য।

কবি ইকবালের কাব্যরচনাবলীকে এই নূতন যুগসংকটের ভূমিকায় ধ'রে দেখলে তাঁর একটি বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে মনে করি।[১]

তাঁর কাব্যের প্রথম পর্বে ভারতীয় সচেতনার সংগীত বেজেছিল ; য়ুরোপের বিশ্বভুক্‌ ঔদার্য তখনো আফ্রিকায় এসিয়ায় চরম হয়ে ওঠেনি ; কিন্তু চতুর্দিকের প্রচ্ছন্ন আয়োজন অগোচর ছিল না। সংকটের সেই প্রদোষকালে ভারতের মৈত্রীভাবনা সমগ্র ভারতবর্ষকে আরো আপন ক'রে চেয়েছিল ; তখন আমাদের বৃহৎ জাতীয়তা অসাম্প্রদায়িক, সর্বপ্রাদেশিক একটি সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করতে প্রবৃত্ত। কাব্যের সেই অরুণযুগে ইকবাল ললিতে ভৈরবে গান বেঁধেছিলেন। ভারতবর্ষের বড়ো আকাশে তার সঞ্চরণ।

ক্রমে এসিয়া-য়ুরোপের নানাদিকে অন্ধকার ক'রে এল। মানবসম্বন্ধের এই নূতন দুর্যোগকে বলা চলে আধুনিক আন্তর্জাতিকতার দুর্যোগ। এর প্রকৃতিটা

---

১ এই প্রবন্ধের তথ্যসংগ্রহ এবং তর্জমার জন্য আমি অনেকের কাছে ঋণী। কিন্তু ভ্রমের জন্য দায়িত্ব আমার নিজের। কবি ইকবালের কাব্যালোচনায় আমি অনধিকারী। বিশেষ একটি প্রসঙ্গসূত্রে খণ্ড তর্জমাকে একত্র করেছি ; নানাদিক থেকে বাংলাভাষায় তাঁর রচনার বিশদ আলোচনা হবে এই আশা রইল।

আমাদের অকল্পিত, ইতিহাসে এরকম মৈত্রীর পরীক্ষা পূর্বে ঘটেনি। সহমরণের ডাক এল য়ুরোপ থেকে এসিয়ায়, সহজীবনের নয়। ধনে-প্রাণে সাড়া না দিলে প্রমাণ হবে আমাদের যুগবিরুদ্ধ স্বভাব, যেটা বর্বরের; যারা অবৈজ্ঞানিক উপায়ে যথেষ্ট মরছে তাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে মরে দেখাতে হ'ল তারা বাঁচবার যোগ্য। যোগ্যতা প্রমাণের জন্য আমাদের উপর নূতন দাবি উপস্থিত হতে লাগল, শুধু আধুনিক তীব্র আন্তর্জাতিকতার দাবি নয়, আমাদের প্রাক্তন সংস্কারে যাকে মানবিক আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলাম সেই আদর্শকেও ত্যাগের দ্বারা বীর্যের দ্বারা সপ্রমাণ করবার জন্য য়ুরোপীয় নেশনেরা আমাদের দায়িক করলেন। দেখা গেল যে-সব জাতি বিকিয়ে রয়েছে, তাদেরই কাছে প্রবল গ্রহীতা 'আরো-চাই' রবে আতিথ্যধর্মের দোহাই পাড়েন; সে-ধর্ম নিজের নয়, দাতার। যে আদর্শ আমরা স্বীকার করি তার দ্বারা অন্যে আমাদের বিচার করবে সে-কথা সত্য, কিন্তু বিচারকও বিচার্য এই প্রশ্ন মনে থেকে যায়। অথচ বিচারকই যেখানে জুরি জজ এবং দণ্ডদাতা সেখানে প্রশ্নটা অব্যক্ত বাখতে হয়; না রাখলেও পৃথিবীর কানে পৌঁছয় না। পূর্বদেশগুলির একতরফা মৈত্রীক্ষমতা সম্বন্ধে সকলেরই উৎসাহ বেড়ে উঠল। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই বিশ্বসুদ্ধ জেনে যায় তলে-তলে আমাদের প্রাচ্য কূটস্বভাব ঘোচেনি। কোটাপাক্সির ভূমিকম্পিতদের সাহায্য না করলে প্রমাণ হয় আমরা কূপমণ্ডূক ওরিয়েণ্টাল; মেদিনীপুরের নানাবিধ মহামারীতে মেক্সিকো বেদনা প্রকাশ করবে আমরাও ভাবতে পারি না, তারাও নয়। এই উদাহরণ অনেকাংশে কাল্পনিক; সর্বৈব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের অভাব ইকবালের সময়েও ছিল না। দেখতে-দেখতে দৃষ্টান্তের জালে ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়ল।

এরকম অবস্থানে প'ড়ে আমাদের দেশে অনেকে বললেন পূর্বীয় আদর্শই তাই, বিশ্বের জন্যে নিঃস্ব হওয়া। অপেক্ষাকৃত নিরাপদও বটে। নূতন আন্ত-র্জাতিকতার চর্চায় প্রবল জাতিরা খুঁজুক ধন, আধ্যাত্মিক দুর্বল জাতিরা নিঃস্বার্থ বাহন হয়েই মায়ার সংসারে জয়ী হবে। অন্যে যারা নূতন বা সনাতন ভারতীয় মানবিকতায় ঘোর অবিশ্বাসী তাঁদের উগ্র কর্মে অবশ্য পশ্চিমী যুগধর্মই প্রাচ্য-মূর্তিতে ব্যাখ্যাত হ'ল। সেই ব্যাখ্যার জন্যে কাব্যের দরকার হয়নি; তাঁদের কর্মবিধি কাব্যবিচারের প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু কাব্যলেখকেরাও প্রকৃতি অনুসারে সংকটের প্রথম পর্যায়ে রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন; তাঁদের দৃষ্টিতে দেশ আপনাকে চিনেছিল। য়ুরোপীয় নেশনগুলির নব্যন্যায়শাস্ত্রের রহস্যে

ইকবাল অভিনিবিষ্ট ছিলেন, অনেকদিন পর্যন্ত এ-বিষয়ে লেখেননি। লিখতে বসে ক্রমে তাঁর রচনার সুর গেল বদলিয়ে।

কিন্তু তাঁর স্বভাব বদলায়নি।

দুই

কবি ইকবালের বাড়ির দরজাটা খুলে মনে হ'ল মধ্য-এসিয়ার বিস্তৃত অঙ্গনে এসে পৌঁচেছি যেদিকে লাহোরের কাবুলি দরোয়াজা খোলা। উত্তর-ভারতের মুক্ত হাঁওয়া ইকবালের কথাবার্তায়, তাঁর দরাজ ব্যবহারে, ঘরের পঞ্জাবি-আফগানি সরঞ্জামে। তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল[২]। কৌচে ঈষৎ হেলান দিয়ে উঠে বসলেন, হাতে গড়গড়ার নল; পরনে তাঁর ধবধবে পিরান, ফুলো পাজামা। তাঁর সৌজন্য সুন্দর বললে সব বলা হয় না, যেন ব্যবহারের একটি শিল্পকাজ; এইরকম আভিজাত্য পুরোনো পশ্‌মিনার উপরে কাশ্মীরী ফুলের মতো, দুর্লভ সামগ্রী। অথচ প্রখর যুগচেতন মন, হাস্যোজ্জ্বল; একেবারে ভারতীয় এবং আধুনিক তাঁর চিন্তার সৌকর্য। জানতাম এই কবি দামাস্‌কুস্‌-কাইরো থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত পারসিক উর্দু ভাষায় লোকের মন নাড়িয়েছেন;[৩] ভারতবর্ষ-ব্যাপী তাঁর 'হিন্দোস্তান হমারা' গানের চল; কেম্ব্রিজের ইনি মেধাবী পণ্ডিত; এঁর মতো চোস্ত ইংরেজি গদ্য কম ভারতীয় লিখেছেন। অথচ কত হালকা তাঁর জ্ঞানের ভার, সহজ দিলদরিয়া ভাব। বুঝলাম একেই আমরা কস্‌মোপলিটান মন বলি, যা স্বদেশী অথচ প্রসারী, যেখানে লেনদেন চলছে বড়ো চত্বরে, নানা-দেশীয় আধুনিকে-প্রাচীনে সমন্বয়।

তাঁকে বললাম, আপনি ভারতীয় কবি, কোনো জাতির বা সাম্প্রদায়িক

২ ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে ইকবালের সঙ্গে লেখকের প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

৩ ইকবালের একটি ছোটো কবিতা মনে পড়ে যায়:

> নির্বোধ আমি কিন্তু কৃতজ্ঞ,
> তোমার সঙ্গে আমার আছে তো সম্বন্ধ।
> নূতন চঞ্চল করেছি আমি অনেকের দিল্‌
> লাহোর থেকে বুখারা সমরখন্দ পর্যন্ত।
> প্রাণবায়ুর আমার এই পেয়েছি পরিচয়: হেমন্তেও
> ভোরের পাখি খুশি হয় আমার আসঙ্গে।
> কিন্তু জন্মেছি সেই দেশে আমি, যেখানে মানুষেরা
> দাসত্বে রয়েছে তৃপ্ত।...

—যুকার-ও-সকিয়া

পরিচয় আপনার গৌণ। তিনি হেসে বললেন, আমার কবিতার বই "বাং-ই-দারা"-র ভূমিকাটা অতিধার্মিকের ভয়ে লুপ্ত, প্রথম সংস্করণে জানিয়েছিলাম ভগবদ্গীতার প্রভাব আমার উপর কতটা গভীর, এখনো খুঁজলে দুটো-একটা বই বেরোবে। কিন্তু— এই ব'লে দীর্ঘশ্বাসে কথাটা শেষ করলেন। একটু পরে বললেন, ভারতে ইসলামী সংস্কৃতিকে অনেকে চিনল না, তাই ভূমিকাটা সরাতে রাজি হয়েছিলাম। বললেন, হয়তো আমি নিজেও কিছু মত বদলিয়েছি।

মনে পড়ে গেল প্রাচীন ইকবালের কথা। প্রথম পর্যায়ে তাঁর কবিতাগুলিতে সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যময় রূপ কত স্পষ্ট, এবং সেই কারণে বহির্ভারতকে গ্রহণ করতেও তিনি কিরকম উৎসুক। "বাং-ই-দারা" (কারাভানের ডাক) বই বেরিয়েছিল ১৯২৪ সালে, উর্দু ভাষায় ; তাতে তাঁর স্বাদেশিক চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই। প্রসিদ্ধ একটি কবিতায় বলছেন, মাটিতে মিলেছি আমরা একই টানে :

> ধর্ম আমাদের শেখায়নি কলহ, ভারতীয় আমরা—
> মাতৃভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ।

বলছেন, সম্মিলিত ভারতীয় স্বাধীনতার তপস্যা আমাদের ভিত্তি, ব্যর্থবেদনার মধ্য দিয়েও আমাদের যোগ। তার পরে :

> হায় রে ইকবাল, পৃথিবীতে কেউ জানে না আমাদের গোপন কথা,
> কে দেখতে পায় আমাদের বেদনা ?

ইকবালের ভারতীয় উদ্যানে নানক গাইলেন তাঁর ঐক্যের গান, প্রাচীন ভারতের স্তোত্র উঠল আকাশে, ইসলামের সাম্যবাণী ধ্বনিত হ'ল মুয়েজিনে ভক্তগাথায়, মিলল তারই সঙ্গে। "হিন্দোস্তানি বাচ্চোকা" কবিতাটিতে কাউকে বাদ দেননি। সারা ভারতের ছেলেমেয়েরা তা আবৃত্তি করতে পারে, তাদেরই জন্যে লেখা।

এগারো বৎসর পরে ইকবাল দ্বিতীয় উর্দু কাব্যগ্রন্থ রচলেন, কিন্তু "বাল্-ই-জিব্রাইল" (গেব্রিয়েলের পাখা) বেরোবার মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে পারসিক ভাষায় লেখা গ্রন্থগুলিতে তিনি শুধু উচ্চাঙ্গের মিষ্টিক কাব্যসৃষ্টি নয়, ভারত-সংস্কৃতির পটভূমিকায় তাঁর গভীর সর্বজাতীয় বোধকে প্রকাশ করেছেন। য়ুরোপীয় সংঘশক্তির আঘাতে তাঁর স্বাদেশিকতা জেগে উঠেছিল ; সমস্ত দেশকে

এক ক'রে আমরা মাথা তু'লে দাঁড়াব, মানবমহাযাত্রায় যোগ দেব—এই তাঁর সংকল্প।

সবাইকে দেখাব তোমাতে বিশ্বাস কাকে বলে
হে হিন্দোস্তান,
নিবৃত্ত হব না যতদিন জীবনের ত্যাগ পূর্ণ হয়নি তোমার কাছে।
আমার এই একমুঠো প্রাণধূলি করব বপন,
অঙ্কুরিত বেরোবে তাতে নূতন-হৃদয়, প্রাণে-ভরা, জাগবে কুঁড়ি হয়ে।
ধর্মান্ধতা বাসা বেঁধেছে আমার এই দেশের মাটিতে,
আমি সেই ঝড় যাতে ভাঙবে ধুলোয় সেই ইমারত।

পারসিক ভাষায় রচিত এই কবিতাটির অন্যত্র বলছেন :

এই যে বিভিন্ন ছড়ানো রুদ্রাক্ষ, সব নিয়ে গাঁথব জপমালা,
হোক কঠিন, এই হবে আমার কাজ।
অবগুণ্ঠন ঘোচাব আমি প্রিয়ার মুখ থেকে,
প্রিয়া আমার "একতা",
লজ্জা দেবো আমি গৃহবিবাদকে।
সারা দুনিয়াকে দেখাব আমি কী দেখেছি মুগ্ধ চোখে।

আশ্চর্য নয়, যে, ভারতীয় ঐক্যের এই মুগ্ধ ধ্যান কবি ইকবালকে নিয়ে গেল বিশ্বলোকালয়ে, সেখানে নেশন -এর চেয়ে সত্য জনসাধারণ, জাতীয়তা সর্বজাতীয়, সেখানে মিলনের বাধা ঘুচে যায় :

নেশনগুলির থামাও ঐ বেসুরো ঝংকার,[৪]
তোমারই সংগীতে আমাদের কানকে করো স্বর্গীয়,
ওঠো, বাঁধো সুর ভ্রাতৃত্বের বীণায়,
ফিরে দাও পেয়ালা ভরে প্রেমের সুরা!

যৌবনশেষ পর্যন্ত ইকবালের গীতিকাব্যে এই একটা মূল ধুয়ো, তাঁর কল্পনার প্রসঙ্গ কত সহজ, মাটির কত কাছাকাছি, অথচ সূক্ষ্ম ভাবনায় শিল্পিত ;

---

৪ নেশন -এর উপর তাঁর দৃষ্টি সতর্ক ছিল—
"প্রকৃতি কখনো ছেড়ে দিতেও পারে ব্যক্তিবিশেষকে,
কিন্তু ক্ষমা সে করে না নেশন্‌দের কৃত পাপকে।"
—দিন্‌-ও-তালিম = ধর্ম ও শিক্ষা, ১৯৩৭

নির্বিশেষে গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন প্রাদেশিক স্বদেশীয়কে। কবিতার পাত্রটি গড়েছিলেন ভারতীয় ধাতু দিয়ে, তাতে বসল ইস্পাহানী নীলা, ভাষার মিশ্রিত কত রং, মুসলিম আরবীয় উজ্জ্বল চিন্তার মণি। কাব্যের শাশ্বতকে তিনি কোনোদিনই ভোলেননি, বড়ো করেছেন প্রেরণার দৈবকে ; জানতেন সংকীর্ণ স্বার্থের সাধনায় প্রকাশ নেই।

মহাজাতি বেঁচে থাকে চিন্তার ঐক্যে,
ধার্মিক অনুষ্ঠানও যদি ভাঙে সেই এককে
জানব তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধ।

'হিন্দি-ইস্‌লাম' নামক এই কবিতাটি ১৯৩৭ সালে বেরোয় ; "জর্ব-ই-কালিম্" (মোসেস -এর দৈবাঘাত) গ্রন্থের অন্যান্য রচনাতেও ইকবাল এই "কালিম্"— "দৈবাঘাত" বলতে দিব্যপ্রেরণার অনিবার্য ক্রিয়া বোঝায় কি না জানি না— এবং প্রাণশক্তিকে মানুষের সকল সৃষ্টির মূলে দেখিয়েছেন।

প্রাগ্রসর হয় না জাতি পৃথিবীতে দিব্যশক্তি বিনা,
ব্যর্থ হয় আর্ট যদি তাকে না ছোঁয় কালিম্ -এর শক্তি।

—ফানুন-ই-লতিফা = শিল্পকলা

কালিম্ -এর প্রসঙ্গে আরো বলছেন :

আর্টের চরম উদ্দেশ চিরন্তন জীবনে জ্বলে ওঠা।
মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গে তার পরিচয় কোথায় ?

পরবর্তী তাঁর কাব্যে চিত্তের সংঘর্ষ বিদ্যুতাভ হয়ে দেখা দিয়েছিল, শাণিত বাক্যের আঙ্গিকে মাধুর্যের চেয়ে কঠিন ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ে, কিন্তু এরকমের শিল্পধ্যানময় প্রসঙ্গ হঠাৎ জাগেনি তা নয়। কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে তাঁর খণ্ড-কবিতার মালা গৌরবের অধিকারী কিন্তু বিশেষ একটি বিষয়ের যোগে তাঁর রচনার আলোচনা করব।

য়ুরোপীয় রাষ্ট্রিক শক্তিমত্ততা ইকবালকে "খুদি" অর্থাৎ আত্মশক্তির চর্চায় প্রবৃত্ত করল। প্রাচীন আরবিক এবং নীট্‌শে-হেগেলিয়ান দর্শন তাঁকে পূর্বেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে। তাঁর "আশ্‌রার-ই-খুদি" গ্রন্থ নিকল্‌সন-কৃত তর্জমায় (*Secrets of the Self*) সমগ্র য়ুরোপে বহুখ্যাত। সেই আত্মশক্তির দর্শনকে তিনি ক্রমে এসিয়ার নানান সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ক'রে, বিশেষ ভাবে ইসলামীয়

সভ্যতার ক্ষেত্রে এবং ভারতবর্ষে তাঁর আপন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। আশ্চর্য প্রাঞ্জল তাঁর একটিমাত্র গদ্যগ্রন্থ *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*-এ শক্তিসাধক কবির পরিণত চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে কোরানশরিফ এবং ইসলামীয় বিজ্ঞান-দর্শনের প্রগাঢ় সুন্দর আলোচনা আছে, তর্জমাগুলিও চমকপ্রদ। মোটের উপর তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়; যা বিস্তৃত হয়েছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত, তাঁর দার্শনিক এবং সামাজিক চিন্তাকেই প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে গীতিকাব্যের লাবণ্যের চেয়ে বিদ্রূপজ্বলন্ত মতামতের পরিচয় সুস্পষ্ট।

একদিকে উদ্যত পশ্চিম-রাষ্ট্র; অন্যদিকে পূর্ব-সভ্যতার অন্তর্বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য, নির্জীবন। দুই হাতে ইকবালকে বাক্যের তলোয়ার খেলাতে হ'ল। তখ্‌বির অর্থাৎ অদৃষ্টকে মেনে যারা শায়িত তাদেরকে দীক্ষা দিলেন তদ্‌বির, পুরুষার্থের মন্ত্রে, এবং কর্মে; য়ুরোপীয় মুখোশকে লক্ষ্য করে ছুটল ব্যথিত ক্রুদ্ধ শ্লেষাত্মক বাক্য।

তিন

লেনিন -এর জবানিতে ইকবাল ঘোষণা করলেন :

য়ুরোপে আলো, জ্ঞান এবং শিল্প দেখো আজ অপর্যাপ্ত।

তার প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে :

স্থাপত্য চাও তো দে'খো ব্যাঙ্কগুলির দিকে,
ধনিকের সৌধগুলি চর্চের চেয়ে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন।
বাণিজ্য— নিশ্চয় আছে, বস্তুত সেটা জুয়োখেলা,
একজনের লাভে হাজারজনের মৃত্যু।
যে-মহাজাতি হারালো ভগবানের প্রসাদ,
চরম তার উৎকর্ষ দেখো ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং স্টীম।··
লক্ষণ স্পষ্ট,— তক্‌বির[৫] নামক দাবা-খেলিয়ে
করল বাজিমাত তদ্‌বির[৬]-দাবাড়ুকে।···
সরাইখানার ভিতে লাগল ধাক্কা,
সরাইরক্ষকেরাও ব'সে ভাবছে ভাগ্যের কথা।···

---

৫ ভাগ্য (দৈব)।

৬ পুরুষকার।

রাত্রে পথের লোকের মুখে দেখছ স্বাস্থ্যের রক্তিম আভা
তার কারণ ওদের শরাব-পান, অথবা কস্‌মেটিক।

বণিক-সভ্যতার এই বর্ণনায় এসিয়াকে লক্ষ্য ক'রে বলা হ'ল :

য়ুরোপের শাদা মানুষ পূর্বদেশের উপাস্য দেবতা,
পশ্চিমের উপাস্য দেবতা চক্‌চকে সোনারুপো।[৭]

লেনিন -এর কথা ব্যক্ত হয়েছে কি না সন্দেহ, কিন্তু য়ুরোপীয় ধনতান্ত্রিকতার উপর আঘাত সুস্পষ্ট। "ফিরমান্‌-ই-খুদা" (ঈশ্বরের আজ্ঞা) কাব্যে ইকবাল পুরোপুরি বিদ্রোহী; লুব্ধদের কষাঘাত করে বলছেন :

পুড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও সেই শস্যখেতকে
চাষীকে যা দেয় না অন্ন···

ঐ কবিতাটির "জলা দে, জলা দে" ধুয়ো জনচিত্তে আগুন ধরাবার মতো।

সাম্রাজ্য-ব্যবসায়কে কেন্দ্র ক'রে ধনিক-সভ্যতার নির্লজ্জ বিক্রম ইকবালের কাছে অপরিসীম ঘৃণার্হ ছিল। কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠানকে তিনি বর্জন করতে চাননি, ধর্মকে তো নয়ই; কম্যুনিজ্‌ম্‌ -এর সঙ্গে তাঁর প্রভেদের এইটে মূল কারণ মনে হয়।[৮]

কিন্তু এ-বিষয়ে ইকবালের রচনায় স্থির নির্দেশ নেই। তাঁর চিত্তের পরিচয় স্পষ্টতর দেখতে পাই ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর আদর্শিক ছবিতে, যে-আদর্শ পৃথিবীকে নূতন ক'রে মৈত্রী এবং মুক্তির বিশেষ সন্ধান দেবে। পূর্বদেশ হতে জাগবে সেই উত্তর; অন্য উত্তরের মধ্যে একটি; কিন্তু য়ুরোপ সম্বন্ধে তিনি আশার কথা ব'লে যাননি। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোনো প্রবল শক্তিমান নেতা অন্যদের সাময়িক পরাভূত দণ্ডিত করলে তিনি আকৃষ্ট হতেন, কিন্তু অন্তরের আকর্ষণে নয়। ইকবাল কোনো-এক সময়ে মুসোলিনির দিকে ঝুঁকেছিলেন জানা আছে, কিন্তু তখনো প্রশস্তিরচনার মধ্যে যোগ করতে ভোলেননি :

ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌- এর দেহটা প্রকাণ্ড,
হৃদয়টা অন্ধকার···

---

৭ ধাতুদ্রব্য। চক্‌চকে ইস্পাত প্রভৃতিও হয়তো উপাস্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত।

৮ অন্যত্র বলেছেন : "ঐ-যে ধর্ম, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেনি এমন প্রফেট -এর স্থাপিত, উদরের ঐক্যে মানুষের ঐক্য স্থাপন..."
—সেই ধর্মকে তিনি সাম্যের ভিত্তিরূপে মানেননি।

তার পরে আবিসিনিয়ার দুঃখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল; ১৮ই আগস্ট ১৯৩৫ তারিখে তিনি লিখলেন :

য়ুরোপীয় শকুনদল এখনো জানে না
কত বিষাক্ত ঐ শবদেহ আবিসিনিয়ার।...
সভ্যতার শীর্ষ হচ্ছে মহত্ত্বের অধঃপতন,
নেশন-এর প্রাত্যহিক জীবিকা দস্যুবৃত্তি।
নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে প্রত্যেকে নির্দোষ এক-একটি
মেষশাবকের সন্ধানে।
বিলাপ করো, চর্চের স্ব-মহিমার আয়নাটি ভাঙ্‌ল
রাস্তার মাঝখানে ঐ রোমানেরা;
হায়রে চর্চের মানুষ, হৃদ্‌বিদারক এই ঘটনা।

মোটের উপর ইকবালের মন সমস্ত য়ুরোপকে সমীকৃত ক'রে এবং অবিচিত্ররূপে দেখেছিল। পশ্চিম-সভ্যতার তলে যে-সকল বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া চলছে, নূতন সভ্যতার উদ্যোগ এবং আগমনের সে-দিকটায় তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। সেখানেও যারা পূর্বদেশীয় অত্যাচারিতদের মতোই সাম্রাজ্যবাদী ধনিকের পদপিষ্ট, এবং যারা আক্রান্ত হয়েও অপরিসীম বীর্যের দৃঢ়তায় সমস্ত মানুষের দায়িত্ব বহন করছে তাদের পরিচয় ইকবালের লেখায় পাইনি। পূর্ব-য়ুরোপ এবং পশ্চিম-য়ুরোপের সকল শ্রেণীকেই তিনি খরশরবিদ্ধ করেছেন, অফুরন্ত ছিল তাঁর তূণ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ধারালো দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক :

য়ুরোপীয়েরা আবিষ্কার করেছিল গোপন রহস্য
যদিও বিজ্ঞ লোকেরা তা প্রকাশ্যে বলেনি—
ডেমোক্রাসি হ'ল সেই রাষ্ট্রবিধান
যাতে মানুষকে গোনা হয়, ওজন করা হয় না।

—জমূহুরিয়ৎ = ডেমোক্রাসি

রাষ্ট্রশক্তি মুক্ত হ'ল চর্চের হাত থেকে,
য়ুরোপীয় পলিটিক্‌স্ সেই দানব যার শিকল কেটেছে;
কিন্তু অন্যের সম্পত্তি যখন দানবের চোখে পড়ে,
চর্চের দূতেরা চলে যুদ্ধবাহিনীর আগে-আগে।

—দিন্ সিয়াসৎ = রাষ্ট্রনীতি

য়ুরোপের দার্শনিককে প্রশ্ন করা দরকার,
—কেননা হিন্দুস্তান এবং গ্রীসও তার অনুসরণ করছে :
"তোমাদের সভ্যতার চরম কি এই যে পুরুষেরা চাকরি পায় না
আর মেয়েরা পায় না স্বামী ?"

—এক সওয়াল—এক প্রশ্ন

হে ভগবান, য়ুরোপীয় পলিটিক্‌স্ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ;
তবে তাদের শিষ্যেরা ধনী এবং বলবান।—

—সিয়াসৎ-ই-ফিরাঙ্গ্—য়ুরোপীয় পলিটিক্‌স্

শেষের ছত্রটিতে আশ্বাস দেবার উপায় অভিনব বটে।

ইকবালের মন দূরে সরে গিয়েছিল পশ্চিম থেকে। কিন্তু অন্তরের জ্বালা কোনোদিন নেবেনি। পূর্বদেশীকে বারেবারে বলেছেন, সাবধান, নিয়তপ্রসারী বিশ্বভুক্ সভ্যতার দ্রংষ্ট্রা হ'তে এখনো নিজেকে বাঁচাও ; লজ্জা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, আঘাত ক'রে যেমন ক'রে হোক তিনি শক্তি ফিরিয়ে দেবেন শক্তিহীনদের।

ভয় পেয়েছ তুমি জীবনের সংগ্রামকে
জীবনই মৃত্যু যদি তা হারায় সংগ্রামের স্বাদ।
নূতন শিক্ষায় ভুলেছ তোমার প্রবল সেই খ্যাপামি
যা জ্ঞানকে আজ্ঞা করত . কৈফিয়ত সৃষ্টি কোরো না।
বিদ্যালয় ঢেকেছে তোমার চক্ষে মর্মের সত্যগুলি
যা খোলা ছিল তোমার কাছে মরুভূমিতে, পর্বতে।

—মাদ্রাসা

সভ্যতা আজকে কারখানা প্রবঞ্চকদের,
শেখাও খ্যাপামির নীতি পূর্বীয় কবিকে।

—ফির্মান্-ই-খুদা—ঈশ্বরের আজ্ঞা

প্রবল উন্মুক্ত যথার্থ মানব-সভ্যতার কথা বলতেই আরব্য দিগন্ত জাগত ইকবালের চিত্তে, আহ্বান এসে পৌঁছত মরুবেষ্টিত মরূদ্যান থেকে। আধুনিক মন নিয়েই তিনি ফিরে যেতেন রৌদ্রপ্রখর প্রাচীন ইসলামীয় ইতিহাসে ; সেই ইতিহাস

বিশেষ ধর্মসাধনার এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তার ক্রিয়া বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্গত। নূতন তেজস্ক্রিয়তার বাণী তিনি শুনেছিলেন দূরে বেদুয়িনের তাঁবুতে, কারাভানের আদিম তাম্র-পার্বত্য পরিবেশে ; পথের উপরে প্রজ্বলিত স্বচ্ছ মরু-রাত্রির নক্ষত্র-দৃষ্টিতে।

ফিরে চলো তুমি আরবের কাছে।
তুলেছ ইরানী-বাগানে গোলাপ,
দেখেছ বসন্তের জোয়ার ইন্দোস্তানে ইরানে।
আস্বাদন করো এবার মরুভূমির তাপ,
পান করো পুরানো মদ খেজুরের।
বাসা বেঁধে রইবে কতদিন উদ্যানে ?
বাঁধো নীড় উঁচু পর্বতে
বিদ্যুৎ এবং বজ্রের মাঝখানে।
ঈগলের নীড়ের চেয়েও উঁচুতে।
যোগ্যতা হোক তোমার জীবনযুদ্ধের,
শরীর-আত্মায় জ্ব'লে উঠুক জীবনের আগুন ॥

—আস্‌রার-ই-খুদি

ঈগল পাখির উপমা তাঁর কাব্যে বারংবার দেখা যায়। শক্তির পাখায় তার গতি তেজের গগনে, বাসা তার রুক্ষ, হতাশ্বাসের বহু উর্ধ্বে তার নীলিম সঞ্চরণ। প্রাচীন আরব-সংস্কৃতির প্রতীক এহ ঈগল।

হোয়ো না নিরাশ, সেটা জ্ঞ নের অপমান।
মুসলমানের খাঁটি আশা চেনে ঈশ্বরকে।
তোমার বাড়ি নয় সম্রাটের প্রাসাদ-গম্বুজের তলে,
ঈগল তুমি, থাকবে পাথুরে-পাহাড়ে।

য়ুরোপীয় শক্তির প্রতীকরূপেও ঈগল তাঁব কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কচিৎ। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে :

তপ্ত করো রক্ত দাসদের, বিশ্বাসের আগুনে,
দুর্বল চড়ুইকে প্রবৃত্ত করো লড়তে ঈগলের সঙ্গে।

—ফির্‌মান্-ই-খুদা—ঈশ্বরের আজ্ঞা

সেই বিশ্বাসের আবাহন করছেন যার বলে দুর্বল পাখিও আকাশে উড়ে গিয়ে ঠেকায় শিকারী বাজপাখিকে।

মুসলিম ঐতিহ্যের স্মরণে স্বপ্নে, ভবিষ্যতের ছবিতে ইকবালের মন স্তরে-স্তরে অভিষিক্ত ছিল। উপমায় অনুশাসনে কল্পনায় তিনি তাঁর একান্ত পরিচিত অন্তরঙ্গ সভ্যতাকে তাঁর কাব্যে উদ্ভাসিত করেছেন। তিনি বলতেন, ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হোক, তারই গভীরে কবির চৈতন্য প্রবিষ্ট হলে বিশ্বাশ্রিত সত্যকে স্পর্শ করা যায়। য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি শেষের রচনায় কোনো চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করেছিলেন ব'লে জানি না, কিন্তু সেটা গভীরতার অভাবে নয়, অস্বীকার করবার ইচ্ছাতেই। মানব-সভ্যতার উপর তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিল, হয়তো ভেবেছিলেন ইসলামীয় আদর্শ যথার্থ বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারলে পশ্চিম-দেশেও পরিবর্তন ঘটবে। পূর্ব-দেশের কোনো উৎকর্ষকে তিনি আঘাত করেননি, ছোটো ক'রে দেখেননি। নিজ সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি নিয়ত সতর্ক ছিলেন, বারেবারেই তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতের শত্রু ব'লে ঘোষণা করেছেন। 'মুল্লা-ঔর-বহীস্ত' (মুল্লা ও স্বর্গ) কবিতাটি সকল ধর্মেরই সংকীর্ণ বক্তাদের পড়া দরকার; তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আশ্চর্য কবিতাসংগ্রহ "আর্‌মিঘান-ই-হিজাজ"[৯] (হিজাজের দান) অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি, বা আলোচিত হয়নি এটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। ১৯৩৬ সালে রচিত তাঁর উর্দু কবিতা 'ইবলিজ-কি মজলিস্‌-ই-সৌরাউ' (শয়তানের মজ্‌লিস্‌) বিদ্রূপাত্মক রচনার একটি চরম সৃষ্টিকাজ; তাতে আধুনিক নানা সমস্যাকে হাস্যের আলোয় জ্বালিয়ে দেখানো হয়েছে; কাউকেই তিনি বাদ দেননি[১০]। তাঁর আপন সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাসকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন ব'লেই সমালোচনার ভয় তাঁর ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিরোধকে তিনি লজ্জিত করেছেন প্রধানত বিরোধের অতীতকে প্রকাশ ক'রে, তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশলোকে সকলেরই প্রবেশাধিকার। ব্যতিক্রমের তালিকা প্রস্তুত ক'রে বিরুদ্ধ প্রমাণ হয় না, ইকবালের কাব্যের স্বরূপ দেখতে হবে। স্বধর্মের উপলব্ধিকে যেখানে তিনি

---

৯ হিজাজ—আরব্য দেশের পুণ্যভূমি।

১০ "দিন-ও-তালিম" (ধর্ম ও অনুষ্ঠান) কাব্যে বলেছেন—

"চিনি আমি ধার্মিক অনুষ্ঠানের সব পদ্ধতি; আন্তরিকতা যদি না থাকে অন্তর্দৃষ্টির দাবি মিথ্যা।" (১৯৩৭)

তর্কের অতীত সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেইখানে তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ, সেখানে তা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকে কোথায় ছাড়িয়ে গেছে।

শিশু-পুত্র জাওইদকে আশীর্বাদ ক'রে লেখা তাঁর গীতিকবিতাগুলিতে ইকবালের প্রচ্ছন্ন কারুণ্য যেন শানবাঁধানো পথের ধারে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিদ্রূপসজাগ বুদ্ধিকে এড়িয়ে ঊর্ধ্বে তুলছে মৃদু রঙিন কবিতার গুচ্ছ। কিছু কবিতা "গোলটেবিল বৈঠক" -এর সময়ে ইংলণ্ড থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন,[১১] বাকি কয়েকটি মৃত্যুর অনতিপূর্বে রচিত। এপিগ্রাম এবং ক্রুতরসাত্মক বাক্যের বাহনে যিনি রূপক ও তথ্যবহুল কাব্য লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর রচনায় এমনি ক'রে কখন একটি সহজ বেদনার বাঁশি বেজে উঠত, যাঁরা ইকবালের ধারালো কাব্যের দরজা থেকে ফিরে এসেছেন তাঁরা সেই স্বর শোনেননি। বিনম্র-সাধক কবি তাঁর পুত্রকে ডেকে বলছেন :

> খুঁজে নাও তোমার স্থান প্রেমের রাজ্যে,
> সৃষ্টি করো নূতন যুগ, নূতন প্রভাত, নূতন সন্ধ্যাগুলি।
> ঈশ্বর যদি দিয়ে থাকেন তোমায় প্রকৃতিকে বোঝবার চিত্ত,
> বিনিময় কোরো ট্যুলিপ-গোলাপের নীরবতায় তোমার অন্তরঙ্গিতা।
> আমার এ-পথ নয় ধনীর, গরিব মানুষেব পথ আমার ;
> বিকিয়ো না আপনকে, গরিব হয়েই হোক তোমার নাম।

নিজেকে তিনি অনেক সময় বলতেন মুসাফির, গান-গাইয়ে, আর কিছু নয়। ধন বা প্রতাপের পথ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কখনো মাড়াননি।

মিলের চুমকি-বসানো, অনুপ্রাসবহুল চকমকি ছন্দের জোড়া-জোড়া পদ-রচনার মাঝখানে গীতিকাব্যরসের পরিপূর্ণ আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর। ধরা পড়ত, ইকবাল শুধুমাত্র শিল্পদক্ষ পরিবেশধর্মী এমনকি স্বধর্মের শ্রেষ্ঠপ্রচারী কবি নন, সংকটযুগের দ্বন্দ্বকেই তিনি আশ্চর্য প্রকাশ করেননি, তাঁর প্রথম পর্বের সূর্যকাল শেষ পর্যন্ত অন্তরে অনাচ্ছন্ন ছিল, কাব্যের সূত্রে গাঁথা

১১ লণ্ডনে রচিত একটি কবিতায় বলেছেন—

> "য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে হোয়ো না ঋণী,
> গড়ো তোমার পানপাত্র হিন্দি মাটি দিয়ে।"

—জাওইদ-কে নাম

এখানে "ঋণী" কথাটিকে যথার্থ বোঝা চাই।

হয়েছিল তারই অম্লান রাগিণী। আসন্ন দুর্যোগের পারে মুশকিল আসান্ -এর বাণী তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু ঝড়ের দোলায় তিনি ভয় করেননি ; তাঁর কাব্যতরী ঘাটে এসে নোঙর বেঁধেছিল পশ্চিমী আসন্নতায় নির্ভয় দেবার জন্যে। তাঁর কাব্যকে দেখে শেষ পর্যন্ত চেনা যেত তার গড়ন দূর-উজানী, তাতে ছুঁয়ে আছে উত্তাল দিগন্তরেখা।

তীব্র অশান্তির মধ্যে ইকবাল শান্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। একটি ছোটো কবিতা এখানে উদ্ধৃত করি :

গেলাম শেখ-ই-মজাদিদ্ -এর সমাধিতে,
সেই স্থানে যা আকাশের তলে আলোয় ভরা।
নক্ষত্রগুলি পর্যন্ত সেখানে ধূলিকণার কাছে লজ্জিত,
গুণী শুয়ে আছেন যে-ধূলিতে নিদ্রিত।

—যুকার-ও-সাকিয়াদ

ইকবাল-কাব্যের নতুন প্রসঙ্গ

কাব্যের বিচারে অস্ফুট কীটদষ্ট কোরক অথবা বিকৃত পত্রাবলীর সাক্ষ্য বর্জন ক'রে শাখার প্রান্তে প্রচ্ছন্ন একটি সুন্দর ফুলের অভাবনীয় পরিচয় দেওয়াই প্রশস্ত। কবি ইকবালের কাব্যকাননে বিচরণ করলে সৌরভী কুঞ্জ দেখতে পাব, খররৌদ্র ধূলিতে শ্যামলচ্ছায়া মেলে আছে; অগণ্য মনোহর বীথি আহ্বান ক'রে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যের ভঙ্গি, রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্তদৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তাঁর বহু কবিতায় উপকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম ক'রে সর্বমানবের চিত্তচারী। তাঁর কাব্যে রাষ্ট্রিক মতামতের কাঁটা-বেড়া দেখা দিলেও প্রতিহত হয় না, কাণ্ডের শুষ্ক বক্রতা লঙ্ঘন ক'রে উঁচু ডালের কম্পমান পল্লবলোকে পৌঁছনোর সাধনা পাঠককে মানতেই হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শরীর ও মনের আকস্মিক কারণবশে ইকবালের রচনায় বাধাবিঘ্নতার নানা কণ্টক ছড়িয়ে আছে, তাঁর প্রতিভার অসমতা মনকে অপ্রত্যাশিত আঘাত করে। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষতম অধ্যায়ের অচির পূর্ববর্তী রচনাকাল সম্বন্ধেই এই কথা বিশেষ প্রযোজ্য। প্রতিভার অরুণপর্বে তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় কবি। বেদমন্ত্রের স্পর্শ লেগেছিল তাঁকে, কোরানের আজান যেন চলেছে গীতাধ্যয়নেরই পর-প্রকোষ্ঠে; মন্দির মসজিদ, শিখ সুফী দরবেশ ব্রাহ্মণ স্থান পেল তাঁর গীতিকবিতার সুন্দর আসনে। কবিতা লিখেছেন স্বামী রামতীর্থের উপরে, শিখগুরু নানক সম্বন্ধে; মুসলমান সন্ত-সাধকের প্রসঙ্গ স্বভাবতই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হয়েছে। একদা ইকবালের মুখে শুনে-ছিলাম, তাঁর প্রথম কবিতার বইটিতে তিনি যে ভূমিকা লেখেন শ্রেষ্ঠ প্রেরণার অর্ঘ তাতে দেওয়া হয় ভগবদ্গীতার উদ্দেশে। বিশেষ এক-জাতীয় মোল্লা মৌলবীর আক্রমণে তিনি পরবর্তী সংস্করণে সেটি রাখতে পারেননি। বলেছিলেন, আজমগড়ের লাইব্রেরিতে প্রথম সংস্করণ আছে, পড়ে আসুন। নিজের দুর্বলতার স্মরণে ব্যথিত হয়ে তিনি মৃদুকণ্ঠে যোগ করেছিলেন, "ইকবাল বেঁচে নেই। ইকবাল মৃত।" তিনি দীর্ঘ জীবন রক্ষা ক'রে আবার সত্য পরিচয় দেবেন এই প্রত্যাশা জানালাম, কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন। শেষের কিছুকাল তিনি আবার সেই সর্বভারতীয় দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন, কয়েকটি অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রোজ্জ্বল

তাঁর কবিতায় সেই পরিচয় রয়ে গেল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। সায়ং-সন্ধ্যার প্রান্তে তখন রাত্রির যবনিকা, ইকবাল দীর্ঘ রোগশয্যায় জীবন্মৃত, বিশেষ একটি রাষ্ট্রিক দলের কাছে তিনি প্রাত্যহিক জীবিকার জন্য আপাদমস্তক বিক্রীত নির্ভরশীল। বলতেন, দলকে বলেছিলাম তোমাদের মতামতে আমি বিশ্বাসী নই, আমি কবি। দলপতি উত্তর করলেন, তোমার বিশ্বাস চাই না, তোমার নাম চাই; বিপদকাল এসেছে দলের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবি ইকবাল বললেন, "আমার নাম দিয়েছি। ইকবাল বেঁচে নেই। ইকবাল মৃত।"

কিন্তু ইকবাল অমর। যে-পরিচয়ে তাঁর সৃষ্টিকাব্যের শীর্ষতা তা দুর্বল শরীর-মনের অবান্তর প্রসঙ্গ এমনকি কাব্য-বিরোধী প্রভাবকে অতিক্রম করে ভাস্বর হয়ে রইল। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত "আর্মিঘান-ই-হিজাজ" কাব্যগ্রন্থে মানবিক বোধান্বিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা বেরিয়েছিল, আজও তার পরিচয় বৃহত্তর ভারতবাসীর কাছেও অগোচর বললেই হয়,— বাহিরের জগতে কোনো বার্তাই পৌছয়নি। সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ক'রে রেখে ইকবালকে যাঁরা বিশ্বের বাহিরে রাখতে চান তাঁদের দায়িত্ববোধ ক্ষীণ বলতে হবে। কেবলমাত্র যে-কবিতাগুলি সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক তারই ব্যাখ্যান শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে ইকবাল মুসলমান কি হিন্দু অথবা ভারতীয় নন, তিনি এসিয়ার কবি বললেও যেখানে তাঁর মানবিকতাকে ক্ষুদ্র করা হয় তার তর্জমা কৌথায়? ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের যাঁরা এই আশ্চর্য কবি-প্রতিভার সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর মতামত-সংবলিত ছন্দোবদ্ধ রচনার বাহুল্যে প্রতিহত বিমুখ হয়েছেন তাঁরা বলবেন, অনুরূপ কবিতা যদি বা থাকে তো সেগুলি ব্যতিক্রম। সম-সাম্প্রদায়িক ইকবালভক্ত অনেকে বলবেন, উদার মানবিক কবিতা যাকে বলো সেইগুলিই ব্যতিক্রম; তাতে তাঁর শ্রেষ্ঠতা নেই। দৈবাৎ যদি আধুনিক কোনো কবি ইকবালের 'ইব্লিস কি মজলিস্-ই-সউরার' ('শয়তানের মজলিস্') কবিতাটির সন্ধান পান তাহলে নূতন ইকবালের আবির্ভাবে বিস্মিত হবেন। কাব্যজীবনের শেষ পর্যায়ে ইকবালের মানবধর্ম হাস্যোজ্জ্বল নির্ভয়বাদিতার প্রমাণ দিয়েছিল, তার এমন মনোগ্রাহী উদাহরণ আর কোথায়? কবিতাটিতে ছন্দোবদ্ধ কথোপকথনের ছলে বর্তমান যুগের ধনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধার্মিক উগ্রতা প্রভৃতি বিপদগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা আছে; সবার উপরে উড্ডীন নূতন জাগ্রত মানবধর্মের নিশান। মুখ্যত ইসলাম ধর্ম ও সমাজকে লক্ষ করে কবিতা গঠিত, কিন্তু এই কাব্যের তাৎপর্য সকলেরই অবাধ-গ্রহণীয়। শ্রেষ্ঠতার একটি প্রতীক-

রূপে যে লোভহীন, আদর্শিক, ত্যাগ-ভূষিত ইসলামের সর্বধর্মপ্রেমশীলতার বাণী এই গভীর লীলাকৌতুকী কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা যথার্থই অভিনব। পারিষদ-পরিবৃত স্বয়ং শয়তান বলছেন, ভয় কোরো না, আধুনিক জগতের এই-সব ব্যাপার আমারই সৃষ্টি। আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ শিখিয়েছি য়ুরোপীয়ানকে, গরিবকে করেছি অদৃষ্টবাদী, জন্ম দিয়েছি ধনিক-সভ্যতার— কে পরাজিত করবে আমাদের? প্রধান পারিষদ আশঙ্কিত প্রশ্ন করলেন, এখন যে আমাদেরও বিপদ। জানি আপনি শিখিয়েছেন গরিবদের অদৃষ্টবাদ, মোল্লা এবং সুফীকে করেছেন সাম্রাজ্যবাদীদের গোলাম, তাদেরই ক্রীতদাস। ঠিকই হয়েছে, পূর্ব-দেশীয়দের যোগ্য এই আফিম সেবন। যদি-বা মুসলমান হজ করতে যায় তাতে বিপদ নেই, কেননা তাদের আত্মা আজ মরচে-পড়া।

দ্বিতীয় পারিষদের প্রশ্ন, পৃথিবীতে যা ঘটছে সবই জানেন আপনি। এই যে ডেমোক্রাসির জন্যে দাবি, এটা কী ব্যাপার?

ভয় নেই, উত্তর দিলেন শয়তান। ইম্পিরিয়লিজ্‌ম্‌কে আমরা সাজ পরিয়েছি ডেমোক্রাসির। রিপাব্লিক হোক আর পারস্য রাজ-দরবারই হোক, একই কথা। জনগণের অধিকার যে-ই গ্রাস করে প্রভুত্বের প্রকৃতি তার একই। দেখছ না য়ুরোপীয় গণতন্ত্রগুলির পরিচয় বাহিরে ঝকঝকে, অন্তরে জেঙ্গিস খাঁর চেয়েও অন্ধকার।

তৃতীয় পারিষদ আশ্বস্তি জানিয়ে বললেন, ডেমোক্রাসির জন্যে পাগল হয়েছে পৃথিবী, এতে ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু এই যে সোশালিজম্ -এর নতুন রূপ দেখছি এর প্রতিকার কোথায়? ইহুদি কার্ল মার্কস হলেন পথপ্রদর্শক কালিম, অথচ তাঁর হাতে নেই আলো, তিনি হলেন ক্রুশ-নেই-এমন যিশুখৃষ্ট। ধর্মগুরু তিনি নন, কিন্তু তাঁর আছে গ্রন্থ। ক্রীতদাসেরা পরাজিত করেছে প্রভুর দলকে, এর চেয়ে ভয়ানক বিদ্রোহী বাণী আর কিছু তো কল্পনা করা যায় না।

চতুর্থ পারিষদ বললেন, ভয় করি না আমরা ইহুদি ব্যক্তিটিকে— তার পাণ্টা ওষুধ বার হয়েছে রোমের প্রাসাদে। দেখো না, রোমের নূতন দরবারে জেগেছে পুরোনো রোমের সম্রাটত্বের স্বপ্ন। (ফ্যাসিজম্ হ'ল শয়তানের সৃষ্টি, কম্যুনিজ্‌ম্‌কে নাশ করবার জন্যে।)

তৃতীয় পারিষদ মাথা নাড়লেন। তিনি নব্য রোমজাতির দূরদর্শিতার

অভাব সম্বন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করে বললেন, তারই ঔদ্ধত্য সমগ্র য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের ভিতরকার কথাটাকে জগতে রাষ্ট্র করে দিল যে।

পঞ্চম পারিষদ শয়তানকে উদ্দেশ ক'রে দীর্ঘ প্রশস্তি জানালেন, তারপর তাঁর নিবেদন। হে শয়তান, আর-যে য়ুরোপীয় জাতগুলির উপর নির্ভর করা চলে না আমাদের। তারা তোমার শিষ্য সে-কথা সত্য, কিন্তু পৃথিবীর মনই বদলিয়ে দিয়েছে ঐ বিদ্রোহী ইহুদি চিন্তানায়ক। আসন্ন বিপদ এল বুঝি, ঐ দেখো ভয়ে কম্পিত হচ্ছে মরু-প্রান্তর, নদী-পর্বত, এই প্রসারিত পৃথিবীর সর্বত্র। হে গুরু, দুনিয়া ভর করে আছে তোমার নেতৃত্বের উপর, সবই কি যাবে ধ্বংস হয়ে ?

মা ভৈঃ, বললেন শয়তান। ডেমোক্রাসি বা নূতন সোশালিজম্ কী করতে পারে। খেপিয়ে তুলব যখন সারা য়ুরোপকে, দেখবে পরস্পরের মধ্যে ওরা কোন্ কাণ্ড বাধায় (আসন্ন মহাযুদ্ধের উল্লেখ।) কোথায় থাকবে তাদের ধর্ম-যাজক আর তাদের রাষ্ট্রনেতার দল! হোঃ— এই এক শব্দে দেব তাদের উড়িয়ে। কিন্তু আমার ভয় সেই জাতিকে যারা ছাই হয়ে গিয়েও আজ পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখেছে প্রাণের বহ্নি। এখনও সেই ধর্মবিশ্বাসীর দলে এমন বহু মানুষ আছে যারা চোখের জলে ভোরের প্রার্থনা সুরু করে। ওয়াজু হ'ল তাদের দুঃখের দ্বারা প্রত্যহ শোধিত কৃত্য। নূতন যুগে ভয় হ'ল তাদের কাছে, অন্য কোনো বিদ্রোহকে নয়। এই জাতি হ'ল ইসলামী।

জানি, মুসলমান আজ কোরান অনুসরণ করে না, তাই তাদের হাতে তত ভয় নেই শয়তানের রাজ্যে। তারাও ক্যাপিটালিস্ট্ হয়ে আছে অন্যদের মতো। জানি, যে হারেম -এর প্রভু সে আজ অন্ধকারের শিষ্য। পূর্ব-দেশের তিমিরে তাদের হাতে নেই প্রদীপ। কিন্তু আমার মনের আশঙ্কা জানাই তোমাদের— নূতন যুগে ইসলামের চিরন্তন কানুন আবার দেখা দেবে উজ্জ্বল হয়ে। সেই ইসলামের নীতি হ'ল নারীদের সম্মান বাঁচানো, মানুষকে চরম সাধনায় ব্রতী করা, তৈরি করা বীরের দলকে। সব ভৃত্যতন্ত্রের মৃত্যু আছে তারই হাতে।

তার রাজ্যে থাকে না রাজা, থাকে না পুরোহিত। ধনের পাপ সে করে দূর, ধনী হয় সেবক, সর্বজনের ধনরক্ষক। এতবড়ো বিপ্লবী ঘটনা কোথায়,— তারা জানে জমির অধিকার ঈশ্বরের এবং মানুষের, রাজার নয়। পৃথিবীর চক্ষুর অন্তরালে থাকুক এই ধর্ম, কেউ না খবর পাক, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আশার কথা এই যে, মুসলমানেরা পর্যন্ত ঐ ধর্মে বিশ্বাস অনেকটা হারিয়েছে।

আহা, তারা যেন ধর্মতত্ত্বের ব্যাখানে বিবৃতিতেই আপাদমস্তক জড়িয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা যেন কেবল আল্লার বাণীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-প্রচারে ব্যবসায়ী হয়।

ইকবাল সর্বধর্মের মহান ভূমিকায় যে-ইসলামের পরিচয় দিলেন তা যেমন আদর্শিক, তেমনি ব্যবহারিক জগতের প্রসঙ্গতায় নবীন সমুজ্জ্বল। মিলনমন্ত্র আছে তাঁর ইসলামী বাণীতে শুভকর্মের প্রেরণায় ; এই ধর্ম মানবের সর্বোত্তম প্রত্যহ সাধনার সহায়ক। কবিতাটির শেষে শয়তান বলছে, তার শয়তানী রাজ্য রক্ষা হবে না যদি পবিত্র ইসলাম ধর্ম কলহ ঈর্ষা ত্যাগ করে। বৃথা তর্ক ও অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা উত্তীর্ণ হয়ে তার প্রকৃত রূপে দেখা দিলেই শয়তানের বিপদ। শয়তান চায় ধর্মবিশ্বাসী কেবল অভ্যাসের মতো ঈশ্বরের নাম নেয়, বা সন্ন্যাসী হয়ে ব'সে থাকে, কর্মের শুদ্ধমার্গে উত্তীর্ণ হয়ে ধ্বংস না করে শয়তানের রাজ্যকে।

বলা বাহুল্য, যে-মানস নিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠ ধ্যান ও কর্মকে ইকবাল অশ্রু-সজল কৌতুকে এবং রুদ্র হাস্যে ব্যক্ত করলেন তা সকল মানুষেরই ধর্মসংগত। কোথাও ক্ষুদ্রতা বা অমঙ্গলের ছায়া নেই তাঁর শুভ্রদৃষ্টির স্বচ্ছতায়। রাষ্ট্রিক মতামত এবং দলের উর্ধ্বে যে-ইকবালকে পাওয়া যায় তাঁকে আজ জানবার সময় এসেছে।

১৯৩৬ সালে রচিত যে-কবিতার সারাংশ উপরে দেওয়া গেল তার সমধর্মী ভাব পূর্বযুগের নানা কবিতায় ইকবাল প্রকাশ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, বেরিয়ে এসো তোমাব মুক্ত অঙ্গনে, এসো, সকল অভ্যাস-কৃত্যের বাহিরে আমরা গড়ি নূতন ধর্ম, মানবধর্ম। সেই কবিতাটি চিরস্মরণীয়।

> এসো, সকলে তুলি ধর্মের চূড়া যেন উর্ধ্ব আকাশকে স্পর্শ করে।
> প্রতি প্রাতে উচ্চারণ করি মন্ত্রম্।
> সবাই আমরা ভক্ত, প্রেমধারা করি পান,
> শক্তি ও শান্তি মিলুক আমাদের গানে।
> পৃথিবীতে মানুষের মুক্তির পথ চিরদিন এই প্রেমে।

এই সর্ব-মানবিকতার কবি ইকবাল একদিন স্বামী রামতীর্থের মৃত্যু উপলক্ষে লিখেছিলেন— "তুমি ছিলে মুক্তা, এখন আরো অমল উজ্জ্বল মুক্তা তুমি অনন্তের সমুদ্রে।" গূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব এই কবিতাটির ছত্রে-ছত্রে নিহিত। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যে-দৃষ্টি নিয়ে ইকবাল এই অর্ঘ রচনা করেন তারই ধ্বনি পাই তাঁর শেষজীবনের বহু কাব্যে।

'মানুষ ও ভগবান সমাচার' নামক কবিতাটিতে সৃষ্টিকারী চিরন্তন মানবের মাঙ্গল্য বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশের প্রণালী বিশিষ্ট ইকবালীয়।

ঈ শ্ব র

একই মাটিতে জলে আমি বানালাম বিশ্ব,
তুমি ভিন্ন ক'রে নাম দিলে ইরান, তাতার দেশ, জাঞ্জিবার।
মৃত্তিকার অণুকণা দিয়ে আমি বানালাম লৌহ,
তুমি তাই দিয়ে তৈরি করেছ যত তরোয়াল, তীর আর বন্দুক।
বাগানের গাছ কাটবার জন্যে তুমি বানালে কুড়োল,
আর যে-পাখি গান করে তার জন্যে খাঁচা।

মা ন ব

তুমি তৈরি করেছ রাত্রি, আমি তো জ্বেলেছি আলোক।
মাটি তোমাব, তাই দিয়ে রচলাম পান-পাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি, পর্বত, অরণ্য ;
আমার হ'ল তৈরি ফুলের কানন, গোলাপ, ফলের বাগান।
আমি সে, যে 'পাথর'কে ক'রে দেয় আয়না,
বিষ হতে যে বানায় মধু।

মানবত্বের ডাক দিয়ে তিনি গেছেন সম্মুখের পথে। মুসলমান ধর্মের উৎকর্ষ-ব্যাখ্যাতা তিনি। তাঁর যে-কাব্যে মানব-মিলনের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি ভাষার মহিমায় হৃদয়শীল সৌন্দর্যে উদ্ভাবিত হয়ে প্রকাশ পেল সেই সৃষ্টিগুলি বাংলা ভাষায় পরিচিত হবে এই আশা ক'রে রইলাম।

ভাই বীরসিং

ভাই বীরসিংকে তাঁর আপন পরিবেশে দেখতে হয়। নিভৃতবাসী অথচ অক্লান্ত-কর্মী এই শুভ্রকেশশ্মশ্রু দীর্ঘকায় সৌম্যশ্রী পুরুষকে অমৃতসরের স্বর্ণচূড় গুরুদ্বার এবং ভজনের দেবত্রের সঙ্গে জানা চাই; খাল্‌সা সংগঠনের বীর্য-প্রসঙ্গকেও বাদ দিলে চলবে না। সন্ত-কবির মতোই তাঁর চেহারা; মুখে তাপসিক ভাব, প্রসন্ন দীপ্তি তাঁকে ছুঁয়ে আছে। শিখ ধর্মসাহিত্যের মূল একটি ধুয়ো, অন্তরে রং লাগাও; সেই রঞ্জনের কবি ভাই বীরসিং। কিন্তু বাহিরে তাঁর নিরঞ্জন বিরলবাক্ মূর্তি মনকে টানে। বোঝা যায় যে-কবির চিত্তে সপ্তবর্ণের ঐশ্বর্য বিকশিত, তাঁর রচনার ছন্দ স্থমিত এবং ভাষা কঠিনমধুর হতে বাধা নেই।

বাতাবি লেবুর ফুলে-ভরা তাঁর বাগানে প্রথমবার তাঁকে দেখলাম; মনে হ'ল এসে পৌচেছি। মহাপুরুষের সামীপ্যে গম্যস্থানে আসার পূর্ণ অনুভূতি মনে জাগে, যেন পথের একটি সমাপ্তিস্থান এইখানে। মহাযাত্রার পর্বে শান্ত হয়ে দৃষ্টি গ্রহণ করো। পঞ্জাসাহিবের হ্রদমন্দির হতে কপুরতলা ঝিন্দের ছোটো বসতি পর্যন্ত নানা সন্তসভায় শিখ দরবারে ভাই বীরসিং- এর নাম শুনেছিলাম; হঠাৎ লাহোরের কোনো শিখ বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখেছি বিশেষ আয়োজন, পুরুষ-মেয়ের গায়ে বাসন্তী-গৈরিক পরিচ্ছদ, সেদিন তাঁদের চলছে ভাই বীরসিং উৎসব। কিন্তু ভাষার বাধা এবং অক্ষরের পরিখা পার হয়ে সাধকগুরুর কাছে পৌছতে পারিনি।

ভাই বীরসিং যদি আণ্ডেস্ পর্বতের ওপারে থাকতেন তাহলেও বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে তাঁর দূরধিগম্যতা বাড়ত না; গুরুমুখী হরফের আড়ালে তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রতিবেশী। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো দূরত্ব আধুনিক নানা-প্রদেশীয় প্রকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের নিরুৎসুক মন। অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্র সম্পর্কে তপ্ত বৈদেশিক বাক্য আমাদের চেতনাকে ক্ষণকাল উত্তেজিত করে, কিন্তু অখণ্ড-

---

এই প্রবন্ধের তথ্যসংগ্রহে অধ্যাপক বন্ধু তেজা সিং এবং শিখসম্প্রদায়ের বহু সুধীজনের সহায়তা পেয়েছিলাম। ত্রুটি-ভ্রান্তির জন্য দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। কবিতা-তর্জমায় যাথার্থ্যবোধ এবং শিল্পজ্ঞান ব্যবহার করতে চেয়েছি, কিন্তু গুরুমুখী অক্ষরে লিপিবদ্ধ পঞ্জাবি ভাষা হতে রূপান্তর-কাজে অনেকস্থলে প্রতিবাক্যের স্থলে ভাবার্থই দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ভারতী মানস, যার দ্বারা ভারত-সভ্যতার সঙ্গে বিশ্বযোগ সম্ভবপর, তা আমাদের নূতন-যুগ-ভাবিত চিত্তে এখনো পৌঁছয়নি। স্বাদেশিক সংস্কৃতি-বিষয়ে বাঙালী সাহিত্যিকের অপ্রসারী মনোভাব সেদিন শিখ সাহিত্যগুরুর কাছে গিয়ে অনুভব করলাম; বুঝলাম আজও ভারতভবিষ্যের দ্বারে দাঁড়িয়ে আমরা অপ্রস্তুত। খুব সম্প্রতি আমাদের বাংলা কাব্যে প্রাতিবেশিক শিল্পপ্রভাব দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখনো আমরা স্ব-ভাষার বাহিরে যেতে হলেই সমুদ্রপার হবার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারিনি। বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র প্রতিষ্ঠিত প্রাণবন্ত করবার একটি উপায় তাকে সমসাময়িক ভারতীয় মৃত্তিকায় সংশ্লিষ্ট করা এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দুই

ভাই বীরসিং জন্মগ্রহণ করেন অমৃতসরে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। তাঁর পিতা ডাক্তার চাবণ সিং লেখক এবং শিখশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সমস্ত পঞ্জাবে তিনি সুখ্যাত ছিলেন; মাতৃবংশও জ্ঞানগরিমায় শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চস্থানীয়। পিতাব কাছে বীরসিং গভীর সাহিত্যলিপ্সা গ্রহণ করেন এবং দুই বংশের পূর্বতনদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পান ধর্মপ্রবণতা। সাধনার এই যুগ্মধারা তাঁব রচনায় প্রবাহিত হয়েছে। কাব্য এবং ব্যাখ্যান দুয়ের বন্ধন সব লেখায় সার্থক রূপ পেয়েছে তা নয়, কিন্তু যেখানে তাঁব প্রেরণার উৎস স্বতঃস্ফূর্ত সেখানে সৃষ্টিজলেব অপূর্ব নির্মলতা আমাদের মনকে আহ্বান করে। বোঝা যায়, ধর্মকাব্য বিশেষ উদ্দেশ্যব্রতী হলেও শিল্পীর হাতে তা কাব্যধর্মের প্রতিকূল নয়। গ্রন্থ্-সাহিবেব বহু অংশেই তার প্রমাণ আছে। নানকপন্থী পরিবারে ভাই বীরসিং শৈশব হতেই গীতোচ্চাবিত শ্লোকের পরিমণ্ডলে বড়ো হয়েছেন এবং দোঁহা রচনায় বিভিন্ন মুসাইরা-সংসদে তিনি যোগ দিতেন। অথচ চতুর্দিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র-সম্প্রদায়ের চাপ তাঁকে বাল্যকালেই শিখসামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সত্যসন্ধ কবির প্রগাঢ় মানবিকতায় এই দুই প্রভাবের সমন্বয় দেখতে পাই; কোনোদিন তিনি দ্বেষণের পথে কলম চালাননি, কিন্তু পঞ্জাবি উৎকর্ষের একটি বড়ো ধারাকে কল্পরাষ্ট্রিক বিলুপ্তির গহ্বর হতে রক্ষা করেছেন। যাঁরা সাম্যের নামে সমীকবণ প্রচাব করতে উদ্যত, এবং বিশেষ কোনো উগ্ররাষ্ট্রিকদলের আধিপত্যে পঞ্জাবকে এবং অন্যান্য প্রদেশকে সমর্থন ক'রে, খণ্ডনবিলাসী নব্যতন্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষে শান্তি চান তাঁরা শিখ-কবির লেখায় সহযোগী ভারতের যথার্থ আদর্শিক রূপ প্রত্যক্ষ করুন। স্বভাবত বীরসিং প্রথম তিন শিখগুরুর পথচারী;

গুরু অর্জুনের শান্তিধর্মাশ্রিত লোকোত্তর কল্যাণ-সাধনা এবং সাহিত্যশিল্পের সংরক্ষণ-সঞ্জীবনে তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ বিশেষভাবে বীরসিংকে দীক্ষিত করেছে, কিন্তু দশম গুরুর আত্মরক্ষানিষ্ঠ রুদ্র স্বরাট্রবিধানেও তিনি কর্মপথের উদ্দীপনা পেয়েছেন। হিন্দু-শিখ-ইসলামের উৎকর্ষজাত বৈচিত্র্য রক্ষা করেই যাঁরা ভারতীয় ঐক্য-সাধনাকে নবযুগে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন, তাই বীরসিংকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সমাসনে স্থান দিতে হবে।[1]

পড়াশোনায় বীরসিং কৃতী ছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্বর্ণপদক পান, কিন্তু পরীক্ষা-পাশে তিনি বাঁধা পড়লেন না। বই মুখস্থ না করে তিনি নামলেন বই ছাপানোর কাজে; কলেজের পড়া ছেড়ে ঢুকলেন ছাপাখানায়। আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্র ওয়াজির-ই-হিন্দ্ প্রেস নামে অমৃতসরে দেখা যাবে। কিছুকাল পরে বন্ধু সহযোগে তিনি প্রকাশকের কাজ নিলেন; খালসা-ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিকা সমিতি (সমস্ত উত্তর-ভারতে প্রসিদ্ধ Khalsa Tract Society) তাঁরই সৃষ্টি; তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। পঞ্জাবি সাহিত্যে এই সমিতির প্রভূত দান এখনো বন্ধ হয়নি এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীর শিখ ঐতিহ্য তার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বীরসিং -এর প্রথম রচনার অধিকাংশ ঐ সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে বীরসিং "খালসা সমাচার" নামে প্রথম গুরুমুখী অক্ষরে ছাপা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন; সেই পত্রিকা এখনো পঞ্জাবের অন্যতম মুখপত্র। পরবর্তী তাঁর জীবনের ইতিহাস অক্লান্ত সাহিত্য-রচনায় গ্রন্থিত হ'ল; কাব্য নাটক, এবং ধর্মরাষ্ট্রিক বিবিধ আলোচনার মধ্যে দিয়ে পর্বে-পর্বান্তরে তাঁকে পাওয়া যাবে। খুব সংক্ষেপে তাঁর মূল গ্রন্থগুলির পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

---

১ "বিজলিয়ান-দে-হার" (বিজুলির হার) কাব্যগ্রন্থে 'কুতব-দে-লাঠ' কবিতায় তাঁর সহযোগী মানসের অনেক উদাহরণ রয়েছে। কুতব-মিনারের প্রাচীনতর নাম কুতব-দে-লাঠ, অনেকেরই মতে আকাশদূতী তন্বী ঐ স্থাপত্যশিল্পসৃষ্টি হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় সাধিত হয়েছিল। পৃথ্বীরাজ এবং কুতবুদ্দীন দু-জনেরই নাম এর সঙ্গে যুক্ত।— প্রামাণিক তথ্য জানি না। কবি বলছেন:

> কুতবনামে জানি তুমি আরব্য [সেমেটিক], লাঠ হ'ল হিন্দুচূড়ার নাম;
> কী অপরূপ তোমার দীর্ঘতা দেখল ভারতবর্ষ।
> তোমার আত্মস্ত যাই হোক
> অনন্ত তুমি ভারতীয়।
>
> জাতি প্রজাতি আরম্ভ শেষ কে চায় খবর,
> সুন্দরকে যে-ই দেখেছে সেই জানে সে তার।

কিন্তু এইখানে বলা দরকার, ভাই বীরসিং -এর সৃষ্টিকাজ সাহিত্যসাধনার চেয়েও বিস্তৃত ক্ষেত্রে পর্যবসিত। সমস্ত পঞ্জাবি সমাজ এই কল্যাণকর্মী পুরুষের প্রতিভায় অগণ্যবিধ উপায়ে সমৃদ্ধ হয়েছে; তাঁর চরিত্রের প্রভাব নূতনতর সামাজিক আবর্তনেও জাতীয় ভিত্তিস্থলে র'য়ে গেল। প্রধান খালসা দিওয়ান, এবং অমৃতসরের খালসা কলেজ ভাই বীরসিং -এর প্রভূত সাহায্যে এবং প্রচ্ছন্ন অস্খলিত সেবায় আজ এত বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রাচীনপন্থী ধ্যানী কবি ও গদ্য-লেখক পুরাণসিং[২] এবং পরবর্তী পঞ্জাবি কবি ধনীরাম দু-জনেই বীরসিং -এর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। ইনিই তাঁদের মাতৃভাষায় সাহিত্য-রচনার পথে প্রবৃত্ত করেন; স্বধর্মের অনুপ্রেরণা দেন।

১৮৯৭ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত বীরসিং প্রধানত গদ্য গ্রন্থ-রচনায় নিযুক্ত ছিলেন; তার মধ্যে "সুন্দ্রি", "বিজই সিং", এবং "সত্যন্ত্ কৌর" এই তিনটি উপন্যাস সুপ্রসিদ্ধ। শিখ পুরাবৃত্ত এবং বীরধর্মী উপাখ্যানকে তিনি গল্পচ্ছলে প্রকাশ করায় জনচিত্তে নূতন উদ্দীপনা জেগেছিল। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গদ্য-রচনা ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালে বেরোয়। পদ্য-রচনাতেও তাঁর সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টির যুগ বোধহয় ঐ ছয় বৎসর; সাহিত্যের অনন্যসাধনায় তখন তিনি পূর্ণ-শক্তি নিয়োগ করার সুবিধা পেয়েছিলেন। তারপর থেকে চতুর্দিকের নানাবিধ দায়িত্ব প্রবল হয়ে উঠল। "সুভগজি-দা-সুধার" তাঁর উপন্যাসের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব'লে পরিচিত। 'কলগিধর চমৎকার' (গুরুগোবিন্দ সিং -এর আশ্চর্য কীর্তিগাথা) এবং 'গুরু নানক চমৎকার', এই দুইটি ঐতিহাসিক গল্পে তিনি বহু তথ্যকে মিলিয়ে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় চরিত্রচিত্রাবলী রচনা করলেন; তার রং যেমন ভাস্বর, রেখার দৃঢ়তাও তেমনি বিস্ময়কর। ১৯২৫, ১৯২৬ এই দুই বছরে মহা-জীবনী লেখা শেষ করে তিনি ১৯২৭-এ "সত্যন্ত্ কৌর" গ্রন্থের শেষ ভাগ সমাপ্ত করেন। এই উপন্যাসটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী শিখ সমাজের তীব্র অগ্নিপরীক্ষার বিবরণ আছে। সন্তোখ সিং -এব রচিত শিখজাতির ইতিহাস ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে

---

২ এই সাধক-কবির পরিচয় তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ *"Nargas"* এবং *"Sisters of the Spinning Wheel"*-এর রচনাসংগ্রহে পাওয়া যাবে। শেষোক্ত বইয়ে গ্রন্থ্-সাহিব এবং শিখ জনকাব্য, ভজন, লোকগাথা হতে তরজমা আছে। পুরানসিংকে গভীর জ্ঞানী বা সুন্দরস্রষ্টা বলে মনে করি না, কিন্তু তিনি বহির্বিশ্বের কাছে শিখ সাহিত্য পৌঁছে দিয়েছেন এটা তাঁর বড়ো কৃতিত্ব। Grace এবং Ernest Rhys -এর দীর্ঘ ভূমিকায় এ-সম্বন্ধে চিত্তপ্রদ আলোচনা আছে। কিন্তু Macauliffe হলেন শিখ ধর্ম ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নাকর, তাঁর *Sikh Religion* এবং অন্যান্য বইয়ের ভাণ্ডারে চিরকালের ঐশ্বর্য সঞ্চিত আছে। ভারতীয় উৎকর্ষের সন্ধানীকে সেখানে আসতে হবে।

বেরোয় ; সেই গ্রন্থটির নূতন সংস্করণ প্রকাশনের ভার নিলেন কবি বীরসিং। সম্পাদকীয় ভূমিকা ও টীকাভাষ্যে তাঁর প্রগাঢ় মননশীল অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকল্পনাশক্তি যাথাতথ্যতোঽর্থান্ বিহিত হ'লে সূক্ষ্মতর সৌন্দর্য-রূপ দেখা দেয়, বীরসিং- এর লেখাই তার প্রমাণ।

অমিত্রাক্ষর পদ গ্রন্থ্-সাহিবে ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ভাই বীরসিং এই রচনাবিধি প্রথম শিখ সাহিত্যে স্থচল করেন। "রাণা সুরৎ সিং" তাঁর রচিত দীর্ঘায়ত মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষরে লেখা, ভাষার গাম্ভীর্য এবং গতি একই সঙ্গে আখ্যানের প্রথমাংশে মিলিত হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক আলোচনা কাব্যের ইচ্ছাকে ছাড়িয়ে গেলে শিল্পের ধারণাশক্তি শিথিল হতে বাধ্য। এই বইখানিতে অতি আশ্চর্য প্রাকৃত বর্ণনা, ঘটনার নিপুণ বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু তত্ত্বের হাওয়ায় বারেবারে কারুদীপগুলি নিভে গিয়েছে। মনে হয় অমিত অক্ষরের পথ দিগন্ত অবধি বিকীর্ণ। পতিহীনা নারী পরমার্থে মিলিত হলেন প্রেমাস্পদের সঙ্গে ; তাঁর বিরহী বাসনা উত্তীর্ণ হ'ল স্তরে-স্তরে দেহলোকের বন্ধন ; কত গুরুর উপদেশ, ইতিহাসের ব্যক্তিক দৃষ্টান্তে প্রেমিকার চিত্ত অসীমায় সংগত হ'ল এই মহাকাব্য তারই ব্যাখ্যানে ভারাক্রান্ত। আনুষ্ঠানিক ধর্মবিস্তার এবং শিখ ইতিহাস সমাজবিধির আলোচনা পদ্যভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য করাই কবির উদ্দেশ্য ; আলোচনার মধ্যে-মধ্যে দৃষ্টিময় ইঙ্গিত ছড়ানো আছে, কিন্তু অরণ্যে প্রক্ষিপ্ত মণিকণা কুড়োনো সকলের সাধ্য নয়। মহাকাব্যের গড়নটাও আধুনিক যুগের মনোধর্মী নয় ; শিখ সাহিত্যেও তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

১৯০৭ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ভাই বীরসিং যে-সব ছোটো কবিতা লেখেন "লহরন্-দে-হার" (উর্মিমালা) নামে তা প্রকাশিত হয় ; পঞ্জাবি গীতিকাব্যের কিছু শ্রেষ্ঠ নমুনা এই গ্রন্থে রয়ে গেছে। ভাই বীরসিং- এর সহজাত প্রেরণা মিস্টিক কাব্যের দিকে, মুহূর্তে-নিহিত মহাকাল যেন তাঁর রচিত মাধুর্যের অপরা সংগীতে, ছন্দে, বাক্যের ইঙ্গিতে আপনাকে বিকশিত করতে চাইল ; কবির প্রিয় প্রতীক-পুষ্প কহ্লারের মতোই তা শুক্ল শতদলের কাব্য। যে-ভাবনার বৃন্তে এইরকম মিস্টিক কবিতা সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে তার বিশ্লেষণ করা চলে না। ভাই বীরসিং -এর বহু কবিতা কোনোদিন তর্জমা বা বিবৃতির জালে ধরা দেবে না। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের ছাপও তাঁর অনেক গানে কবিতায় প্রতীতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর নিয়ে দেখা দিয়েছে ; অর্থাৎ পাঠকের মন সেখানে রচয়িতার জ্ঞানবিশ্বাসের ভিতরেই আপনাকে এবং নিজের চতুর্দিকের সংসারকে স্পষ্ট গ্রহণ ক'রে

আনন্দিত হয়। বিশেষ ক'রে বলছি মানবিক স্বাধীনতার বোধে জাগ্রত তাঁর বেদনাদৃপ্ত কবিতাগুলির কথা। যেখানেই তিনি অন্যায়, দুর্বলের উপর বিক্রম প্রকাশ, অথবা দুর্বলের আত্মপরাজয়স্বীকার দেখেছেন, তাঁর কবিতায় আগুন জ্বলেছে। সেই মনোময় শিল্পাগ্নি কখনো বেদনার অক্ষমায় কখনো বিষণ্ণ ক্রোধে প্রকাশ পেয়েছে। 'বিসমল মোরে' (আহত ময়ূর) কবিতায় শিকারীর অকারণ হননবিলাস কবির বিচারালয়ে যে-দণ্ড পেল তা স্মরণীয়; 'ফুন্দিয়া টোটা' (নিহত তোতাপাখি) কবিতায় সামাজিক অসাম্যতন্ত্রের কী মর্মান্তিক তীব্র অথচ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ; 'বুলবুল-তে-রহি' (বুলবুল ও পথিক) নামে আরো একটি পাখির কথায় দুঃখস্বীকারের মূর্ছাতুর বিনতিকে কবি আত্মিক অযোগ্যতার নামান্তর বলে লজ্জা দিয়েছেন। বন্দী পাখির উপর তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা রাষ্ট্রিক অত্যাচার এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষে পররাষ্ট্রের নির্দয় আধিপত্যের প্রসঙ্গে প্রখরবিদ্রূপী কাব্য; শ্লেষাত্মক কাব্যের এমন প্রকৃষ্ট রচনা যে-কোনো সাহিত্যেই দুর্লভ। পাশাপাশি রয়েছে বেদনার নিঃসৃত কেবলমাত্র দরদী সংগীত; সেখানে সমালোচনাও যেন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে, অথচ ভাবাতিশয্যের চিহ্ন নেই।[৩] কখনো একটু পাশ কাটিয়ে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-বাক্যে কবি তাঁব দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে গেছেন।[৪] এই ধরনের রচনার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি "গঙ্গারাম" নামে তাঁর

---

৩ উদাহরণস্বরূপে একটি ক্ষুদ্র কবিতা দেওয়া চলে,— কবিতাটির নাম 'দরদ-দেখ্-দুখ-আন্দা' (দুঃখ দেখে দুঃখ আসে):

> পৃথিবীর যন্ত্রণায় বিবর্ত চিত্রে
> হৃদয় আমার দুঃখী।
> অন্তর যার গলে
> পারি না রুধতে চোখের জল।
> জানি পৃথিবীর বেদনা কমবে না আমাব বেদনায়,
> এমনকি আমার তীব্র ত্যাগের উৎসবে—
> তবু পাথর তো নই আমি,
> পাথরও ভাঙে তোমার দুঃখে, হে পৃথিবী।

৪ উদাহরণ: কবিতার নাম 'বঁদা-কে মাল' (দাস, না, প্রভু):—

> ঘুরছিল মেলায় একটি মানুষ,
> গলায় তার ঝোলানো তবক,
> লেখা তাতে
> "আমি কৃতদাস কেনো আমায়।"
> কিনতে গিয়ে বললো একজন আমার কানে:
> "ও চায় না কোনো প্রভুকে—
> ছদ্মবেশে ও ধরতে চায় আবো অধম দাসকে
> যে ওকে কেনায় দ্বারাই প্রমাণ করবে আপন দাসত্ব,
> তার তুলনায় কৃতদাসই হবেন প্রভু।"

বন্দী তোতাপাখির মুক্তিকাব্য। বন্ধনের বহুপর্যায় পার হয়ে, ধনী অত্যাচারীর দুর্জয়তাকে পায়ে দ'লে, মর্তপাখি শেষে পরম পাখিকে উদ্দেশ ক'রে বলছে :

হে বিরাট পাখী, উর্ধ্বে উড্ডীন,
নেই তোমার নীড়।
—মুক্ত করো আমাদের।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ভাই বীরসিং কাশ্মীরে যান, দৃশ্যকাব্যের মঞ্জরী চয়ন ক'রে "মটক হুলারা" (চমক) নাম দিয়ে তিনি একটি লিরিকের মালা গাঁথেন। এই বইখানিতে তাঁর শিল্প ঝলমল ক'রে উঠেছে, আলোয়-হাওয়ায় গানে এবং ছবিতে-ভরা কবিতাগুলি অনবসিত মাধুর্যের সন্ধান দেয়। বন্ধু অধ্যাপক তেজাসিং আমাকে বলেছিলেন এই গ্রন্থের কবিতায় ভাই বীরসিং- এর প্রতিভা চরম শিখরে উঠেছিল, এর চেয়ে সার্থক শ্রেষ্ঠ কবিতা তিনি পরেও লেখেননি। "চমক" -এর মন্ত্র ভাষান্তরে দেওয়া চলে না, কেননা সেখানে ধ্বনি এবং বাণীতে ভেদ নাই ; ভাই বীরসিং -এর কথায় বলতে পারি কম্পিত হাতের কব্জি ঝংকৃত সোনার তারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। হ্রদের জল ভর-ভর, কাশ্মীরের অথই সৌন্দর্যে হৃদয় আজ ডুবে আছে। ভুল্লারে, ডাল-হ্রদে কানায়-কানায় সম্পূর্ণতা ; ঝিলের কম্পিত অশ্রুতে ঝিকিয়ে উঠছে সোনার প্রহরগুলি। কবি বলছেন, অন্তরে নূতন কাশ্মীর দেখা দিয়েছে ; "হয়তো তিনি এই দেশে বেড়াতে আসবেন।" আবার অন্য কবিতায় প্রাচীন অনন্তীপুরার পাথর ছড়ানো ; শ্রীনগরের পাশেই লুপ্ত আশ্চর্য দিনের চিহ্ন ধুলোয় পড়ে আছে। দুটি মন্দিরের ভগ্নচিত্রে ভারত-মহিমার সমৃদ্ধতর পরিচয় বিকীর্ণ। যারা ঔদাসীন পথে ব্যস্ত চলাচল করছে, ফিরেও দেখে না, কোন্ সভ্যতাকে তারা গড়বে ? চোখ তাদের অজাগ, মনে ধ্যানশিল্পের নিবৃত্তি। সমাজসংস্কার করবে তারা অসংস্কৃত চিত্ত নিয়ে। শিখ-কবি মূর্তিপূজাকে মানেন না, কিন্তু যারা মূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পীর মানসমূর্তিকে ভাঙছে তাদের বীর্য তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয়। কেননা মূর্তিপূজা মৃত হয়েও ফিরে আসতে পারে, সুভাবনাকে ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। 'মার্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ' কবিতায় এই প্রসঙ্গে আরো বলছেন, যারা সুন্দর পাথরগুলি ভাঙল, হৃদয়কেও তারা হাতুড়ি দিয়ে চূর্ণ করেছে, যে-হৃদয়ঘরে থাকেন মহেশ্বর। ভাঙা পাথরগুলির প্রশ্ন শোনো : সকলের যিনি অন্তরবাসী তাঁকে তোমরা করেছ অবিশ্বাস, তোমাদের বিশ্বাস কী ? 'ভুল-চুকি-সভিতা' (ভুলে-যাওয়া সভ্যতা) কবিতাটিতে কাশ্মীরী

পণ্ডিতানীদের কথা আছে। সম্ভ্রান্ত সহজ তাদের বেশ-ব্যবহার, স্বচ্ছন্দ স্বাধীন চলাফেরা, বহুযুগের কাশ্মীরী সভ্যতা তাদের প্রসন্ন বেদনাশীল দৃষ্টিতে। ভারতীয়-সংস্কৃত একটি ছবি কবির চোখে উদ্ভাসিত হ'ল। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে ভূস্বর্গের বর্ণনা আছে, কিন্তু সেই স্বর্গের অধিবাসী মানুষের নিয়ত নরকযন্ত্রণাকে কবি ভোলেননি। শ্যামস্বর্ণময় আকাশের হাওয়া ব্যথিয়ে উঠেছে মানবিক বেদনায়। যাঁরা কাশ্মীরের অভাবনীয় দৈন্য-জীর্ণতাকে অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের পাশাপাশি একত্র দেখেছেন তাঁরা ভাই বীরসিং -এর কাব্যে আমাদের নূতনতর সচেতন মানসের পূর্বাভাস পাবেন।

"বিজলিয়ন-দে-হার" (বিদ্যুতের হার) কবির গ্রথিত শেষ কবিতার বই। পরবর্তী কবিতাগুলি একত্র বেরিয়েছে বলে জানি না। ক্ষণপ্রদীপ্ত ছোটো-ছোটো গীতিকবিতায় ভাই বীরসিং তাঁর বহুচারী ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন; ভাষা ও ছন্দে আধুনিক কালের ঋজুকঠিন বৈরল্য দেখতে পাই। ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত কাব্য হতে তিনি কিছুদূর সরে এসেছেন; এই গ্রন্থে সাহিত্যের সংসারী ভাব বহমান। অধ্যাত্মসাধনায় কবির নিভৃত জীবন যতই গভীরে প্রবেশ করেছে, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু প্রত্যহ পরিবেশের সঙ্গে আরো সহজ মিলিত হ'ল; ভাই বীরসিং -এর রচনায় তন্মাত্রিক শিল্পদৃষ্টির এই নিগূঢ় রহস্য আমাদের কাছে ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু শিখ সাহিত্যে বরাবরই এই একটি সহজতার স্বর বেজেছিল। গ্রন্থ্-সাহিবের ধর্মালোচনার ফাঁকে-ফাঁকে দেখতে পাই গরিব মহিওয়াল (মহিষওয়ালা) গাছের ছায়ায় বসে আছে, সম্মুখে বড়ো প্রান্তর; শাওন মাসে চাত্রিক বা সারঙ পাখি[৫] করুণ সজল স্বরে ডেকে উঠল; মেহ্‌দি, কুসম্ভা ফুলের গন্ধ বসন্তের স্পর্শ নিয়ে আসে। অন্‌হাদ[৬] রাগিণী শুনছেন ধ্যানী, কখনো তিনি খুঁজছেন পরশ,[৭] কখনো নাম-জপে নিমগ্ন; এদিকে পরমগুরুর পুণ্যগাথায় ত্রিঞ্জনের[৮] গ্রাম্য মধুর ছবিও ধরা দিয়েছে। ভাই বীরসিংও সহজপন্থী; তাঁর উৎকৃষ্ট রচনায় ভারতীয় "ধর্ম" কথাটির যথার্থ কর্মগত, বহুযোগাশ্রিত জীবনের

---

৫ চকোরের নাম

৬ অন্তরের দৈবশ্রুত সংগীত

৭ "পরশ" কথাটি গ্রন্থ্-সাহিবে এবং শিখ ধর্মসাহিত্যে গভীরতম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অনন্ত প্রেমাস্পদের স্পর্শ এবং বিরহমিলনের পরীক্ষা দুই ভাবই তাতে প্রচ্ছন্ন; পরশপাথর, অর্থাৎ যার দ্বারা খাঁটি জিনিস চেনা যায়, এবং সামান্য জিনিসও যার স্পর্শে হয় সোনা তারও প্রসঙ্গ রয়েছে।

৮ ত্রিঞ্জন-গ্রামের সেই সম্মিলন-কক্ষ যেখানে মেয়েরা একত্র হয়ে সুতো কাটেন, চরকা চালান। কল্যাণকর্ম এবং সামাজিক ঐক্যের জীবন্ত প্রতীক ছিল এই ত্রিঞ্জন। গ্রাম্য জীবনের নানা সুতো যে ঐখানে বাঁধা হ'ত, গল্পে গানে জাল-বোনার ছিল ঐ একটি কেন্দ্র তা প্রাচীন শিখ পদাবলীতে বোঝা যায়।

পরিচয় পাই। "বিজলিয়ন্-দে-হার" গ্রন্থে ভালোবাসার কবিতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের বৃত্তান্ত, মিষ্টিক গান, হাসিতে ছোঁওয়া সুতীক্ষ্ণ কাব্যদৃষ্টির বিচিত্র প্রয়োগ পাশাপাশি রয়ে গেছে। সামাজিক আলোচনাও বাদ যায়নি; সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখা তাঁর 'কুতুব-দে-লাঠ' কবিতাটির পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি; গুরু নানকের উদ্দেশ্যে রচিত একাধিক কবিতায় মুসলমান ধর্ম-গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও শিখ-ইসলামী মিলনের চরম আদর্শ তিনি অখণ্ড ভারতের সম্মুখে ধরেছেন। কখনো এসেছে মৃত্যুর সুর পথের বিবাগী ধ্বনিতে; 'চলো, চলি দি সাদ' (চলো, যাই চলে) কবিতায় এই রিক্ত দূরযাত্রীর ডাক। সংসারকে সুন্দর সত্য করে তুলব, তারপর রেখে যাব পরবর্তীদের জন্যে। যাবার সময় হ'ল।

সৌভাগ্যক্রমে এই ধর্মসাধক মনস্বী কবি আমাদের কালে এখনো রয়েছেন এবং একান্ত নিভৃতবাসী হলেও তাঁর বাণী চতুর্দিকে সঞ্চারিত হবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাহিরের বাধা তাঁকে অন্তবালে রাখবে না, ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গনে তাঁর যথোচিত আসন পাতাব সময় হ'ল।

ভাই বীরসিং-এর কবিতাব দুটি নমুনা দিতে চাই। দ্বিতীয়টির রচনা-তারিখ ১৬ই ফেব্রুয়াবি, ১৯৩৮।

স্বা ধী ন ই চ্ছা

যদি বিশ্বকর্মা চোখ দিতেন আমার খুলির উপর দিকে,
চাইতাম আকাশের দিকে।
চোখ পেয়েছি কপালের নিচুতে
নিচু দিকেই না চেয়ে আমার উপায় নেই—
বিধিনির্দেশ আমাকে বেঁধেছে।

চোখ আছে বটে কপালে,
সঙ্গে আছে বিধিদত্ত ঘাড়
ইচ্ছামতো চোখকে উঁচু-নীচু চালাবার জন্যে।
বিধিনির্দেশে চোখ দিয়ে দেখায় নেই মুক্ত দৃষ্টি,
ইচ্ছায় উপরে চোখ চালাবার অধিকার মানুষের॥

দহন

ধীরে ধীরে উঠল মেঘ

কত নিচু থেকে আকাশের উঁচুতে—

কিন্তু সে কালো, সে বোবা,

জানে না দিক।

অজানিতে তারো বুকে জাগল বজ্রের বিদ্যুৎ,

কখন হঠাৎ হ'ল স্ফুরিত ;

অসহ্য আত্মদহন তার সেই আলো—

কিন্তু নীচে পৃথিবী হয়ে ওঠে ক্ষণিক উজ্জ্বল ॥

নতুন কবিতা

বুদ্ধদেব বসুর "নতুন পাতা" হাতে পৌঁছল। অত্যন্ত আধুনিকেরা স্তম্ভিত হবেন কবি হয়েও তিনি কবিত্ব করতে ভয় পাননি; সেকেলে ভাব সাজিয়ে খেয়ালের দোকান তুলেছেন। শত্রুপক্ষীয় ভালোমানুষ কবি ব'লেও তাঁকে ভুল করবার উপায় নেই। আদিম কথা স্পষ্ট অথচ ললিত ভাষায় বলবার ভঙ্গি কোন্ প্রথাসংগত।

গদা-হাতে "গদ্য কবিতা" এ নয়, মুক্ত ছন্দে ব'য়ে চলেছে অথচ ধারার বাঁকে-বাঁকে জাগ্রত মনের পরিচয়। যাঁরা এখনো মনে করেন আধুনিক লেখকদের মধ্যে স্বীকৃতির অকুণ্ঠিত খুশি নেই, প্রশ্নসমন্বিত মনই সর্বজয়ী, তাঁদের জন্যে এই পুজোর উপহার।

এই মুহূর্তে চাঁদ তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে
কত বড়ো চাঁদ!
কী সম্পূর্ণ, কী সুন্দর, কী অবিশ্বাস্য-সম্পূর্ণ সুন্দর।
কিন্তু তার চেয়েও আরো কত সুন্দর এই যে আমার মেঝেতে
কোনো রূপকথার নীলসমুদ্রের
টলটলে জলের মতো একখানি জ্যোছনা এসে পড়েছে।

—চাঁদ

চাঁদে-পাওয়া দশা কবিত্বের সর্ববাদিসম্মত লক্ষণ, অতএব সাধু সমালোচকেরা আশ্বস্ত হবেন। অসাধুরা দ্রুত নিশ্বাস ফেলবেন জলজ্যান্ত মামুলি চাঁদটা নিয়ে আলোচনা দেখে, কিন্তু ভয় নেই, জোয়ারের জল ঘাট পেরিয়ে ভাসাবে না। শিল্পের বাঁধুনি আছে। পাহাড় নিয়েও দস্তুরি উঁচু উচ্ছ্বাস রয়েছে— সুখের বিষয় কোন্‌টা সাবেকি কোন্‌টা নয়, সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েই বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন এবং সেই কারণে উচ্ছ্বাস কথাটায় বিপদ নেই।

উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার
পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষারে রূপালি আগুন।

এ কি চাঁদেরই বিপরীত মুখ, গ্যালিলিওর অজ্ঞাত,
রবীন্দ্রনাথেরও অজ্ঞাত ? নাকি দূরে বহুদূরে
এরই সন্ধানে আমাদের স্বপ্ন-অভিসার ? অস্পষ্ট অপরূপ
ঝিলিমিলি তুলে শাদা ময়ূরের মতো আমারই দিকে আসছে ?

—চাঁদ ও তুষার

ছাপ মেরে শ্রেণীবদ্ধ করবার সুবিধা হবে না ; এখানে সেকেলে এবং বহুকেলের সংগম।

"চা-বাগানের কোঁকড়ানো সবুজে-নীল" ছবি দেখো ; "তীব্র তিব্বতি হাওয়া"র মতো ডি. এইচ. আর. গাড়ির শব্দ ; (অন্য এক কবিতার লাইনে মাদ্রাজ মেল চলেছে "চাকায় চাকায় স্তব্ধতাকে আগে-আগে ঝেঁটিয়ে") ; কোথাও

সমুদ্র ধু-ধু করছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
যেন চিরকাল এক বিরাট মুহূর্তে প্রসারিত। পৃ ৮০

সমুদ্রকে নিয়ে কথা বলা শক্ত কেননা নানা দেশীয় কবিত্বের শ্লেটে হিজিবিজি তৃপ্তির দাগ পড়েছে। "যেন" কথাটা বাদ দিলে নির্দেশ বদলাত কিন্তু জোর কি বাড়ত না ?

উঁচু হয়ে উঠে গেছে সমুদ্র
যেখানে চোখ যায় না—

স্নানরত ঢেউবিলাসীর মন সাড়া দেবে। তার আগেই বলা হয়েছে,

আমরা ভাসছি, আমরা নাচছি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফেনার ঘূর্ণিতে,
মাথার উপর শাদা পাখির ঝাঁক
চাকার মতো ঘুরছে। পৃ ৭৮

সামুদ্রিক খেয়াল জাগল—

ছাখো না সমুদ্র তোমার কী করে—
এই লোনা নীল জল আর চাবুকের মতো হাওয়া।

যেমন শঙ্খ আর ঝকঝকে ঝিনুক
এই ঢেউয়েরা হাজার বছর ধ'রে আঁকে
কত অফুরন্ত রঙে, কত বিচিত্র নকশায়,
বাদামি আর বেগনি আর অপরূপ মসৃণ
আর আঁকাবাঁকা ঢেউ-খেলানো রেখায়—
তেমনি তারা তৈরি করুক তোমার শরীরকে
শঙ্খের মতো মসৃণ তোমার শরীর— পৃ ৭৮

পুরীতে ব'সে "নতুন পাতা" পড়ছি—হয়তো সমুদ্র বিষয়ে বেশি উদ্ধৃত ক'রে বসব; অদূরবর্তী চিল্কা হ্রদেরও ঝিলিক দেখলাম অন্য কবিতায়। এ-পাড়ায় বুদ্ধদেববাবু বেড়িয়ে গেছেন তার দলিল প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, পৃথিবীর মাটি-জল-পাহাড় চোখে ধরা দিয়েছে এইটেই কবিতার সংবাদ। বইয়ের এই দ্বিতীয় অংশের রচনায় পার্থিব রূপের প্রদক্ষিণ আছে। সকলেই জানেন ধরণী সহজ বস্তু নয়, ভ্রাম্যমাণকে নীল জলে ভাসায়, দুর্গম পাহাড়ে চড়ায়, খদে-গহ্বরে নিয়ে মাথা ঘোরায়— কবিত্ব নিংড়ে নিতে আঙুলের জোর চাই। 'এভারেস্ট' কবিতায় অভিযানী চিত্ত চড়াই ভেঙে উঠেছে, গৌরীশৃঙ্গের ডগায় পা না পৌঁছলেও কবির মন তার

দৃষ্টি-অন্ধ-করা আলো, আর
সৃষ্টি-লুপ্ত-করা অন্ধকার, জরাযৌবনহীন রাত্রিদিন-কে ছুঁয়ে এসেছে।

এর পরে

অকায়, অকঙ্কাল কলকাতা, ছায়া'ময়,

যেখানে মানুষ

কালের বিশাল চাকায় অন্ধ মাছির মতো বন্দী;
বিশ্বের জানলা বন্ধ।

তার কথা তোলা বিসংগত ঠেকবে। "নতুন পাতা"য় সেই বন্ধ সংসারটা এসেছে আগে— বইয়ের প্রথম অংশে।

রাস্তায় ভিড় ব্যস্ততা মত্ততা। আপিসে ময়দানে রেস্তোরাঁয়
কাজ খেলা নেশা, হাড়-ভাঙা সপ্তাহশেষে জুয়ো, জিন, দুপুরের ঘুম
সব অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, শহর মূর্ছিত।

পরিচিত "আধুনিক" কাব্যের রাস্তা। জিন কারা খায় ঠিক জানি না। কিন্তু কলকাতাকে নিয়ে কাব্যে যে নতুন দস্তুর অতি প্রাচীন হতে চলেছে তারই আবৃত্তি "নতুন পাতা"র উদ্দেশ্য নয়। এখানেও নতুন আলো ঠিকরিয়ে এসেছে, অনেক সময় ট্রামের আলো—

লাল-আলো-জ্বালা টালিগঞ্জের ট্র্যাম
অন্ধকার পার হয়ে আসছে পৃ ৬৮

এখানেও সুর এসে পৌঁছয়, দৈবক্রমে সেটা কোঁকিলের, শুধু ট্র্যাফিকের নয়, যদিও কোকিলের ধ্বনিটা যে শব্দের পটভূমিতে জেগেছে তা শাহরিক। কলকাতার রাত্রিটা সুদক্ষ টানে ফোটানো—

রাত্রি একটা।
রাস্তায় উড়েদের হল্লা এতক্ষণে থেমেছে।
এখন কোনো শব্দ নেই ;
শুধু মাঝে-মাঝে এই শান্তিতে টোল ফেলছে
দূরে রাস্তা দিয়ে দ্রুত-ছুটে-যাওয়া ট্যাক্সি।
আর ঘড়িটা টিকটিক করছে—
সময়ের অবিশ্রান্ত ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন। পৃ ৪৫

"ক্ষীণ" কথাটা সুন্দর বসেছে। নিঝুম রাত্রির ছন্দ। এই সময়টায় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে

হঠাৎ একটা কোকিল
রাত্রির বুকের ভিতর থেকে ডেকে উঠল।

সব মিলিয়েই কলকাতা। রাত্রে যেমন কোকিল এবং রাস্তার কাকলি, তেমনি দিনে ভাবনার রঙে মেশানো প্রহরের সংঘর্ষ। মধ্যাহ্নে সংগ্রামের শহর জুড়ে শানে-আছড়ানো অতৃপ্তি।

দুপুরবেলায়
বাইরে হাওয়া তেতে উঠে,
বৃষ্টিহীন আকাশ বিবর্ণ।
…আমার বুকের মধ্যে
হাজার ক্ষুধিত কুকুরের তোলপাড় চীৎকার। পৃ ৪১

"নতুন পাতা"য় নগরবাসীর ক্ষুব্ধতা তীব্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুর যে-বিশিষ্টতা "আধুনিক বাংলা কবিতা"-সংগ্রহের সম্পাদক দেখিয়েছেন— প্রথম ভূমিকায়— সেই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ এখানে প্রচুর। প্রেমের কবিতা ইট-পাথর-কাঠের ফাটলে-ফাটলে সবুজ রঙিন হয়ে যেখানে-সেখানে ঠেলে বেরিয়েছে। প্রথম অংশটা হৃদয়বৃত্তির ডায়েরি। বাঙালী-জীবনের সমস্যাজনিত আক্ষেপ এবং প্রত্যুত্তর; উপাদান গাঁথা হয়েছে প্রেমের মূল সুতোয়। সেইখানে আন্তরিক সংগতি। "আমি ভালোবাসি" বলবার সাহস "নতুন পাতা"য়। হৃদয়বৃত্তির ঝাঁজ লক্ষ করেছি বুদ্ধদেববাবুর অন্য কবিতার বইয়ে, শরীরমনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তীব্র বলবার চেষ্টা। এতে শোনা যায় কম। সূক্ষ্ম মন প্রতিহত হয় আহূত না হয়ে— অর্থাৎ বাস্তবিকতা রোধ করে অব্যবহিত বোধকে যা ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়েই প্রকট হওয়া সম্ভব। দেহমন জড়িয়ে কেন্দ্রিক অনুভূতি প্রকাশের শিল্প চলেছে দুই রাস্তায়। বিজ্ঞানবাক্যের সরাসরি প্রয়োগ ইংরেজি লিরিকে দেখা দিল: লক্ষণ বোঝাতে কবির চেয়ে কবিরাজের বচন। অন্যদিকে রেখার চেয়ে রঙের ঝলক, কখনো-বা মগ্ন চেতনা হতে তুলে আনা। নূতন জ্ঞানের প্রসঙ্গ য়ুরোপে বহুধা সঞ্চারিত ব'লে আর্টিস্টের কাজ ওখানে কতকটা সহজ হয়েছে। বাঁধা আইন নেই— শিল্পে একমাত্র প্রশ্ন: হয়েছে কি না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঝাপ্‌সা অনির্দিষ্ট কথার স্থানে স্পষ্ট পারিভাষিক কথা বাড়ছে, এটা নিশ্চয়ই প্রাণধর্মী। কিন্তু "ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেতে চাঁদ"— দুর্লভ মুহূর্তটি দূরে না স'রে যায় বেশি কাছে বাঁধবার প্রয়াসে। ভাবালুতা এবং অত্যুগ্র বর্ণনার মধ্যে সেতু বাঁধতে পারায় আর্টিস্টের কেরামতি; বিশেষ ক'রে ভালোবাসার কবিতায়। "নতুন পাতা"র বহু ছত্রে তার পরিচয় পাবেন।

পাতা উল্‌টিয়ে হঠাৎ থামতে হয় পরিপূর্ণ সুন্দর ছোটো আকাশে; ভাবনায় দৃষ্টিতে উদ্‌ভাসিত মুহূর্তের আকাশ বইখানির নানা জায়গায় ছড়ানো। ছন্দ-মিল-ছুট্ কাব্যে আগাগোড়া এক-একটি কবিতাকে আঁট বেঁধে আবহাওয়া রচা শক্ত; বুদ্ধদেববাবু নিজেই স্বীকার করবেন এই রাস্তায় তিনি নতুন পথিক। কিন্তু কথার বালি ভেঙে হঠাৎ সবুজ কেন্দ্রে পৌঁছনোর বিশেষ সুখ আছে, গাছের একটুখানি ছায়া আর পাশে কোথাও টলটলে জল। এই নিয়ে স্বর্গরাজ্য। এমনিতর টুকরো লাইন পুরো কবিতার স্বাদ দেয়।

১ রূপকথার সেই সব-শেষের পাতা
মায়ের চোখের নিচে উজ্জ্বল। পৃ ৫১

২ ছায়া-ঢাকা ঠাণ্ডা রাস্তার শেষে ঝিরঝিরে, রঙিন ফুলের বাগান পৃ ৫১

৩ জানালার বাইরে আছে আকাশের নীল টুকরো,
আছে সমস্ত দিন ভ'রে মনের মধ্যে কবিতার গুঞ্জন পৃ ২১

৪ বাতাস ঝুলে রয়েছে নিশ্চল ধোঁয়ার সুতোর মতো
গাছের পাতায় পাতায়। পৃ ১৭

৫ তোমাকে ডাকছি সময়ের সরু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে,
তার দু'দিক মৃত্যুর দেয়াল দিয়ে ঠাসা। পৃ ৯

৬ আর আমার জানলায় ছোটো-ছোটো তুলসীর পাতা
তারা ভ'রে উঠেছে জীবনের সমস্ত মধুরতায়।
আর এই রাত্রি নাচছে আমার রক্তে
জ্বলন্ত কোনো তারার আকাশ-পরিক্রমণের মতো। পৃ ৩০

৭ সময়কে আলোর করাত দিয়ে চিরে-চিরে যায়
এক-একটি মণিময় মুহূর্তে। পৃ ৬৭

এ শুধু এক মুঠো, অনেক মুঠোর ঝলমলে ভাণ্ডার রয়েছে "নতুন পাতা" কাব্যে।

তৃতীয় অংশে সাহিত্যিক সংবাদ, তর্ক, মন খুলে কবিতায় ভর্ৎসনা "ইন্‌টেলেকচুয়েল্" সমালোচককে। যাকে বলে "বাঁশির জায়গায় অসি" কাব্য। কেন হবে না ? তর্কে যোগ দেব না, কিন্তু অন্তঃশীলা দরদী মনোধারার সন্ধান পেয়েছি সেই কথা জানাব। সদ্য-ছাপা নিজের বই হাতে নিয়ে লেখক পড়তে বসেছেন, গর্ব বেদনা অভিমান ছাপিয়ে উঠেছে সত্তার নিগূঢ় আনন্দ— সুন্দর এই সমাপ্তির ছবি, তাতে ফিরে পড়বার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

১ যেন এই শাদা পাতাগুলো দিয়ে ছোটো একটি সূর্য
আমি তৈরি করেছি ;
একটি সূর্য, আমারই প্রাণে জ্বলন্ত। পৃ ১১০

২ তুমি বলছো, 'এ-বই থাকবে না,
মিলিয়ে যাবে কালসমুদ্রের জলে কয়েকটা উল্কি এঁকে দিয়ে।
কেন তবে—' কিন্তু সেইজন্যেই তো। পৃ ১০৪

৩ তবু তোমরা আজকের মতো চুপ করো,
একটু চুপ ক'রে থাকতে দাও আমাকে।
বিকেলের ম্লান আলোয় একা ঘরে আমি
পড়ি আমার কবিতা।
মুহূর্তের জন্য ফিরে আসুক সেই দিন, পৃ ১০৫

অতএব সমালোচকের মুখ বন্ধ ; ভয়ে নয়, প্রশংসায়। বুদ্ধদেববাবু আধুনিক বাংলা কাব্যে একটি নূতন সুর যোগ করেছেন। যাঁরা তৈরির কাজে নিবিষ্ট হননি তাঁরা এই আত্মপ্রসাদকে প্রশান্তি ব'লে মনে করবেন। প্রসাদগুণের মূল এখানে নেমেছে গভীর মাটিতে। "নতুন পাতা"য় যে-আনন্দটুকু ফুটেছে তা সংগ্রামজয়ী।

দুঃখ দাও আমাকে
এই নববর্ষার ছোটো-ছোটো বৃষ্টির মতো
ধারালো দুঃখ আমার বুকের উপর নামুক .
যে-বৃষ্টিতে জাগে প্রাণের অঙ্কুর,
মাটি সবুজে হেসে ওঠে। পৃ ৫৬

মার্কিন-প্রবাসীর পত্র

কবিতা-সম্পাদকেষু,

দূর প্রবাসে বাংলা কবিতার বই নিয়ে বসেছি। কাব্যের চুলচেরা বিচারের পক্ষে এটা অনুকূল অবস্থা নয়। মন-কেমনি হাওয়া, যাকে এরা বলে নস্টাল্‌জিয়া, তর্কবুদ্ধিকে উড়িয়ে দেয়। তার উপর নরেশচন্দ্রের এই প্রথম কবিতার বই বিশেষভাবে চিত্র-প্রতীকী— মনে হয় নীল জলের বহু ও-পারে আনম্ভিক বাংলার সেই হৃৎভূমি দেখা দিল যেখানে গাছে-গলিতে, চেনা সংসারের অসংখ্য নিবিড়তায় আমরা চিরদিনের অধিবাসী।

"দুরন্ত দুপুর" খুলে চোখে পড়ল কলকাতা। কলের জল, পাশের বাড়ি, গ্যাসের আলো, আর "দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সত্যস্নাত······শাড়ির আঁচল" যাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, ঘরে-ঘরে ওড়ানো নিশান। তারপর চায়ের পেয়ালা, নতুন বই, আভা-বদলানো বাংলার আকাশ, নাগরিক দৈনন্দিন। তা ছাড়া মাছি, পিঁপড়ে, পাড়াব বস্তির ঈষৎ উল্লেখ আছে। যদিও এই বাস্তবিক প্রসঙ্গে ভিড়ে-ভারাক্রান্ত কলকাতার জায়গা হয়নি; সদাগরি আপিস মিল অনাহার অত্যাচার সংগ্রাম সংঘাতের দূরধ্বনিও শোনা যায় না। নতুন যুগের উদ্যত প্রতিহত জনশক্তির কাব্য এ নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের যৌবনী ঢেউ বৃহৎ ইতিহাসের পটে আলোড়িত হয়ে এই সংকলনের কবিতায় পৌঁছয়-নি। বহুলোকের কলকাতা শহরে এসে ঠেকেছে অলৌকিকের একফালি আলো; তারই সঙ্গে ঘরোয়া বাছাই-করা ঘটনার সংমিশ্রণে এই গীতিকাব্য। "পাথরে বাঁধা শহরে ফুটপাতে" কৃষ্ণচূড়ার অজস্র লাল ভ'রে উঠল এ-ও যেমন আকস্মিক, তেমনি ডাকবাক্সে নতুন চিঠি, সিঁড়িতে চটির শব্দ, ঢকঢক কুঁজোর জল খাওয়া ইত্যাদি কলকাতার বাঙালী-জীবনের নিত্য আনুষঙ্গিক হয়েও আশ্চর্য। "শঙ্খ-শাদা" কঠিন দেয়ালের গায়ে বসানো যামিনী রায়ের ছবি শিল্পের ঠিক একই পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু দুরন্ত দুপুরের হৃদয়ের উষ্ণতায় ঘাসের রং, ছিন্ন সুখ, হঠাৎ মেঘের সঞ্চরণ, "কান্নার করাতে যত ধার" তারই সঙ্গে একত্র মিশেছে। চিরদিনের বাংলা। সব-সুদ্ধ গলিতে বাজানো একটি বাঁশির সুর। কখনো শহরের কথা, কখনো গ্রামের ছবি ঐ বিষণ্ন মধুর কড়ি-মধ্যমে থরথর

করছে। হৃদয়মনের কাল্পনিক ছায়াচ্ছন্ন, কখনো রোদ্দুরের ঝলক-দেয়া। দূরত্বের বেদনায় বাঁধা কাছের ঘটনা। বইখানির নাম "দুরন্ত দুপুর" না হ'য়ে "দূরান্ত দুপুর" হলে আরো মানাত। দুরন্ত অভিযানী মননের দিন অন্যত্র।

নরেশচন্দ্রের কবিতার ব্যাপক রাজ্য প্রাকৃতিক; রাঙা পাতায়, এক বর্ষার বৃষ্টিতে, মৌমাছির প্রসঙ্গে বিকীর্ণ। নাম থেকেই ভাব অনুমিত হয়। শান্তিনিকেতনে ছুটি, মাঘ শেষ হয়ে আসে, আঁকাবাঁকা বালি— ছোটো-বড়ো প্রাকৃত কবিতা,— বিশেষ অর্থে। যুগল মেয়ে, দুই নদী, ভীরু মেয়ে, লগ্ন, শকুন্তলা, তুমি কি রেখেছ কথা ইত্যাদি অন্য শ্রেণীর; প্রাকৃতিকের চেয়ে মানবিক হৃদয়ান্বিত। তৃতীয় পর্যায়ের কাব্য আরো স্বাধীন কল্পনাচারী, নাম থেকে গন্তব্য ধরা দেবে না। যেমন— বানানো ভালো, ময়ূরভঞ্জ, ট্রেন, অজাত-শত্রু গান, আমার বন্ধুকে; একই প্রসঙ্গে নানা প্রসঙ্গ মিশেছে। আরো নাম যোগ করতে চাই ছোটোদের কাব্য থেকে: হাওয়ার হাঁস, রুমির ইচ্ছা, লাখো বছরের পুরোনো জমিতে। বিষয়ের দাবি অতি প্রধান না হওয়ায় লিরিকের মেজাজ এতে খুলেছে।

'বানানো ভালো' সুন্দর ছোটো কবিতা। ছবির অনেকখানি অন্তর্দৃষ্টিগোচর।

১ ···চড়ার বালি
উত্তরে পুবে বাজে ঝঞ্ঝার খর করতালি

২ কত বর্ষার ধারে কেটে গেছে পুরোনো সে তীর

৩ চোখে স'য়ে যাওয়া বিবর্ণ রাত এ নয়, এ নয়

৪ সরাইখানার খোলা জানালার পাণ্ডু আলোয়
পেয়েছি আবার মন ভোলাবার বানানো-ভালোয়।

নানা বর্ণের সূক্ষ্ম সংসর্গিত কবিতা।

'ময়ূরভঞ্জ' কবিতায় অনতিপ্রকট দৃশ্য ও স্মৃতির অনুরণন; বর্ণনার চেয়ে বেশি।

১ বুনো বাংলোয় রাতে ঘুম নেই, উতলা মন

২ ···সেই শালবন
কতো হাসাহাসি করল সেবার সুযোগ বুঝে।

৩ শত কবিতার ঘুমভাঙা ভোরে এনেছিল কচি আম

যদিও এই কবিতার শেষ লাইনে "পর্যটক" কথাটায় খটকা লাগে; "তলে"র সঙ্গে "ভুলে"র মিলেও স্বস্তি নেই। মিলের প্রসঙ্গ পরে তুলব।

আখ্যায়িকা-জড়ানো কবিতা 'ট্রেন', 'আমার বন্ধুকে'— স্বতন্ত্র উল্লেখ-যোগ্য। সুন্দর সমগ্র পদ এই দুই কবিতা থেকে পৃথক চয়ন ক'রে নেওয়া যায়; কিন্তু সব মিলে দীর্ঘ কবিতায় কবি এখনো সংহতির চেষ্টা করেননি। ভাবের সূত্র সন্ধান করলে নিরাশ হতে হয় না, কিন্তু বিস্তৃতি ক্লান্তিকর। অথচ কবির পরিণত হাত এবং দৃঢ়তার সাক্ষ্য এই তৃতীয় পর্যায়ের মনন-প্রধান কবিতায় নানা স্থানে দেখা দিয়েছে। নমুনা

১ আমার সময় আজ। পৃথিবী আমারই

—আমার বন্ধুকে

২ এই দৈব-দুর্দিনের সর্বস্ব আমার

৩ চিন্তার লাঙল আজো কপাল চেরেনি

৪ সাত পুরুষের ভিটেমাটি ফেলে পার হয়ে যাবে চাষী
সন্ধ্যার খেয়া

—অজাতশত্রু গান

'ট্রেন' -এব এই পদগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে রাখবার—

১ দুরাশার সিঁড়ি তোলা অজানা স্টেশন

২ প্রকাণ্ড সূর্যের নিচে শ্রমে তিক্ত, জ্বরে মূর্ছাতুর
আকাশ পৃথিবী ভরা প'ড়ে আছে নির্বাক দুপুর।
আদিগন্ত রেলপথ— অনিশ্চিত অনন্ত সময়—
জীবনের লৌহচক্র অক্লান্ত ইচ্ছায় পার হয়।
['লোহার চাকা' অন্য কথার যোগে ব্যবহার করা যেত কি না]

মুহূর্তের বনপথ, মুহূর্তের মাঠ,
জ্যোৎস্নায় কুঞ্চিতরেখা হ্রদের ললাট,
গোধূলিতে হাটফেরা মানুষের ভিড়
পার হ'য়ে মধ্যরাতে উদ্দাম নদীর
নির্জন পাড়ির পরে চিরতরে থেমে যাবে ট্রেন।
[নির্জন পাড়িতে এসে থেমে যাবে ট্রেন (?)]
প্রশ্ন শুধাবে না কেউ— 'কোথায় যাবেন?'
[প্রশ্ন কেউ করবে না (?)]

প্রতিচ্ছবি না হয়ে কাব্যের প্রকৃতি এখানে ভেঙে বদলিয়ে রাঙিয়ে স্বাধীন রূপান্তরিত। স্বপ্রকাশের এই পথ।

দুই

হাওয়াই ডাকে অত্যন্ত মাশুল নেবে, তবু এই চিঠিতে সমালোচনার দুটো প্রসঙ্গ যোগ করব। ঘর-মননী প্রবাসী হয়েও যথারীতি বাংলা তর্কে নামবার লোভ জাগল। বেশি সময় নেব না।

প্রথমত ছন্দ, মিল, প্রসাধন। মিলের দিক থেকে বলি—নদী, গতি; বাজাই, বাঁচাই; ভরে, গড়ে; গায়ে, চায়; বড়ো, করো; জানত, অফুরন্ত; ইচ্ছা, তুচ্ছ; আজই, বাঁচি; বনতলে, তুলে; পঙ্কিলতায়, পাতায়; সেও, ঢেউ— ইত্যাদিতে মন সাড়া দেয় না। মিলের আকস্মিকতা, বা মিলের হঠাৎ আশা-ভঙ্গ কোনোটারই চমক কবি জাগাননি। অর্ধমিল, এমনকি দূর-প্রতিধ্বনিত, অর্ধস্ফুট এবং আপাত-যদৃচ্ছ অথচ জটিল শিল্পিত মিলেব ব্যবহার কবিতায় চলবে, যদি তা বিশেষ নির্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত আঙ্গিকে দেখা দেয়। আধুনিক পশ্চিমী কাব্য অনেক দিন থেকেই পূর্ণাঙ্গী বা সম্পূর্ণ মিলের দাসত্ব কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু যথার্থ কাব্যে প্রত্যেকটি কবিতা স্বকীয় নিয়মানুযায়ী অন্তর্গূঢ় মিলে ও অমিলে বাঁধা; ওয়েন থেকে অডেন পর্যন্ত এই সচেতন কারিগরির ব্যতিক্রম হয়নি। ইয়েট্স্ বা এলিয়ট -এর তো কথাই নেই। এলিয়ট অনেকটা পাশ কাটিয়ে গেছেন কিন্তু ইয়েট্স্ -এর অর্ধমিল কৌশলী নিয়মে বাঁধা।

ছন্দের বৈচিত্র্য "দুরন্ত দুপুর" এ তেমন জায়গা পায়নি। কবির কান সূক্ষ্ম সজাগ কিন্তু নূতন ছন্দ ও মাত্রার পরীক্ষায় তাঁর কাছে আরো সাহসিকতার দাবি করি। আধুনিক কাব্যে গদ্যপন্থী ছন্দ প্রবর্তিত হওয়ায় যথারীতি ছন্দের নূতনতর উৎকর্ষচর্চা প্রতিহত হয়েছে; এমনকি, গদ্যছন্দের অনুকরণে গীতি-কবিতায় নানা ব্যাধি দেখা দিয়েছে; বাক্যের অন্যাষ্য ভিড় তার মধ্যে অন্যতম। পুরোপুরি গদ্যছন্দের স্বাধীনতা বেশি, যদিও শিল্পের নিয়ম এড়িয়ে কারো মুক্তি নেই। খাঁটি কবিতায় স্বাধীনতা অর্জনের উপায় কঠিন। পয়ার অনেক অত্যাচার সহ্য করে কিন্তু কেবলমাত্র ভার চাপিয়ে তাকে নূতন ক'রে তোলা যায় না। পদ্য ও গদ্য -ছন্দের মিশ্রণ সম্ভব, কিন্তু এই পথ কণ্টকাকীর্ণ। লিরিক কবিতায় বাঁধা-ছন্দের বিচিত্র নূতনতর নৃত্যযোগ চলতে থাকুক।

কাব্যের প্রসাধনে বাক্যসাধনার দুরূহ চরম দাবি কবিকে মেনে নিতে হবে।

কথাকে অত্যন্ত গভীরে বাজিয়ে নিলে তবে তার ধ্বনি স্পষ্ট হয়। শুধু কানে শোনা ধ্বনি নয়, বাক্যে অগণ্য সূক্ষ্ম শ্রুতি— তার overtone— মনে ধারণ করা চাই। এর জন্যে চাই শিল্পের জ্ঞান এবং ধ্যান— যাকে বলা যায় শিল্পাগ্রহ— সংসর্গের নিবিড় আসঙ্গে ভরা বাক্যের শব্দ শুনতে হবে। তালের মেট্রনমে তা ধরা পড়ে না, অনিবিড় ঝংকারে তা চাপা পড়ে, ললিত লঘু বাক্যে তাকে হারাই। আধুনিক বাংলা কবিতায় যেন অনুপ্রেরণা এবং অভ্যাস দুয়ের গূঢ়ত্ব আমরা না ভুলি, কথার আওয়াজ হারিয়ে কেবলমাত্র কথার শব্দ গেঁথে কবিতা লেখায় নিবৃত্ত হই। এই ক্ষেত্রে রচনার চপল ইচ্ছা-চাতুর্য আমাদের শত্রু; রচনায় বিরতির ধর্ম আমরা ভুলতে বসেছি। দ্রুত চল্‌তি কালের যোগ্য তরল বাক্যের আদান-প্রদানে কাব্য তৈরি হয় না। মগজে বিরল বাক্যের ঘনস্তর জমা হয়ে ওঠবার সময় থাকা চাই, যেখানে অবচেতনার জমিতে কথা নূতন হয়ে দেখা দেয়। বাক্যের সংস্কার ও নবীন সংসর্গ, সেই তন্ময়তা যা বাঙ্ময় অথচ অধিক, আমরা তারই শিল্পী। এখানে বলতে চেয়েছিলাম বিরল এবং সুসংযোজিত বাক্যের ওজন মেনে চলার কথা। সেই মাত্রা কীভাবে রাখা যায়? গভীর তন্মাত্রবোধ এবং শিল্পের তীক্ষ্ণ বিচারশক্তিকে একত্র হৃদয়ে ধারণ করবার সমগ্রতা কাব্যজগতে দুর্লভ। অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পের ঐ পথ, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ভাষার বিচারে আবো বহির্মুখী প্রসঙ্গ তুলব। আমার বক্তব্য এখানে ইঙ্গিতে জানাব,— দৃষ্টান্ত "দুরন্ত দুপুর" থেকে তোলা।

হাওয়া দোলা দেবে তারে (তাকে?); কাহাব খোঁপার গন্ধ (কার সে খোঁপার গন্ধ, বা অন্য কিছু— কাহার নয়); চোখ থুয়ে আকাশের নীলে (চোখ রেখে?)।

"সাধু" ভাষা যখন আধুনিক বাংলায় যথার্থই অসাধু এবং অচল, তখন দুয়ের মিশ্রণে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। যেমন অতি মিষ্টত্বে দুষ্ট "কবিত্বপূর্ণ" বাক্যের ব্যবহার বাদ দিতে হয়, তেমনি নষ্ট-স্বাদ সুলভ সাহিত্যের অভ্যস্ত ভাষাকে শিকেয় তুলে রাখা ভালো। হয়তো পরে কাজে লাগবে। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগের অগ্রণী সেই যুগের গতি আবো দূর পর্যন্ত মেনে নিয়ে আমরা যথাসম্ভব ডুবাও, শুকাও ইত্যাদিকে বর্জন ক'রে ডুবোও, শুকোও ব্যবহার করব। আমারে, তোমারে, নাই, মম, তব— অবস্থাবিশেষে অনিবার্য হলেও বর্জনীয় মনে করাই ভালো। যা মুখে বলি না তা কলমে লিখব না এরকম প্রতিজ্ঞার বিশেষ মূল্য

আছে। কবিতায় জায়গার অভাবে নানা অভিসন্ধির শরণাপন্ন হতে হয়, কিন্তু সংহতির দাবি অসতর্ক বাক্যের ব্যবহারে রক্ষা হয় না, শেষ পর্যন্ত বাধা পায়। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো কড়া নিয়ম নেই কিন্তু কান ও মনের দুই খাড়া পাহারা যেন সজাগ রাখি। ভাষার ব্যবহারে সূক্ষ্ম চেতনার অভাব শিল্পচেতনারই অভাব।

খেলাচ্ছলেও "কচি মুখে শাদা দাঁতে রোদের চিৎকার" চলবে কি না সন্দেহ। যদি ঐ পদ রাখতেই হয় তাহলে সমস্ত কবিতার ভঙ্গিও বদলানো দরকার। "নগরে শিবিরে গ্রামে ধু ধু জ্বলে যায় সিগারেট, নারীর শরীর" অচল, কেননা সিগারেটের দগ্ধদশা এবং নারীদেহে অগ্নিকাণ্ড ট্রাজেডি বা ট্রাজি-কমেডির একই কোঠায় ঐভাবে ফেলা যায় না। ভুলে-যাওয়া দগ্ধ নগরীর ভয়ংকরতা এবং প্রকৃতির ঔদাসীন্য অথবা মনের তীব্র অযৌক্তিকতা কবি অন্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, তার জন্যে শিল্পের গাঢ়তা প্রয়োজন, ভাষার ঈপ্সিত লঘুছন্দ সত্ত্বেও।

"আজই আজই আজই"— ত্রিত্ব ব্যবহারে বলার জোর কমেছে। একই স্থানে "স্তব্ধ নিষেধ তনুমনময় উত্তাল তব তনুমনময়" বেশি বলেই অকিঞ্চিৎ। অত্যুক্তির দেশ এই মার্কিনে সাহিত্যচর্চার ক্লাসে প্রায়ই নিবেদন ক'রে থাকি : শিল্পের ক্ষেত্রে ১+১=২ না হয়ে—৩ হতে পারে। হোক উপমা, হোক বাক্যের ব্যবহার, অনুপ্রাস— অধিক বাড়ালেই অভাব বাড়ে।

বিস্ময়চিহ্ন, প্রশ্নচিহ্ন কবিতায় বিকল্পে ব্যবহার্য। "একই বাসনার জ্বালা!" "তবু আঁখিতারা ভয়তন্ময়!" 'তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই এসে থাকে?" চিহ্নহীন হলে আরো একান্ত হ'ত, ভাষার একটু অদলবদল প্রয়োজন। ভাষার বিশেষ ব্যবহার ও ভঙ্গি অনিবার্য প্রশ্ন বা বিস্ময় জাগাবে এই কথা— চিহ্নের সাহায্য খঞ্জের যষ্টি। কবিতার লাইন স্বনির্ভর হলে ভালো, অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটবে কিন্তু তা-ও মূলশিল্পের খাতিরে, বাহিরের কোনো মূল্যবিচারে নয়।

ভাষার প্রসঙ্গে বলতে হয় বাংলা কবিতার প্রধান বিপদ তার গানের স্বরত্ব— অর্থাৎ গানের কথা হিসাবে ব্যবহৃত কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্যের সংগত বাক্যশিল্পের বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। গীতিকাব্যে গানের আমেজ লিরিকে লায়র -এর ধ্বনির মতো; অশ্রুত, অদৃশ্য ধ্বনিক পরিমণ্ডল। অসম্পূর্ণ রচনাকে পূর্ণতা দেবার উপায় এটা নয়। বৈষ্ণব-কবিতা গীতিমুখর হয়েও এই দুর্বলতা হতে মুক্ত, এমনকি

যথার্থ যা ধ্যানের গান, যেমন মীরার ভজন, কবিতা হিসাবেও সুদৃঢ়। বাংলা কবিতায় শাক্ত ও বৈষ্ণব গান, নিধুবাবুর টপ্পা, বাউল কীর্তন রামপ্রসাদী মাঝ-পথে চলেছে,— কখনো বা গানের বেশি ধার ঘেঁষে চলতে সুরের অতলে হারিয়েছে। অন্য বিচারে যেমন তার অন্য অপরিমেয় মূল্য, কবিতার তৌলে ঐ সুরে-হারানো গানের কথা যথেষ্ট ভাবের চেয়ে অনেক লঘু— সেখানে লোকসানের অঙ্ক। রবীন্দ্রনাথের গানও নানা পথচারী; তাঁর অনেক রচনা কথায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। তিনি নিজে বলতেন, ঐ-জাতীয় গানের কথা কথার প্রদীপ তৈরি, সুর না যোগ হলে আলো জ্বলবে না। যদিও তাঁর অনেক গানই কথার সম্পূর্ণ শিল্পে সৌকর্যে কাব্যের কোঠায় পৌঁচেছে। তাঁর পুরোপুরি কবিতা— এমনকি লঘুছন্দের লিরিক— বাক্য এবং ছন্দ-প্রসাধনে বলিষ্ঠ তা বলা-ই বাহুল্য। কিন্তু বাংলা গীতিকাব্যের রাজ্যে সুরের অপেক্ষায় অনিশ্চিত ও সদ্যঃপাতী কবিতা-রচনার দৌর্বল্য সহজে ঘুচবে না। এই বিপদকে সম্পদ ক'রে তোলবার প্রতিভা চাই।

অপরপক্ষে অত্যন্ত গদ্যভাব এবং ভারী কথার সিমেণ্ট-করা পদ আধুনিক কাব্যের আর-এক সমস্যা। অতি-শৌখিনতার মোহ ত্যাগ করতে গিয়ে এবং সংহতি ও চিন্তা-ঘনতার মননশক্তি ফোটাবার ন্যায্য প্রেরণায় আধুনিক পূর্বী ও পশ্চিমী কবি অনেক সময় আলো-হাওয়া খেলবার জায়গা রাখেননি। দরজা-জানালা-বন্ধ ভারী কথার আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়, ভাবের কাঠিন্যে মাথা ধরে। এ-ও দুর্বলতা, শক্তির পরিচয় নয়। মনে রাখতে হবে, বাংলা কবিতায় এই মাথা-ভারী মস্ত কথার দৌবাত্ম্য সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্যবহার হয়ে দেখা দিলেও এই মাননিক প্রতিক্রিয়া নকল সংস্কৃত এবং নকল পশ্চিমী। স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন প্রেরণা এনেছিলেন পশ্চিম থেকে, বহু ক্ষেত্রে তিনিও পর্বতপ্রমাণ সংস্কৃত বাক্য ব্যবহার ক'রে আধুনিক মনের দাবি মেটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর সফলতা আশ্চর্য, সেখানে তিনি বাঙালী শিল্পী, বা, শিল্পী, কিন্তু তাঁর স্খলনও আমাদের সাবধান জানিয়ে গেছে। খাঁটি সংস্কৃত কাব্যে এই কৃত্রিম বাক্যবিড়ম্বনা নেই তা বলা বাহুল্য। বাংলা কবিতায় যে-শিল্পী গানের নির্ভরতা এবং স্থূল বাক্যের ঘনত্ব এই দুই খাঁড়ি এড়িয়ে চলবেন তিনি জিতবেন।

মাননিকতার প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যেরও সতর্ক হবার সময় এসেছে। চেষ্টিত সংস্কৃত বা পশ্চিমী ভঙ্গির ব্যবহার নূতন বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল— সমালোচনায়, রসরচনায়, এমনকি অন্য ভাষার গদ্য বা পদ্যের বাংলা তর্জমায়। যাঁরা আজও

লুপ্ত ভৌতিক বাংলার ধারা বেয়ে সাধুভাষায় লেখেন তাঁদের কথা তুলব না ; তাঁরা অতীতের মর্যাদা নষ্ট করেন, বর্তমানেরও। নূতন প্রতিভাশীল বাংলা লেখক যদি যথার্থ প্রাচীন সংস্কৃত বা আধুনিক পশ্চিমী গদ্যজগতে শিল্পের নিভৃত প্রয়োজনে প্রবেশ করেন তাহলে তিনি মুক্তি পাবেন, তাঁর ভাষা সহজ আত্মীয়তায় সাবলীল হয়ে দেখা দেবে। সংস্কৃত কথা বাংলার বিশেষ সম্পদ, সেই অক্ষয় খনি থেকে নতুন ক'রে বাক্য সংগ্রহ, সংযুক্ত বাক্যের উদ্ভাবন চলতে থাকবে। কিন্তু যেমন গুণী পশ্চিমী লেখকের হাতে ক্ল্যাসিকল্ ভাষার সঙ্গে অজস্র প্রাণবান বহুদেশীয় ভাষা নিত্যনূতন ঐশ্বর্যধারায় একত্র মিলে মূল ভাষাকে আশ্চর্য পুষ্ট করেছে, তেমনি বাংলা ভাষায় আরবি, ফার্সি, এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক জগতের নিত্যপ্রয়োজনীয় পশ্চিমী বাক্যের অধিকতর ব্যবহারে বাংলার সৌকর্য বাড়বে। কিন্তু সচল স্রোত থেকে এই ভাষা তুলতে হবে। তা না হলে আবার সেই ক্লিষ্টতা দেখা দেবে যার বিরুদ্ধে এই আয়োজন। বাংলা গদ্যে বা পদ্যে অত্যন্ত চক্রিত, ঘূর্ণিত, দীর্ঘায়িত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক শব্দের ঝড় এবং ভারী ইংরেজি বাক্য অতি-আধুনিকদের মধ্যেও ভয়ংকর ব্যাধির মতো প্রবেশ করেছে, সমুদ্রপার থেকেও সেই-সব রচনা পড়লে মাথা ঘোরে। যা সহজে বলা যায় তা দুরূহ করলে বা অযথা বিদেশী ভাষা ব্যবহার করলে গভীরতা বা মানস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা বাড়ে না। নানা জ্ঞানের চেতনার উল্লেখ ও প্রয়োগের উজ্জ্বল হৃদয়বান ভঙ্গি আছে, উৎকর্ষবান লেখক তার সন্ধান জানেন। যাঁরা পুরোনো চালে বক্তব্যের অভাবকে সাধুভাষার ঘনঘটায় ঢাকা দেন— সাধারণত সেই-সব রচনার সাব্-এডিটিং করলে সমস্ত প্রবন্ধকে দুই বা তিন পাঠ্য-প্যারাগ্রাফে পরিণত করা যায়— সেই-সব জাত-মানা পৌত্তলিকদের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা নূতন ক'রে নকল ক্ল্যাসিকল্ বা পণ্ডিতী মর্যাদা অর্জন করতে চান তাঁদের স্বরচিত গলার ফাঁসে তাঁদের রচনা কণ্ঠাগত। পদ্যেও এই দুরারোগ্য বিড়ম্বনা "সাধু" ও "অসাধু" দুই ভাষার রচনায় বিদ্যমান— চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত ক্রেংকার ঝংকার সহযোগে বা ভারী কথার স্তূপে কেউ পাঠককে এবং আপনাকে চাপা দিতে চা... । এই-সব রচনা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশবার পূর্বেই কর্ণপটহ ছেঁড়বার সম্ভাবনা। অথচ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ রাজপথ খুলে দিয়ে গেছেন, সেই পথে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রাচীন ও নবতন শিল্পসম্ভার খাঁটি বাংলা ভাষায় চলাচল করেছে। গদ্য-বাংলার মনীষী প্রমথ চৌধুরী "ছিন্নপত্রে"র প্রবর্তিত উজ্জ্বল ধারায় বিচিত্র ঐশ্বর্য রেখে গেছেন ; জ্ঞানের, শিল্পের

প্রসাদগুণের কোনো অভাব ঘটেনি। বাংলার খবরের কাগজে এখনো ভূতের কীর্তন, ভাষার কৃত্রিমতার দিক থেকে— এর চেয়ে ক্লিষ্ট, নকল সাধু, গঙ্গার জল-মেশানো ইংরেজি মার্কিনি কাগজি ভাষার একত্র প্রমাদ কল্পনা করাও শক্ত। যাকে বলে, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম— কাগজি ভাষায়— তা অবশ্য আছে। কিন্তু বেশি নয়। এই নকল বাংলার লেখকদের কিছু কলম বা বাংলা টাইপ-রাইটর স্বতন্ত্র ম্যুজিয়মে রাখা থাকুক— ভবিষ্যৎ ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাবে।

যাঁরা আধুনিক, যাঁরা সূক্ষ্ম সংস্কৃতিবান, যাঁরা সচেতন শিল্পী তাঁরা যেন ভাষার জন্যে কেবলমাত্র সংস্কৃত অভিধান না উল্‌টিয়ে বা পশ্চিমী রচনাকে সম্পূর্ণ ভুল ভঙ্গিতে তর্জমা না করে পাড়ার চারদিকে কান ও মন নিয়ে ঘুরে বেড়ান। প্রতিবেশী মুদী, ছুতোর, কামার, মাঝি, রংরেজিনি, কুমোর, মিস্ত্রি মজুরের কাছে তাঁরা ঝুড়ি-ঝুড়ি মহার্ঘ কথা পাবেন। গ্রাম্য কলাশিল্পী, ঘরের মেয়ে, অভিজ্ঞ বুড়োমানুষের কথায় তেজ আছে, কল্যাণ আছে প্রাণ আছে— তারা ছাপাখানার ভূতে-পাওয়া নয়, খাঁটি বাংলার মানুষ। দেখা যাবে তার মধ্যে শত-শত জাতহীন কথা আরবি, ফার্সি এমনকি পশ্চিমী সরস হয়ে মিশেছে। সঙ্গে-সঙ্গে পণ্ডিতের পাঠশালায় টোলে নানা স্তরের সংস্কৃত বা অর্ধ-সংস্কৃত ভাষা তুলে নিতে হবে, যা বদলিয়ে বা নূতন সহযোগে ব্যবহার করা যায়। তা ছাড়া ইংরেজ মার্কিন দূত সর্বত্রই আছে, স্বাধীন ভারতে তাদের প্রতিপত্তি কমেনি, বেড়েছে বলেই শুনতে পাই— ইংরেজি বই এবং এদের ভাষার সংসর্গ যাবার নয়। কিন্তু বীরবলের মন কই, তাঁর হালখাতার বদলে দুর্বল পাণ্ডিত্যের লেজার-বই আজ বাঙালী সাহিত্যে ছড়ানো। বাংলার স্বাধীন মননশক্তি, আত্মপ্রকাশের খাঁটি বাংলা ভাষা এখনো পুরোপুরি দেখা দিচ্ছে না। মাটিতে শিকড় গভীর না হ'লে বিশ্বজগতের আলো-হাওয়া কাজে লাগবে না— বাংলা সাহিত্য আপন সরস ভাষার সন্ধান পেলে নানান আকাশে তার পত্রপল্লব বিশ্বজনীনতায় প্রকাশ পাবে।

কথার দৃষ্টান্ত দিই। শক্তি শক্তিমান শুধু নয়, জোর জোয়ান দুই-ই চলবে; চল্‌তি কথায়, এবং গম্ভীর জ্ঞানের ভাষায়। বাংলায় থিসিস্ লিখতেও যেন আধুনিক বাঙালী পুস্তক বই দুই-ই ব্যবহার করেন; মসীর বদলে কালি তাঁর লেখায় বেশি কাজে লাগবে। অন্তঃপুর, অন্দর; সাফ, পরিষ্কার; প্রাচীর, দেওয়াল; সভা, মজলিস কোনোটাই কাব্য বা ইতিহাস দর্শনের গম্ভীরতম আলোচনায় ত্যাজ্য নয়। সবটাই নির্ভর করে লেখকের যথার্থ মাত্রাজ্ঞানের

উপর; নূতন বা পুরোনো অভ্যাসের অনুবর্তিতায় নয়। বৈজ্ঞানিক কথা, ব্যবহারিক পারিবেশিক জীবনজীবিকা সংক্রান্ত কথা, দেশের নাম, নূতন উদ্ভাবিত জিনিসের বা বিদ্যার নাম পশ্চিম বা পূর্ব থেকে নির্ভয়ে নেওয়া যায়, কবিতায় গদ্যে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় যদি খাঁটি বাংলা মন এবং ভাষা আমরা না হারিয়ে বসি। রাষ্ট্রিক প্রসঙ্গে জাপানি ডায়েট্‌, ইংরেজি পার্লামেন্ট, ইরানি বা তুর্কি মজলিস, এমনকি 'আরব-এশিয়ান ব্লক' বাংলায় চলবে। রাশিয়ান ম্যুজিক, ইস্পানি বাস্ক বা ক্যাটালনিয়ন নির্ভয়ে বাংলা সাহিত্যে আগন্তুক। শুধু পুরোনো স্টেশন মোটর ইত্যাদি নয়, নূতন রেডিও (বেতারও), এরোপ্লেন (ও হাওয়াই জাহাজ), অ্যাটম বম্ব্‌ (এবং আণবিক বোমা), বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য। রেডার, টেলিভিশনের তর্জমা হয়তো ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই। হিন্দি তর্জমাবাক্য হয়তো আরো বেশি কৃত্রিম হবে,— এ-বিষয়ে বাঙালী সাহিত্যিকের বিচার মান্য, কোনো রাষ্ট্রিক প্রতিনিধি বা আপিসের হুকুম খাটবে না। বাঙালী কবি বলবেন, কীভাবে নিয়ন লাইট (বা নিয়ন আলো), নাইলন বা ডেক্রন তিনি কাব্যে ঢোকাবেন। রেশমের সঙ্গে সিল্কও লিখতে দোষ নেই। কেননা পাড়ায়-পাড়ায় সিল্কের শাড়ি ছড়িয়েছে। হয়তো ইস্পাতের সঙ্গে স্টীলও চলবে, অ্যালুমিনম্‌ তো বটেই। হার্মোনিয়ম-নামক বেসুরো অসুর-যন্ত্র বাজিয়ে প্রাচীন ভারতীয় গান বধ করতে অনেক তথাকথিত উৎকৃষ্ট গায়কদের কিছুমাত্র বাধে না— তাঁদের তুবীয় অনুনাসিক কীর্তি দলীয় আহা-ওহো-সহযোগে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, অথচ হার্মনি বলতে দ্বিধা কেন। অর্কেস্ট্রা চলবে, ঐকতানও ; হয়তো অর্কিডের সংস্কৃত নাম চলা উচিত হলেও চলবে না। পুরোনো কথার নতুন ব্যবহার প্রশস্ত, কোনো ক্ষেত্রে একেবারে তাজা বিদেশী বা স্বদেশী কথা সোজাসুজি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করবে।

সতর্কতা ও সাহসের নিয়ত উদ্যম বাংলার নবীন সাহিত্যে কামনা করি। আমাদের কারো পক্ষেই হয়তো বলা সম্ভব নয় নূতন কোন কবির লেখায় যথার্থ সাম্প্রতিকতা সৃষ্টিশীল হয়ে দেখা দিয়েছে, কে সেই রবীন্দ্রযুগবাসী— অর্থাৎ বাঙালী লেখক— যার রচনায় ছন্দ ভাষা উপমার পরিধি বিস্তৃততর, যার শিল্প সার্থক প্রতিভায় প্রয়োগের উদ্ভাবনায় উত্তীর্ণ। "দুরন্ত দুপুর"-এর লেখক সেই নূতন উদ্দীপিত পথে এগিয়ে যাবেন তাঁর কবিতা পড়ে সেই আশা মনে জাগল।

নরেশ গুহ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "দুরন্ত দুপুর" সম্পর্কে আলোচনা। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত

ছন্দ ও কবিতা

বস্টন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

…কবিতা লেখা এক জটিল সূক্ষ্ম ব্যাপার; তার মধ্যে কত সুরের মনন, অনুভূতির সুরগ্রাম, বহু-জাগ্রত প্রয়োগের চেষ্টা একত্র জড়িত হয়ে হঠাৎ দেখা যায় তা ভাবলে নতুন কিছু লিখতে দ্বিধা হয়। সৌভাগ্যক্রমে সমস্তকে বিস্মৃত ক'রে এক-একটি লেখবার মুহূর্ত অনিবার্য আবার ফিরে আসে, শুরু হয় ডুব-সাঁতার দেওয়া। সজ্ঞানে মনকে কিছু শেখানো যায় মধ্যে-মধ্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কতটুকু সৃষ্টি-মগ্নতার কালে কাজে লাগে জানি না। আঙুলের অভ্যাস ক্রমাগত শুধরিয়ে বীণা-বাজিয়ে খোঁজেন শুদ্ধতর অঙ্গুলিচালনা, যেটা ব্যক্তিগত হয়েও তারও বেশি। এই সাধনা প্রত্যেক কবিকে শিল্পীকে ক্রমাগত নতুন ক'রে মেনে নিতে হবে।

সেদিন হাইফেজ্-এর ভায়োলিন শুনতে গিয়েছিলাম . তাঁর চোখ-মুখ এমন-কি মন যে অন্যত্র কোথায় চলে যায় অথচ ছড়ের একটি টানও মুহূর্তের কম্পনে ভ্রান্ত নয়। সমগ্র শ্রুতিকে অধিকার ক'রে কী আশ্চর্য সংগীত এবং নিঃশব্দতার ঐক্যজাল: তার পিছনে কত কঠিন সৃষ্টি-কৌশল এবং আত্মবিলীনতার শক্তি। অবাক হয়ে দেখছিলাম, শুনছিলাম। Mozart-এর একটি symphony; Haifetz সেই ইন্দ্রলোক সকলের সামনে উদ্ভাসিত করলেন। এক হিসেবে প্রত্যেক কবি নিজের কবিতার স্রষ্টা এবং শ্রোতাও— বাহিরের কান দিয়ে শুনতে শেখা তাঁর ব্যবসার অন্তর্গত।

আপনার প্রবন্ধ[1] প'ড়ে এই কথা আমার মনে হ'ল।…

দুই

বস্টন, ১৬ মার্চ ১৯৫৬

নামটার বানান "মার্গারিঠা"ই[2] থাক: পর্তুগীজ উচ্চারণে ট-এর চেয়ে ঠ-ই কাছে যায়। দৈবক্রমে নিষিদ্ধ পর্তুগীজ রাজ্যে এই ভারতীয় আমি প্রবেশ

১ অমিয় চক্রবর্তীর 'পালা-বদল': 'কবিতা', পৌষ ১৩৬২

২ 'কবিতা' চৈত্র ১৩৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাণ্টা মারিয়া দ্বীপে' দ্রষ্টব্য।

করেছিলাম— Azores-এ Santa Maria দ্বীপে। Air France-এর প্লেনে এঞ্জিন গোলমাল হওয়ায় ঐ সুন্দর দ্বীপে নেমে সমুদ্র-দিগন্তঘেরা করুণ, দুরান্ত, দরিদ্র গ্রামে দু-দুবার কয়েক ঘণ্টা ছিলাম। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে। তা না হলে ভারতীয়কে এখন পর্তুগীজ সীমানায় ঢুকতে দেয় না, বিশেষ কারণ ব্যতীত। কিছু ঘটনা, কিছু কল্পনা ঐ আমার মলিন দ্বীপ এবং ঐ দ্বীপের বাহিরে বৃহৎ অন্তরঙ্গ য়ুরোপ থেকে মিশিয়ে কবিতা লিখেছিলাম। আপনাদের ভালো লেগেছে জেনে গভীর তৃপ্তি বোধ করছি। 'চল্‌তি' লীরিকগুলিও[৩] ঐ দেখায় ভাবায় মেলানো চিত্রপর্যায়ী, যদিও সংক্ষিপ্ত।

কোনো নতুন কাব্যের সূচনা এই কবিতায় আপনি দেখেছেন, হয়তো আমার বিরল স্বল্প কবিতার ধারা অন্য খাতে বইবে। কিন্তু কী করি বলুন। বুকের ভিতরে গীতিকাব্যের সূচনা সমগ্র হয়ে উঠতে চায়, বাংলা ভাষায় গুঞ্জিত তার সঞ্চরণ অনুভব করি অথচ কেবলমাত্র সময়ের অভাবে শিল্পমেঘটুকু ভিড়ে ধাক্কায় বহুতর টুকরো কাজে কোথায় হারিয়ে যায়। অভিযোগ ক'রে লাভ নেই। মার্কিনের তুমুল জীবনে প্রবেশ ক'রে বাংলা লীরিক লেখার এই সাধনা: এবং অনিবার্য আমার এই সিদ্ধির অভাব। তবু মধ্যে-মধ্যে চলতি সংবাদ "কবিতা"র দপ্তরে পৌঁছিয়ে দিই। আখ্যায়িকায় রঞ্জিত দু-চারটি পদ রচনা করতে পারলে সুখী হতাম— পৃথিবীতে এসে যা দেখা গেল তার বিমিশ্র সহজ একটি আক্ষরিক পরিচয়, সাক্ষীর বিমুগ্ধ আত্মভাষায় স্বীকৃতি। কিছু আপত্তি, কিন্তু সব বিরুদ্ধতা ভুলিয়ে-দেওয়া আশ্চর্য সংসারের স্রোতোধ্বনি, আশ্চর্য রঙিন কাহিনী যা দেখা-শোনা যায় না। ভাষাকে আরো গাঢ় অথচ স্বচ্ছ করতে পারলে জীবনের ভঙ্গি আরো বেশি ধরা-ছোঁয়া যেত; ইচ্ছে করে প্রতি ঘটনার সঙ্গে তার নাট্যগত যুক্ত পরিমণ্ডল ঠারে-ঠোরে পৌঁছিয়ে দিই। কিন্তু এর জন্যে শুধু অভিজ্ঞতার শক্তি নয়, সময়ও চাই। অনেকখানি সময়, পরীক্ষার অবসর, কাগজের নির্মম অপচয়। ঐ সাণ্টা মারিয়া দ্বীপে যদি বন্দী ক'রে রাখত তাহলে হয়তো দশরকম বাংলা লীরিকে দাসখত লিখে একদিন উদ্ধার পেতাম। (ঠিক এখন পর্তুগীজেরা এই যুক্তি শুনত না)। বাধ্য হয়ে মনের মধ্যেই সাণ্টা মারিয়া আবিষ্কার করতে হবে, এবং তার চতুর্দিকে পাখা মেলবার আকাশ, নয়তো উপায় নেই।

'বৈশাখী' (১৩৬৩) বার্ষিকীতে প্রকাশিত

বলতে ভুলেছিলাম : 'দিঘি' কবিতায় আপনি বিবিধ ছন্দের মিশ্রণ লক্ষ্য করেছিলেন (অথচ একই ছন্দের গভীরে তাদের মিলিয়ে রাখতে চেয়েছি); তাতে খুব উৎসাহ পেয়েছিলাম। কিছু অভিসন্ধি ঐ কবিতায় লুকোনো ছিল, ধরা পড়ব ভাবিনি। "দূরযানী"র একটা লীরিকে ("কিছু নয়, কিছুই নয়…") ঐরকমের প্রক্রিয়া ছিল, কিন্তু অন্যভাবে। লক্ষ করেছি, বিষয়বস্তু যত সূক্ষ্ম, বিহ্বল, দূরবর্তী, সেই অনুপাতে ছন্দের বাক্যের দুঃসাহসও অনেক সময় বেড়ে যায়; সংগতিও রক্ষা করা সহজ হয়।

ঠিক কবিতা-রচনার কালে নানা সূক্ষ্ম পরীক্ষা অজ্ঞাতে চলতে থাকে, পুরোপুরি মনের কোঠায় পৌঁছলে বুদ্ধির দৌরাত্ম্য প্রবল হয়ে ওঠে। নানা পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে যুক্তিতর্কের জোরে একমাত্র পথ নেওয়া বড়ো কঠিন, এমনকি শিল্পের কৌশলও দ্বিধান্বিত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। পরে এবং আগে বহু কসরত করা চাই— তার-বাঁধা, মীড়-টানা, ঝালার কাজ, সুরের মিশোল। কিন্তু পুরোপুরি আলাপের সময় ডুব-সাঁতারের বেলা, তখন আঙুলে কুহক লাগে, "magic hand of chance"-গোছের ব্যাপার। অন্তত এইভাবে কোনো-কোনো শিল্পী অহেতুক একান্ত কারিগরির সন্ধান পান। বেদনার পরমতা, যা তাপকে আগুন ক'রে তোলে তার কথা সব সৃষ্টির মূলে, কবি যদি ডেস্কের ধারে ব'সে তার সন্ধান হারান তাহলে অবশ্য সবই লোকসান তা বলাই বাহুল্য।

একবার ভালো ক'রে ছন্দের প্রসঙ্গে নামব। 'কবিতা'য় যে আলোচনা জ'মে উঠেছে তাতে আমার কৌতূহল সজাগ হয়ে উঠেছে, সতর্ক হয়ে ভেবে দেখেছি। কিন্তু এখনো বোধহয় আমার দিক থেকে কিছু না বলা ভালো। যে-ধরনের প্রয়োগে উদ্যত হয়েছি তাতে আরো এগিয়ে যেতে না পারলে বোধহয় বলবার অধিকার পাব না। নিজেকে ব্যক্ত করবার বেগে কোন্ সিঁড়িতে উঠে এসেছি— বা নেমেছি— তা ঠিক জানি না। যতটা পারি কাব্যছন্দের মধ্যে থেকেই তার পরিসর বাড়াবার কিছু আয়োজন করেছিলাম। তাছাড়া হয়তো আমার উচ্চারণ-পদ্ধতিও কিছু বদলেছে, বা স্বতন্ত্র, হয়তো তাকে মানবার কোনো কারণ নেই। [প্রথমে লিখেছিলাম "ভারতী আকাশে" ॥ তারপর অত্যন্ত ব্যক্তিগত অভ্যাসের সাহসে লিখলাম— "এই তো এলেন ॥ ভা— র— ত— বর্ষেরা— কাশে ॥" যেন মৃত্যুস্তরের ধীরোচ্চারিত এক-একটি অক্ষর ঐ স্থানকালপাত্রের অনুযায়ী সংস্কারে প্রশ্রয় পেল। কিন্তু যদি বলেন সমগ্র কবিতার কাঠামোয় ঐ লাইন গদ্যধর্মী এবং বহির্ভূত তাহলে তর্ক করব না।]

অবশ্য ফরাসী Vers Libre-এর এলাকায় বারে-বারে নেমেছি। কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন আটপৌরে গদ্যের ঈষৎ ছন্দ-মিশ্রিত চালচলন (যেমন Whitman-এর free verse-এ) আমার কাব্য-সাধনার একান্ত পরিপন্থী। আমার নিজের দিক থেকে বলব, ঢের বেশি তৃপ্তি পাই অন্তর্লীন ঝংকৃত এবং সংহত Vers Libre -এর রাজ্যে, যেখানে ব'সে লিখতে পারি "দুরূহ আরব্ধ পথে॥ তোমার মুখের জ্যোতি পৌছিয়ে দেবে॥" জানি না ঐ মণি-পদ্মের আরাধনা— কবিতার পরতে-পরতে ছন্দের নিক্কণ— যা আমার মনে বাজে— তা বাহিরে স্পষ্ট হয়েছে কি না। না যদি হয় তাহলে আর কিছুই বলবার নেই।

আপনি জানেন কাব্য-রচনায় আমার দাবি অতি সামান্য ; দূরে থাকি, ছন্দে উদ্ধত গলার আওয়াজ যে কোথাও একটুও পৌছবে সে-আশা দুরাশা মনে হয়। বাংলা ভাষায় প্রবাসীর অঞ্জলি দিয়ে গেলাম, বাংলার কাব্যবেদীতে তা গ্রহণীয় কি না তা আমার বিচারের বহির্ভূত। অবশ্য হৃদয়-মনের দাবি কোনো লেখকই পরিত্যাগ করতে পারে না— কৃতিত্বের দাবি নয়, সমবেদনার দাবি। সেরকম দাবির অন্ত নেই, অভিমানেরও নয়।…

বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত চিঠি। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন, "সামনে কী আছে জানি না। যে-পথ দিয়ে এসেচি তার দিকে ফিরে চেয়ে আশ্চর্য লাগে। বাঁকে বাঁকে এল অভাবনীয় মুহূর্ত, কত পালাবদল, পরিবেষ্টনের ইতিহাস।

"শুধু নিজের চৈতন্যের আনন্দ নয়, যে-বহির্ভূমিকার মধ্য দিয়ে এসেচি তার ছবি আমাকে নিবিড় আনন্দ দেয়। জীবনের স্মরণীয়তা মনে ভিড় করেচে। সেই গাঁয়ের মাঠ, তীরে তীরে লোকালয়, হাট বসেচে, মেয়েরা জল নিয়ে চলেচে, কল্লোলিত জীবন যা নিয়ে লিখেচি আমার ছোটোগল্প। সেই ভরা দুপুরের আলো, বসন্তের গুঞ্জরিত প্রহর, কখনো মেঘ ক'রে এল, আনাগোনার অশ্রুত সুর যা নিয়ে গেঁথেচি আমার গান। তারই মধ্যে জাতীয় জীবনের অধ্যবসায়, রাষ্ট্র এবং শিক্ষার কাজ— সমাজের প্রসঙ্গে কত ভেবেচি, কত লিখেচি। শান্তি-নিকেতনের কোনায় এলাম, নিরাভরণ উৎসব জমে উঠল, নানাজাতির মানুষকে নিয়ে মেলবার পালা।

"সমস্তের ভিতর দিয়ে আমার পরিপূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় খুঁজেচি— কোথায় থাকবে তাব চিহ্ন।

"হয়তো আমার লেখায় কিছু থেকে যাবে কিন্তু সংসারে অবিনশ্বরতার দাবি টেঁকে না। এখন আমার ভাবতেও ক্লান্তি বোধ হয়। লেখবার সময় গেছে। মনের মধ্যে ছবি দেখি। তোমাকে বলতে 'ারি না আজ আমি কোন্ দৃষ্টি-লোকে উত্তীর্ণ হয়েচি।"

শান্তিনিকেতনে চৈত্রের আকাশ প্রজ্বলিত; আশ্রমের খানিকটা সবুজ জটলাকে ঘিরে রয়েছে দৈগন্তিক মরীচিকা। রবীন্দ্রনাথ যা বললেন তার সঙ্গে বর্ষশেষের আকাশজোড়া দৃষ্টির মিল রয়েছে। এবং কেন্দ্রের শ্যামল সৃজনতাকে মিলিয়েই তার সংগতি।

দুই

কাঁকরের খোয়াইয়ের বুকে পঞ্চবটী বেঁচে থাকবে; শুকনো মাঠ জয় ক'রেই ছায়াতরুময় বিদ্যার আয়তন রচিত হ'ল।

আজকের অতি ধূসর পৃথিবীতে যে-দৃষ্টির বলে বিশ্বভারতী গড়া হয়েছে তার রহস্য ভেদ করতে মানুষের সময় লাগবে।

ধুলোর তলে ভূমিকা আছে যেখানে শিকড় পৌঁছনো দরকার। সেখানে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আশ্রয়— যা সর্বমানবিক; তারই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি উঠে আসে উজ্জ্বল হাওয়ায়। প্রতীকী পত্রপল্লব বেঁচে থাকে দুয়ের যোগে। দর্শনতত্ত্বে যাব না, কিন্তু মাঠের কাব্য পড়তে গিয়ে এই-সব কথা মনে হচ্ছিল।

বারে-বারে আসি যাই, এইটুকু বুঝতে পারি এখানে প্রাণের সংসর্গ বেড়ে চলেছে। বেশি কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিনি: হয়তো কোনো গাছের গুঁড়ি বাঁধানো হ'ল, পাশে কেউ এঁকে দিয়েছে শঙ্খচক্রের আলপনা; চৈনিক ছাত্র ত্রিপিটক পড়ছে; মেয়েদের টেনিস্ খেলার ঐ নূতন জায়গা; চায়ের বৈঠকে মাটিতে বা মোড়ায় ব'সে নানাদেশীয়ের আলাপ চলছে। সমবায় দোকানের পাশে ল্যাবরেটরির ঘর তৈরি হ'ল। এক-গাড়ি কাঁকর ঢালা হয়েছে শ্যামলীর সামনে, তার সঙ্গে খুব মানিয়েছে কাঁটা-অলা শিমুল গাছটার আগুনে ফুল। সোনাঝুরি গাছ হঠাৎ অত্যন্ত হলদে হয়ে ওঠে; নিম ফুল, নেবু ফুল, মাধবী ঋতুচক্রে ঘুরছে। চলছে, বদলাচ্ছে। বিদ্যাভবনে পাণ্ডুলিপি নিয়ে ব্যস্ততা, শিল্প-বিভাগে গান, নাচ, ছবি। মাইলখানেক দূরে কারখানা, কৃষি, চরকা— আর-একটি কর্মকাণ্ড। কিন্তু শাখাপ্রশাখা সংলগ্ন হয়েছে যে-আশ্রমে তার সন্ধান পাই বিশেষ কবির দৃষ্টিলোকে।

আমার কাছে সব চেয়ে শাশ্বত লাগে এই-সব হঠাৎ-হওয়া প্রাণের যোগাযোগ, কেমন ক'রে এই মাঠের মধ্যে সঞ্জাত হ'ল। বিদ্বজ্জনের সমাগম, বর্ষা-বাসন্তী উৎসব, মাটির ঘরে বিজ্‌লি-বাতি, ভারতীয় নানা প্রদেশের ছেলেমেয়ের সাহিত্য-সভা— একটি অদৃশ্য পরিধির মধ্যে নানা স্রোত এসে মিলছে।

কণায়-কণায় ধারা শুকিয়ে যাবে, অনেকখানি দূর পর্যন্ত তাকিয়েও বিশ্বাস করতে পারি না।

ভারতবর্ষ কোন্ দিকে চলেছে? বাংলার বিরল-কুঞ্জে আতিথ্যের এই প্রাঙ্গণ খোলা থাকবে না? যা বাংলার প্রতিভায় সমন্বিত হয়েছে তাকে হারাবার দায়িত্ব আমরা সহজে নেব ব'লে মনে হয় না— প্রাদেশিক স্বরূপতাকেও আমরা মানতে শিখছি।

যা হয়েছে তা অপ্রমাণিত হবে কেমন ক'রে? উৎকর্ষ-কেন্দ্রের একটি সফল রূপ মানুষের ভাবনায় থেকে যাবেই।

অথচ শান্তিনিকেতনের কাজে একটি অপরিপূর্ণতার চেহারা আছে যা চোখে তৃপ্তি দেয়। অর্থাৎ শেষ হয়ে ফুরিয়ে যায়নি। কোথাও একটু গড়বার জায়গা আছে আমাদের। কিছু না হোক ছুটিতে এসে গাছতলায় বই পড়ব, তালতড়ির রাস্তায় কুটীর বাঁধব যদি সাধ্যে কুলোয়। এখানকার হাওয়ায় মিশে আছে গান, রবীন্দ্রনাথের গান। দশজনকে যদি বলি জায়গাটা ভালো লাগে তাতেও মন খুশি হবে। সৃষ্টির মানস এইভাবে পূর্ণ হতে থাকে।

তিন

রবীন্দ্রনাথের অনুষ্ঠিত কর্মে তাঁর যে অন্তর্দৃষ্টির রূপ দেখতে পাই তারই কথা বলছিলাম। ভাষায় এবং অন্যবিধ শিল্পে তিনি পৃথিবীকে যে-দৃষ্টিদান ক'রে গেলেন তার পরিচয় এখানে দেবার চেষ্টা করব না।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন কথার শেষে বলছিলেন,

"কী থাকবে তার ভাবনা আমার গেছে। উপনিষদে বলেচেন— কৃতং স্মর। অন্তরের দিক থেকেই বলেচেন।"

আমাদের দিক থেকে মনে হয় তাঁর শিল্পরূপ, যার মধ্যে নিঃশ্বসিত হচ্ছে যুগান্তরের বেদনা, বসন্তবিকল্পিত কাহিনী এবং কত আগামী বৎসরের পর্যাপ্ত ফল— তার পরিচয় যদি কবির অন্তরের বহিঃপ্রকাশও হয়, কৃতকর্মের অমরত্ব রয়েছে তাতে। সংসারের এত ধ্বনি এবং ছন্দ যে কারুলোকে বিধৃত হ'ল তার ক্ষয়তা বিশ্বলোকালয়ের অস্তিত্বের উপরই নির্ভর করে। ইতিহাসে দেখেছি বাক্যের অক্ষয়তা— যে-বাক্য প্রতিভার উচ্চারিত। হন্তারক রাষ্ট্রবীরের গর্জন মিলিয়েছে প্রাচীন ইটালির পাতালে, সহমরণের ভিড় আজও কমেনি নতুন প্রতাপাদিত্যের পাড়ায়; দান্তের বিয়াত্রিচে কাব্যের অক্ষরে ভাস্বরা, স্বর্গলোকের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্গীয় পুলিস পুরোহিত জমিদারের দল যখন পাথুরে সংসারের গুঁড়োয় উড়ে যাবে, ক্ষণজীবী উগ্রতার অতীত খাঁটি বাংলার প্রাণ মরবে না। তখনো কবির কণ্ঠস্বর শুনবে পদ্মাতীরের মানুষ, গানের দূরদৃশ্যমান আকাশবেষ্টনীতে— সেই কবির যিনি আজ সায়াহ্নজ্যোতির অক্ষরে কবিতা লিখছেন। শ্যামল প্রান্তরে সংশ্রিত হয়ে থাকল প্রতিদিনের অপূর্বতা যা ব্যক্ত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়।

চার

বাস্তব কাকে বলে জানি না, সত্যকে দেখবার তেজ রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহুধাশক্তির যোগে আজীবন প্রকাশিত হয়েছে।

আজ নববর্ষে তিনি মানুষের দিকে তাকিয়ে বলছেন, "সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ" কল্পনা করতে পারেননি ; এই বিকারের ভিতর দিয়ে "বহু কোটি জনসাধারণের প্রতি···অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য" প্রকাশিত। পররাষ্ট্রের নির্লজ্জ লোভ একদা যে-ভারতবর্ষকে ত্যাগ করতে বাধ্য হবে সেখানে মারীর আসন্নতা তৈরি হ'ল। তিনি স্পষ্ট দেখছেন "ভারতবর্ষের ···নিদারুণ দারিদ্র্য···অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য মানুষের শরীর মনের যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার ··নিরতিশয় অভাব।"

আশি বৎসরের ধ্যানে মানুষের দুঃখকে তিনি ভোলেননি, মানুষকে বিশ্বাস করেন বলেই তার ভ্রষ্টতা তাঁকে বিঁধছে। হন্তেনীতিকে আর্থিক বা পারমার্থিক অঞ্জলি দেননি— যে-পক্ষেরই হোক— কেননা পাপের প্রসারে মানুষের ক্ষতি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভয়হীন, কেননা তা কারুণিক এবং দলীয় স্বার্থের বিরোধী।

জীবনের প্রথম প্রকাশিত বইয়ে এই সংবেদনশীল সত্যদর্শিতার সাহস নিয়ে তিনি অবতীর্ণ। "কবিকাহিনী" বেরিয়েছিল তেষট্টি বছর আগে।

> যা দেখিছ যা দেখেছ তাতে কি এখনো
> সর্বাঙ্গ তোমার, গিরি, উঠেনি শিহরি ?
> কী দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,
> রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল···
> কত কোটি কোটি লোক, অন্ধ কারাগারে
> অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
> ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
> অবশেষে মন এত হয়েছে নিস্তেজ,
> কলঙ্ক-শৃঙ্খল তার অলংকাররূপে
> আলিঙ্গন ক'রে তারে রেখেছে গলায়।

কিশোরকল্পনাকুঞ্জে আর্টিস্টের সহজ অধিকার, কিন্তু যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ আবিষ্ট ছিলেন কল্পনায়, অর্থাৎ সত্যের যা রুক্ষ তাকে কোনোদিন বাদ দিয়েছেন কাব্যদর্শনে, তাঁরা বাস্তববাদী হতে পারেন কিন্তু ভ্রান্ত।

কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহংকার !

ষোলো এবং আশি বৎসরের আশ্চর্য মিল দ্রষ্টব্য— বাইরের যে-অবস্থার বর্ণনা রয়েছে তারও বিশেষ বদল হয়নি।

পশ্চিম-সভ্যতার বৃহৎ দানকে মানবার শক্তি যাঁর আছে তাঁরই পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব। এখানে আজকের এবং বালক রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ নেই। তখনো তিনি সমাজে বিশ্বভারতীয় সত্যকে কাঁচা ভাষায় বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর কাব্যাদর্শের ভূমিকা রচিত হয়েছে খোলা চোখের জগতে। বর্বর প্রতিঘাতের দ্বারা নয়, সম্বন্ধের যাথার্থ্যে তিনি সন্ধান করেছেন ধ্রুবকে।

কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস।

সূক্ষ্ম অনুভূতিকে টানছে ছেলেবেলার বিশ্বভুবন অথচ 'বিশাল মনুষ্য-হৃদি'কেও তিনি জানতে ব্যাকুল, "কবিকাহিনী"র মূল কথা এই। গান ক'রে বলেছেন—

শুনিয়াছিলাম কোন্ উদাসী যোগীর কাছে
'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন'—।

এই তাঁর সারাজীবনেরই কবিকাহিনী। এবং কর্মকাহিনীর উৎস। অনুশীলন ক'রে দেখলে হয়তো এরই মধ্যে দিয়ে তাঁর আজকের দৃষ্টিতত্ত্বে পৌঁছনো যাবে।

রবীন্দ্রকাব্যে বিসংগত সত্য

রবীন্দ্রনাথ একবার চীন দেশে কোনো জনসভায় বলেছিলেন তাঁর জন্ম হয় তিন স্রোতের মোহানায়। ত্রিবেণী সংগমতীর্থ ছিল তাঁর আপন বাড়িতে, যেখানে চিরভারতীয় হিন্দু সভ্যতা, পরবর্তী ইসলামীয় উৎকর্ষের ধারা এবং শেষতম আগন্তুক ইংরেজবাহন পশ্চিমী ঐতিহ্য-প্রবাহ একত্র হয়। তাঁর জীবনব্যাপী চিন্তা ও কর্মপ্রবর্তনার মূলে ছিল ভারতবর্ষের মিলনমন্ত্র, যে-মন্ত্রশক্তিবলে আমাদের দেশ সর্বমানবিক সত্যের সমন্বয়ে দ্বিধা করেনি, সবাইকে ডাক দিয়ে যজ্ঞের মঙ্গলক্ষণে বলেছিল চতুর্দিক থেকে সবাই এসো, এখানে সকলের স্থান রবীন্দ্রবাণীর শতশাখায়িত বিচিত্র ঐক্যময়ী প্রবাহিণী অনুসরণ করলে দেখা যাবে তিনি গঙ্গোত্রীর নির্জন উৎসকে স্বীকার করেছেন অথচ পথচারিদের সহযোগে বিবিধ মানবিক এই উৎকর্ষ-অভিযানকে আপন জেনে মহামিলন-সমুদ্রের পরমত্বকে লক্ষ ক'রে এগিয়ে চলেছেন। প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে তাঁর পরিবারে এই সংযুক্ত ভারতীয় মানস প্রতিভাত হয়েছে, তারই শ্রেষ্ঠতম প্রভাব দেখি রবীন্দ্রনাথের জীবনশিল্পে।

আমাদের সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের পাত্রটি এই দেশের মাটিতে গড়া, এবং আমাদের ধারণাশক্তি ভারতীয়, কিন্তু অধ্যাত্ম-জীবনে ও সাহিত্যে দর্শনে শিল্পে আমরা প্রাণরস সঞ্চয় করেছি নানা দিগ্‌দেশ হতে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের রচনার মূল প্রকৃতি জানেন তাঁদের কাছে এই সত্য স্বপ্রকাশ। হিমালয় বিন্ধ্য নীলাচল কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আসমুদ্র গিরি নদী কান্তার অরণ্য বিধৃত রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূগোল একান্তভাবে এই আমাদের ভারতীয়— তাঁর কাব্যে দেশের নদী নির্ঝরিণী নামের পুণ্যতায় ধ্বনিত এবং লৌকিক সংসর্গে ঐশ্বর্যমণ্ডিত, বাংলা হতে কাশ্মীর পর্যন্ত, কত পরিবেশ তাঁর কাব্যের রূপাশ্রিত। বিশেষ ক'রে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমতল অথবা উঁচু-নিচু ডাঙা, কোথাও কাঁকর ছড়ানো কোথাও ধানের ক্ষেতে কোমল, তাঁর রচনায় পাড় বসিয়েছে, তাঁর ভাবের অন্তরঙ্গতায় রঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু তিনি যথার্থ বিশ্বভারতীয় ভূমির কবি, বহিঃ পৃথিবী ভারতের যোগেই বৃহৎ দিগন্তের পর দিগন্ত উন্মোচন ক'রে দূরে-কাছে উপস্থিত। একই কালে তিনি বিশেষ এবং বিচিত্র ; মাটির পৃথিবীতে তিনি বা

দেশদেশান্তে ঘুরেছেন, কিন্তু তাঁর অন্তরকাব্যে ভারতীয় যোগে বাংলার যোগেই তার যথার্থতা। তাঁর ভাবের পটভূমিতেও দেখি এই আশ্চর্য যৌগিক রূপ। প্রতিষ্ঠায় ধ্রুব হয়ে আছে বেদোপনিষৎ বৌদ্ধবৈষ্ণব ভারতের মনঃক্ষেত্র অথচ কী আশ্চর্য সৌধ উঠেছে পৃথিবীজোড়া নানা ভাবের ভাবনার উপাদানযোগে। সাজাহানের মর্মরশুভ্র শিল্পও তাঁকে যেমন ধ্যানের প্রতীক দান করেছে, রাজপুতানার দুর্গমহিমার বীর্যপ্রসঙ্গও তাঁর কাব্যগাথায় তেমনি সূক্ষ্ম অনুভূতির যোগে গ্রথিত, বীরগাথার বিষয়বস্তু রাজকাহিনীর কত প্রসঙ্গে সমুজ্জ্বল হয়েছে। রবীন্দ্রবাণীর মানসমণ্ডলে ইংরেজি-সাহিত্যের বর্ণচ্ছটা প্রত্যুষ-সায়াহ্নের মাধুরী-নৈবেদ্য এনে দিল ; শুধু ইংরেজি নয়, পশ্চিমী সাহিত্যের মধ্যে ফরাসী ও রুশ-সাহিত্য, কিছু পরিমাণে স্কাণ্ডিনেভিয়ার সাহিত্যিক দানও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে,— জর্মানদের মধ্যে গীতিকবি হাইনে, মহাকবি গ্যয়টে, এবং শিলারের দু-একটি রচনা তাঁর কাব্য-প্রকাশিকায় আলো যুগিয়েছে। অথচ কাব্যের ভাষা যে বাংলা শুধু তাই নয়, উপমায় উল্লেখে শুদ্ধ সংস্কারের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্র-কাব্যমানস ভারত-নির্ধারিত। মানবসংসারের বিষয়প্রসঙ্গও তাঁর রচনায় এই যুগ্মতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। গ্রামের চাষী, ব্যাপারী, নিম্ন-মধ্য-উচ্চ-বিত্ত যারা সব তাঁর কাব্যে ছোটোগল্পে নাটকে উপন্যাসে পরিদৃশ্যমান তারা একান্ত-ভাবেই বাঙালী। অন্য প্রদেশের চরিত্র ক্বচিৎ দেখা দিয়েছে তাঁর শেষদিকের গল্পে, কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজে বহু পরিচারণা ক'রেও পশ্চিমী কোনো চরিত্রকে তিনি রসরচনায় স্থান দেননি। অথচ "গোরা" পড়লেই বোঝা যায় শুধুমাত্র পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষ এবং সজ্ঞানশিল্পের ইঙ্গিতেই বিশ্বমানুষের নতুন যুগকে সামনে রেখে তিনি গল্প লিখেছেন। "ঘরে-বাইরে" আজকের দিনের সমস্যা যা বাংলাজীবনে এবং বৃহৎ মানব-লোকালয়ে অনিবার্য সাম্প্রতিকতায় দেখা দিচ্ছে। নানা ভাবেই দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহিণী প্রয়াগধর্মী, তাতে ত্রিধারার এবং বহুধারার সমাবেশ। মোহানায় তিনি জন্মেছেন সেই সত্য তাঁর জীবনে এবং জীবন-কাব্যে প্রকাশিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দুই

শৈলসুতা-সাগরসন্ধানী নদীর আরো একটি পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনা-বলীতে দেখা যায়। এ-বিষয়ে অন্যান্য অনেক কবির সঙ্গে তাঁর অসাদৃশ্য আছে, ভারতীয় সাধনার প্রচলিত পরিচয়ের সঙ্গেও মেলে না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের

কাব্য নদীর মতোই উত্তরোত্তর অধিকতর মানবিক লোকালয়ের সংশ্রিত হয়ে দেখা দিল। অন্তকালে বৈরাগ্য নয়, দূরত্ব নয়, সকলের যোগে সংসারের শত আবর্তে জড়িত হয়েই রবীন্দ্রকাব্যের মুক্তি-পরিচয়। শৈশবে এবং যৌবনেই রবীন্দ্ররচনা বৈরাগ্যধর্মী, মধ্য-বয়সে এবং বার্ধক্যেই সংসারাসক্ত। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নির্জনধারার একান্ত দূর আপনত্ববন্ধন মোচন করবার কবিতা, "প্রকৃতির প্রতিশোধ" বৈরাগী কিশোরের বৈরল্যমুক্তির তপস্যা। "মানসী" "সোনার তরী" কাব্যে পদ্মার জনহীন চর, দূরের নিরাশ্রয়ী মেঘ, হঠাৎ-দেখা ঘাটে-হাটে নানা জনের জীবনের সঙ্গে তাঁর তরঙ্গিত আনন্দবেদনার যোগ। বহু ব্যতিক্রম দেখানো সহজ, কিন্তু মূলত এই কথা ঠিক যে যৌবনের প্রেম-কবিতাও তাঁর বিরাগী হৃদয়-বেদনার সুরে-সুরে করুণ-মধুর, অথচ মধ্য-বয়সের পরবর্তী প্রেম-কবিতায় হৃদয়বৃত্তির শংসাগত পরিচয়প্রসঙ্গ নিবিড় প্রত্যক্ষতর। এমনকি, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার সমাজমুখীনতা অনেকখানি নৈহারিক, দূরশ্রুত ; ঐ কাব্যের সঙ্গে 'বিপুলা এ পৃথিবী' অথবা 'ওরা কাজ করে' কবিতা মিলিয়ে দেখলেই বৃহৎ প্রভেদ চোখে পড়বে। যৌবন ও মধ্য-বয়সের কবির চেয়ে প্রৌঢ়ের কবি সাংসারিক, তাঁর কাব্যে সংসারের সুরবৈচিত্র্য ঘনতর ঐকতানিক। রবীন্দ্রকাব্যের এই একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি বলে মনে করি।

বলা বাহুল্য অসংগত এবং বিসংগত এই দুই কথা এক নয়— যাকে ইংরেজিতে প্যারাডক্স্ বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ একবার তারই বাংলা শব্দার্থে ব্যবহার করেছিলেন "বিসংগত সত্য।" অর্থাৎ যা আপাতবিরুদ্ধ তারই গভীরে সত্যের একটি মিলিত স্বরূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রৌঢ়ে দেখি সংসার সম্বন্ধে ক্রমান্বিত উৎসুক আসক্তি, তা মোটেই বানপ্রস্থধর্মী নয়, অথচ শৈশবে কৈশোরে তিনি সংসার থেকে দূরে পরবাসীর মতো। যৌবনে তিনি পরিহাস করে লিখেছিলেন, "আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে", কিন্তু যৌবনের সংযমসাধনার মধ্য দিয়ে যে দূরবোধের চর্চা সম্ভবপর তার কথাও বহু কবিতায় তিনি ব্যক্ত করেন। যখন হৃদয়ের ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিগত অহংকার এবং আসক্তি ক্ষয় হয়ে যায় তখন জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ স্বভাবপ্রবল আসক্তির আর-একটি বড়ো ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সত্য তাই বিসংগত ; কোনো অর্থেই অসংগত নয়। বার্ধক্যে আসক্তির মূলে আছে ক্ষুদ্র অর্থে অনাসক্তি, অর্থাৎ স্বার্থের যোগ তাতে নেই। প্রচলিত বাক্যে যাকে আসক্তি বলা হয় এই আধ্যাত্মিক

প্রাবালোকিত আসক্তি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আসক্তিই এর আখ্যা··· দেশের প্রতি বৈরাগ্য হলে তিনি 'সভ্যতার সংকট' লিখতেন না— কাব্যে প্রাত্যহিক জীবনের টিনের গন্ধ, হাটের বেচাকেনা, রোমন্থন-নিযুক্ত অলস গোরু এবং উডন্ত কাকশ্রেণীকে তাঁর ধ্যানদৃষ্টির অন্তর্গত ক'রে দেখতেন না। এখানে ভাববার কথা বৈরাগ্য এবং আসক্তির মূলে কোন সেই সত্যের যোগ যা রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই চিত্তাকর্ষক রহস্য অনুসন্ধানের পথে প্রবেশ করলে রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি সুগভীর আনন্দসূত্রের মূলে প্রবেশ করা যাবে। তাঁর কাব্যশ্লোকের স্মৃতিমূলক সমালোচনার চেয়ে বিশুদ্ধ শ্রুতিলোকে প্রবেশ করবার এই একটি পথ।

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শনকে আমি বিশেষ অর্থে দৃষ্টিতত্ত্ব বলতে চাই। অর্থাৎ যে-চোখে তিনি আজ বিশ্বকে দেখছেন তারই মধ্যে তাঁর সৃষ্টির পরিচয় খুঁজব। দেখা তো কেবলমাত্র চোখ দিয়ে নয়, তার পিছনে আছে চৈতন্যের শক্তি, আনন্দ-বেদনায় মিশ্রিত মনের সংস্কার এবং তাতে আছে গভীর অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত প্রতিভার অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার একটি যৌগিক পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৭ সালে চারটি কবিতার বই বার করেছেন— "নবজাতক", "সানাই", "রোগশয্যায়" এবং "আরোগ্য"। এই নতুন বৎসরের বৈশাখ মাসে বেরিয়েছে তাঁর আর-একটি কাব্যগ্রন্থ— "জন্মদিনে"। এই কাব্যগুলি বিচিত্র এবং ব্যাপক কিন্তু এর মূল সুতো বোধহয় দৃষ্টিলোকবিহারী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি দেখবার প্রেরণা। আজ তিনি যেখানে পৌঁছলেন সেখানে তাঁর এবং সহজ পৃথিবীর মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই— তিনি সবকে দেখছেন এবং স্বচ্ছ আলোয় একান্ত কাছে এনে দেখাচ্ছেন। জীবনের যা রুক্ষ তাকে বাদ দিয়ে দেখেননি, সংসারের সংগ্রাম এবং শান্তি একই ছবিতে বিধৃত হয়ে তাঁর নয়নে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাংলার নদী-মাঠ, ধানক্ষেত, মেঘভারাবনত আকাশ, রৌদ্রভাসিত প্রতিদিনের কর্মের সংসার ছবির পরে ছবি হয়ে তাঁর কবিতায় দেখা দিচ্ছে। "নবজাতক"-এর কাব্যে তিনি দেখছেন প্রাচীন হিন্দুস্থানকে, রাজপুতানাকে, চীন এবং য়ুরোপের মহাদেশকে। মানুষের ক্রুদ্ধ তরঙ্গিত সমরাঙ্গন তাঁর আকাশে দেখা দিয়েছে জাতীয় অসাম্যের ভূমিকায়— বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি এরই মধ্যে ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে প্রযুক্ত ক'রে আজকের সমস্যার সমাধান খুঁজছেন। মানচিত্রের মতো মহাজাতির প্রসারিত পট খুলে গেছে তাঁর মানসের সম্মুখে। তা ছাড়া "নবজাতক"-এ দেখেছি আধুনিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক বাহন রেলগাড়ি, স্টেশন; সংঘবদ্ধ নাগরিক জীবনের ঘরবাড়িও তাঁর কাব্যদৃষ্টির অন্তর্গত। যে-সব প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় সচরাচর স্থান পায়নি, খোলা চোখের কাব্যে তারাও আর বাদ পড়ল না। একেই তিনি "নবজাতক"-এর একটি কবিতায় বলেছেন 'বিশ্বদেখা'।

"সানাই" বইটি তাঁর পূর্বযুগের এবং আধুনিক কাব্যের মধ্যে সেতুর কাজ

-.য়েছে— এতে বিচিত্র-রঞ্জিত ভাবনা ছন্দে-ঝংকারে অবতীর্ণ হয়েছে, যার মিল পাই "ক্ষণিকা"য় বা "পূরবী"তে এবং তাঁর কিছুদিন পূর্বেকার গদ্যকাব্যে। এর আঙ্গিক অনবদ্য সুন্দর কিন্তু অধুনারচিত কাব্যগুলির বিরল স্বচ্ছ ভঙ্গির দৃঢ়তা এতে নেই। নতুন কাব্যের একান্ত স্বচ্ছতা এবং অব্যবহিত দৃষ্টি সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে?

সকলেই জানেন শেষ বছর হতে গুরুতর রোগসংকটে তিনি একটি কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছেন; —পরম বেদনায় প্রজ্বলিত সেই অগ্নিতে তাঁর বিশ্বদৃষ্টি এমন একান্ত নীলস্বর্ণাভ হয়ে উঠল, যেমন নির্মলতা দেখি প্রভাত-গগনে দারুণ ঝড়ের শেষে। "রোগশয্যায়"-এর কবিতায় এই অগ্নিশুদ্ধির কথা আছে, যন্ত্রণা-বহ্নিত শুভ্রতায় দিনরাত্রির মুহূর্তগুলি তাঁর চৈতন্যে ভাস্বর হয়ে উঠল। "আরোগ্যে"র কবিতায় সেই ভাস্বরতা স্নিগ্ধতর হয়ে দেখা দিয়েছে; বিশ্বলোকাশ্রয়ী পরমদৃষ্টিতে তিনি সমাসীন।

আশ্চর্য এই যে, পরম স্রষ্টিকারের রচনায় ভাবের এবং আঙ্গিকের একটি যোগ দেখা দেয় যা আকস্মিক অথচ অনিবার্য। রোগের আকস্মিকতায় তাঁর শারীরিক শক্তি যখন ক্ষীণ তখন দীর্ঘ রচনা তাঁব পক্ষে সম্ভব হ'ত না। কম কথায় তাঁকে মনের সমস্ত কথা বলতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে চরম অভিজ্ঞতায় ঘনীভূত ভাবও তাঁর অতি-সংহত ভাষার বাহন খুঁজছিল। যে-যোগ ঘটল তাকে দৈবিক ছাড়া কী বলব? সম্পূর্ণ নতুন টেক্‌নিক তাঁব আধুনিকতম রচনায় দেখা দিতে লাগল,— বর্তমান যুগের গদ্যকবিতা তাঁর হা- অপূর্ব ঋজুতা এবং নিরাভরণ মাধুর্য নিয়ে উদ্ভূত হ'ল। অল্প সময়ের মধ্যে আট-দশ লাইনের কবিতায়— কখনো মিলও ব্যবহার করেছেন— তাঁর দেখা এক-একটি ছা। সমগ্র হয়ে ফুটে উঠছে।

অতি কাছে এসেছেন আজ বাংলার কবি এই প্রতিদিনের মানুষের সংসারে। সারাজীবনের ঐশ্বর্য তিনি যাদের উদ্দেশে দিচ্ছেন তারা অতি বুদ্ধিমান জ্ঞানের ব্যবসায়ী নয়; তারা শ্যামল দিগন্তে ঘেরা প্রাত্যহিক মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অধিকারীভেদ নেই; এখানে সকলেরই নিমন্ত্রণ। মাঝি এল তার পাল-তোলা নৌকো নিয়ে, গঞ্জের হাট থেকে লোক এল বিবিধ পসরা হাতে ক'রে— কেউ হালে বলদ জুতছে, কেউ বা শহরে কাজ করে দোকানে বা আপিসে। কত ঘরের নিভৃত কাহিনী জীবনের ধ্যানমালায় গ্রথিত হ'ল তাঁর আজকের কবিতায়। অথচ এই সংবেদনশীল দৃষ্টিতে সত্যদর্শিতার সাহস আরো প্রদীপ্ত হয়েছে, তার পরিচয় পেয়েছি তাঁর এই নববর্ষের অভিভাষণে। ভয়হীন তাঁর

দৃষ্টি, কেননা সেখানে প্রেমের অপরাজেয় শক্তি রয়েছে— মানুষকে ভালোবাসেন ব'লেই তিনি মানুষের ভ্রষ্টতাকে এমন ক'রে নির্মায়িক দৃষ্টিতে দেখাতে পারেন। অপরিসীম শ্রদ্ধার বলে তিনি মানুষকে আত্মঘাতী সংহারের মধ্য হতে প্রাণময় জীবনের অঙ্গনে ডাকছেন চিরদিনের এই বিশ্বে।

আজ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি ; মাটির কাব্যে অনন্তের ধ্যানকে তিনি মূর্ত করছেন। যা সব-চেয়ে বড়ো তা সব-চেয়ে সহজ হয়ে দেখা দেয়, যখন আমাদের দৃষ্টি খোলে। রবীন্দ্রনাথেব "জন্মদিনে" বইখানি পড়তে-পড়তে আমাদের দৃষ্টি খুলে যাক যাতে আমবা নিজেকে এবং চতুর্দিকের এই ধরণীকে একবার সত্য ক'বে দেখতে পাই। আশি বছর বয়সে তিনি আমাদের নতুন দৃষ্টিদান করলেন, আরো বহুকাল ধ'বে তিনি আমাদের কাছে তাঁর দিব্যদৃষ্টি উদ্‌ঘাটিত করুন।

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ

পৃথিবীর কবি নানা দেশের আকাশে আলোকে এই সংসারের ছবি দেখে গেছেন। প্রাণধরণীকে এমন ক'রে জানার ইতিহাস পূর্বে ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণাবলীর পূর্ণ পরিচয় এখনো লেখা হয়নি, তবু আমরা বুঝেছি যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে একটি প্রদক্ষিণ-রেখা আঁকা পড়েছে যার দিব্যতা দূরকালের ভূমিকায় ব্যাপ্ত হবে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে তাঁর পরিভ্রমণ কীভাবে দেশে-দেশে নতুন যুগের উদ্দীপনা জাগিয়ে গেছে তা স্পষ্ট ক'রে জানবার সময় আসেনি। আমাদের চোখে লেগেছে সময়েব অন্ধকার, খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ। কোনো-একটি দেশের পক্ষেও যথার্থ ইতিবৃত্ত লেখা অসম্ভব। বহু জাতির অভিজ্ঞতা একত্র হয়ে কালে-কালে রবীন্দ্রনাথের কক্ষপথ বর্ণিত হবে। তাঁর গমনাগমনের চিত্ররূপটিও বিস্ময়কর। কত মহাদেশ, সমুদ্রপারের দ্বীপ, কত অসংখ্য নগর লোকালয় বারংবার অতিক্রম ক'রে ববীন্দ্রনাথ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি আকাশপথে, শৈলবন্ধুর পথে প্রতিবেশী সংসারের ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। সঙ্গে নিয়ে গেছেন ভারতবর্ষের গভীর আত্মীয়তা; বিচিত্র সংসর্গে আমাদের দেশকে প্রকাশ করেছেন, তার চিরকালের দাবি পৌঁচেছে সমগ্র মানবের কাছে। ছবিতে বাণীতে মেশানো এই আশ্চর্য ভ্রমণকাহিনীকে এ-যুগের একটি মহাকাব্য বললেও সব কথা বলা হয় না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে এবং কবিতায় বিশ্বভ্র''ণের বহু উল্লেখ নিহিত আছে। তার মধ্যে প্রাকৃত ভূমিকাই প্রধান। অর্থাৎ নানাদেশীয় সংসারের চলচ্ছবির পিছনে অজানা সমুদ্রতীরের সন্ধ্যা, কোথাও বা কর্মস্রোতের সঙ্গে মিলিত কলস্বনা চীনদেশীয় নদী, কখনো হঠাৎ জাহাজঘাটের দীপমালার উপরে সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠেছে। প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনার উল্লেখ কম। হয়তো তাঁর নিজের অঙ্কিত কেবলমাত্র রেখার বা র৻৬-মিশ্রিত ছবিগুলিতে বিশেষ মানুষ-জন, পথে-ঘাটে দেখা চল্‌তি ঘটনার সংযোগ ধরা পড়েছে— যদিও সেই চিত্ররহস্যলোকে তথ্যের সন্ধান করা বৃথা। কিন্তু ছবির স্বপ্নে-সঞ্চালিত বর্ণনায় দেখা দিয়েছে এমন অনেক বিশিষ্ট মূর্তি, মানুষের 'টাইপ' (জাতি) এবং চেহারা— নিছক কল্পনা নয়— যা তাঁর সাহিত্যজগতে প্রবেশ করতে পায়নি।

দেশী বিদেশী দৃশ্যনাট্য সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। সাহিত্যরচনায় ভ্রমণকালীন ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গ বেশি তোলেননি তার একটা কারণ হয়তো এই যে, ঐতিহাসিক সমগ্রতা দিতে হলে রবীন্দ্রনাথকে নিজের কথা অনেকটা বলতে হ'ত। সেই 'নিজের কথা' তাঁরই প্রতি অভূতপূর্ব সম্মান-সমারোহের সঙ্গে জড়িত ; সেখানে আত্মকাহিনী বড়ো হয়ে উঠত।

শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ অযাচিত শ্রদ্ধার অর্ঘ পেয়েছিলেন কিন্তু পরিক্রমণের যোগে মিলিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে যে-সব আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তারও বর্ণনা কবি দেননি, কেননা চলার পথে সাক্ষাতের মধ্যে গভীর পরিচয়ের অবকাশ ছিল না ; কারো প্রতি অবিচার বা আংশিক বিচার করা তাঁর স্বধর্মের বিরোধী মনে করতেন। বিভিন্নদেশীয় জনতা বা বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে মতামত তাঁর লেখায় ক্বচিৎ পাওয়া যাবে। কত বিচিত্র মানুষ এবং লোকব্যাপারের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল কিন্তু পথ-চলা ইতিহাসের আকস্মিক এবং ক্ষণকালীন বন্ধনে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে বেঁধে রাখেননি। প্রসঙ্গত কোথাও শহর বা মানুষের কথা দেখা দিয়েছে ; সে যেন গভীর কোনো আলোচনার প্রান্তে পাড়-বসানো। আশ্চর্য চিত্রময় ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁর কৈশোরে রচিত য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ; তারপরে যাত্রীর কাহিনী যা লিখেছেন তাতে নিজের বা অন্যের সম্বন্ধে ব্যক্তি-গত তথ্যের অভাব। বিদেশের বর্ণনা যা আছে তা পাঠকের হঠাৎ-পাওয়া রত্ন ; দাবি মেটানোর চেষ্টা নেই। বস্তুত বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের দেশকালগত পরিচয় দিতে হবে অন্যকে ; তথ্য সংরক্ষণের চেষ্টা তিনি নিজে করেননি। সন্ধানী হ'তে হবে উত্তরকালকে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং বিদেশের বহু স্থানে দীর্ঘজীবন ধ'রে যাতায়াত করেছিলেন— এই ভ্রমণের প্রতি পর্যায়ের তথ্য উদ্ঘাটন ক'রে ঘটনার যোগে তাঁর বৃহৎ মানবিক কর্মকে দেখানোর বিশেষ সার্থকতা আছে। কেননা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্ববিস্তৃত রূপকে আশ্রয় ক'রেই এই যুগের বড়ো সার্থকতার ইতিহাস লিখিত হয়েছে। মহাকালের এই একটি অপূর্ব লিপিকে প্রকাশ করবার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা যথার্থ ঐতিহাসিক। অর্থাৎ তাঁদের রচনা দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে নতুন আলোয় দেখব শুধু তাই নয় ; যে-কাল এবং মানবসংসারের অভিব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রে তাঁর রচনা শাশ্বতের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার পরিচয় অন্তরে গ্রহণ করব।

নবজাতকমালা

ঢালু পাহাড়ের গায়ে চায়ের ক্ষেত; দূরে সিকিম-ভুটান-তিব্বতের দরজা আগ্‌লিয়ে রয়েছে শৈলশৃঙ্গ। নিভৃত কোণে এই মঙ্‌পু। এখানে শ্যামল পল্লী গ'ড়ে উঠেছে সিন্‌কোনা চাষ আর কারখানাকে কেন্দ্র ক'রে। ভুটিয়া বস্তি এদিকে-ওদিকে ছড়ানো; নিবিড় বনশ্রেণী; নিচের উপত্যকায় তিস্তা ব'য়ে যাচ্ছে। বাঁয়ে ঘুম্‌-এর গিরিসান্নিধ্যে তাগ্‌দার ঘরবাড়ি দেখা যায়, রাত্রে পাতালের ওপার থেকে হঠাৎ আলোর মালা। মঙ্‌পুব চিরবাসন্তী দৃশ্যপট মেঘরোদ্দুরে বদ্‌লিয়ে যাচ্ছে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন গ্রীষ্মের ছুটিতে; কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে কাটালাম।

পাহাড়ের উপর থেকে তাঁর লাল-শাদা বাংলো চোখে পড়ে। মনে হ'ত আকাশ ঝুঁকেছে ঐ বাড়ির ছাতে, কাঁচের ঘরে কবি যেখানে ব'সে লিখছেন সেইখানটাতে। যেখানে সৃষ্টির বড়ো ব্যাপার ঘনিয়ে উঠছে সেই কেন্দ্রে কি ছড়ানো বিশ্বের চেতনায় টান পড়ে না? আকাশে যেমন বৃহৎ আকাশ ধরা দেয়; অসীমের একটি নীড়ে দেখি আলো-হাওয়ার সংগম।

মহাকবির কাব্য সেইরকম নীড়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কত লোক এবং কালের অভিজ্ঞতা এক হ'ল, কত চিত্তপ্রয়াস মূর্তি পেল। ঋতুর স্পর্শ লাগছে তাঁর গানে, মাটির নিগূঢ় ছন্দে ভাষার রেখা মিলেছে ভাবনায়। সংসার জুড়ে ক্ষয় ক্ষতি ঘটনার আবর্তন; কত সংঘর্ষ; কত উদ্দীপনা— এরই মধ্যে প্রবল শক্তির যোগে তাঁর কাব্যে জাত হচ্ছে পূর্ণতা। সৃষ্টির "নবজাতক" এল আমাদের কাছে।

এই গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথেব শেষ একটি যুগের প্রতীকস্তম্ভ। যেমন বলি "মানসী" "ক্ষণিকা" "বলাকা" এবং "পূরবী"কে যুগপ্রতীক। মানবসমাজের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়ে তাঁর নতুন কাব্যের বিকাশ।

কালের বহু ধারা এই কাব্যে সংগত হয়েছে. যেখানে সভ্যতার বিনষ্টি, তার বিলীয়মান রূপ দেখছি কবিতায়; সঙ্গে-সঙ্গে নতুন ইতিহাসের অধ্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উদ্যোগপর্বের শঙ্খ শোনা যাচ্ছে মহামৃত্যুর পার থেকে। পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী অন্ধকারে এই আসন্নতার ধ্বনি। বিদীর্ণ মানবজাতির বক্ষ হতেই "নবজাতক"-এর উদ্ভব।

দুই

যন্ত্রসম্ভব নতুন যুগকে কোন দৃষ্টিতে, কোন দৃষ্টান্তের সহযোগে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করলেন?

মঙ্‌পু পাহাড়ে রেডিয়োর কণ্ঠে প্রত্যহ দুঃসংবাদের ঢেউ উপচে পড়ত। প্রশ্ন উঠত আমাদের চতুর্দিকের গিরিস্তব্ধতা হতে— কেমন ক'রে ধরবে? ধারণার শক্তি কোথায়? এতখানি বেদনা— এ তো সর্বমানুষের। মনে হ'ত একটি বৃহৎ শোকের গাথা শুনছি নানা ভাষার কণ্ঠে। যুদ্ধের কাহিনী যে-পক্ষেরই হোক, কথাটা একই। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন, তীব্র অন্যায় জমে উঠেছিল অসাম্যের সংসারে। সইল না। ঝড় নামল নিয়মবিধাতার। ভার-সামঞ্জস্যের দুঃসহ চেষ্টায় দিকে-দিকে জেগেছে ভূমিকম্প। বেদনায় জ্বলেছে অগ্নিশিখা মর্ত জুড়ে—

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে।

কিন্তু তাপ কি কেবল যন্ত্রণার, তার অন্য কোনো দান নেই?

ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

আগুন পৌঁছল অশুভের বুকে; এবারে বিষ ঘুচবে। ক্ষয়তার মূলে লোভের প্রতিক্রিয়াকে কবি দেখাচ্ছেন। পক্ষ-প্রতিপক্ষের বিচার নয়। পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ এখানে নেই। বর্বরতা আজ আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। চীনদেশে দেখি জাপানের একই কাণ্ড। সেখানেও—

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।

সেখানেও ধর্মবচন চাই, পুণ্যনাম লুটোলো ধুলোয় নরমেধযজ্ঞে।

হিংসার উন্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।

যতই মূলে অগ্নিদাহ চলেছে, চাতুরী দিয়ে পালাবার চেষ্টা অন্তিম হয়ে উঠল,— পশ্চিমের দিকে চেয়ে নিদারুণ এই ব্যর্থতাকে কবি দেখাচ্ছেন।

শুধু বাণী-কৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।

বিধাতার ক্ষমা নেই। মানুষের এই পরম ভাগ্য। কঠোর দুঃখে প্রজ্বলন্ত চেতনার উদ্দেশ আছে; অশুভ শাস্তির সামনে অন্ধকার। তাই নিয়ন্ত্রণকে কবি দারুণ রূপেও মানতে প্রস্তুত।

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।

শাসন-ত্রাসনের ভিত্তি ভেঙে গিয়ে উঠবে ধ্রুবসমাজ। দুর্বল পাবে দুঃখ, কেননা তারা লোভীর সহায়; তাদেরও নামতে হবে প্রায়শ্চিত্তে।

জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

কিন্তু এখানে কবি থামেননি। নতুন জন্ম নেবে মানুষ। যে আসছে তার হাতে অস্ত্র নেই, আছে মহাস্ত্র; মানবত্বের। যন্ত্রশালায় তৈরি হয় না তার কৃপাণ; কণ্ঠে তার এ কোন যুদ্ধের ডাক?

নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।

নবীন যুগের সাধক আসছে প্রলয়ের বাধা কাটিয়ে—

রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।

'উদ্বোধন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ডেকে গেছেন সেই নবজাতকের কবিকে

এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি
নবজাগরণ-যুগপ্রভাতের রবি।

তিন

দেশের দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন নবজাতকের উদ্দেশ। ভারতভাগ্য-দিগন্তে এখনো পুঞ্জিত নিষ্ক্রিয়তা; জীর্ণ প্রাচীনকে জড়িয়ে রয়েছে অসংগতি। অতীতের ছায়া আছে আলো নেই, এমন লগ্নে হিন্দুস্থান আজও পিছনে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখছে—

ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়।

কালচ্ছায়া নেমেছে মৃত-পাথরের উপর। ইতিহাস যেখানে প্রাণধর্মী, আধুনিক কালের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। কিন্তু সেই প্রাণের ধারা কোথায়? 'রাজপুতানা' কবিতায় বলছেন,

ঐ তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি,
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।
মৃত্যুতে করেছে গ্রাস তবুও যে মরিতে না জানে।

ভারতীয় সভ্যতা পুনর্জীবিত হবে ব্যর্থ সঞ্চয়কে উত্তীর্ণ হয়ে, নতুন অধিকারের শক্তি গ্রহণ ক'রে।

পথভ্রষ্ট বর্তমানে অর্থ আপনার,
শূন্যেতে হারানো অধিকার।

আমাদের সভ্যতার সংকট এইখানে— একদিকে অসহায় প্রাচীনতা, অন্যদিকে উদ্ধত পণ্যব্যবসায়ের নির্লজ্জ আধুনিকতা যার মধ্যে নবযুগের বাণী নেই, গ্লানি আছে।

এদিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়।
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্যঝড়।
বণিকের দম্ভে নাই বাধা,
আসমুদ্র পৃথ্বীতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ণ মর্যাদা।

ভারতবর্ষের শক্তির উৎস কোনখানে? দেশের মাটিতে। যারা আজও মাটির কাছে রয়েছে তাদের মধ্যে। শত দুঃখেও তাদের মধ্যে প্রাণের ধারা বইছে, শুকিয়ে যায়নি। সাধারণ জীবনকর্মের যোগে সত্যের একটি অবিকৃত রূপ তাদের কাছে জাগ্রত রইল, বিশ্ব-সংসারকে তারা বিদ্রূপ করতে পারল না। এরূপ বিলাসের অবসর কোথায়? অধিকারী-প্রমত্ততার কথা ওঠে না যেখানে মাঠ ভেঙে চাষ করতে হয়; মানস নিয়ে প্রলাপ নেই যখন বিশ্বস্রষ্টা হৃদয়-মন জুড়ে প্রতিদিনের দুঃখে-সুখে আপনার পরম রূপকে সংসারে ব্যক্ত করেন। তাই রবীন্দ্রনাথের "নবজাতক" এল সহজ জীবনের কাছ থেকে—

হোথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস,
ওরা কভু আধামিথ্যা রূপে
সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে—

নবজাতকের এই দ্বিতীয় পর্যায়।

চার

"নবজাতক"-এর কবিতাগুলি "সানাই" কাব্যের একই সঙ্গে লেখা। অর্থাৎ সমকালীন মনের অন্তর্গত এই দুটি কাব্যসংগ্রহ, দুটো বই ছাপা হয়েছে আগে পরে। ছাপার সময় দুটি-একটি নতুন রচনা যোগ হয়েছিল। সমগ্র বইয়ের প্রুফ দেখে দেওয়ার পর বইয়ের রূপ কবির চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠত এবং শেষ মুহূর্তে তাকে আরো ফুটিয়ে তোলার উৎসাহ পেতেন। তাতে মুদ্রণবিভাগের যেমন বিস্মিত তৎপরতার কারণ ঘটেছে, সাহিত্যও তেমনি সমৃদ্ধ হয়েছে। নতুন

কবিতা দ্রুত রচনা ক'রে বইয়ের নানা স্থানে বসিয়েছেন এরকম উদাহরণ আরো আছে।

কালক্রমিক পারম্পর্য রক্ষা না ক'রে "নবজাতক" গ্রন্থনের সময় কয়েকটি বিশেষ ভাবের সূত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে সে-কথা রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলেছেন। কোনো-একটি ভাবনার মণ্ডলকে জানবার এবং বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র ক'রে বোঝবার পক্ষে এতে সহায়তা ঘটে।

"নবজাতক"-এর দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছি। প্রথমে দেখা দিল রাষ্ট্রিক সংঘর্ষে, মৃত্যুর একান্ত পরীক্ষায়, সভ্যতার নবজন্মসূচনা। বৃহৎ জাতীয় ভিত্তি ভেঙে যাচ্ছে, কেননা সর্বজনীন ব্যবস্থা হয়নি ; অসাম্য এবং অন্যায়ের অবস্থায় ভিত্তি অটল হলেই প্রমাণ হ'ত সত্যের আশ্রয় নেই। মৃত্যু সত্য নয়, অন্যায় ধ্রুব নয়, এই কথা কীর্তিত হচ্ছে প্রতাপের দীর্ণ সভায়। মানুষ শিখবে কবে? অস্বীকৃতির গর্বে পাপের চূড়া তুলছে, রক্তনিশান উড়িয়ে বলছে আমি অনশ্বর— বারে-বারেই ধুলোয় গড়াচ্ছে তার সভ্যতার প্রলাপ। সত্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপাসনা ক'রে এড়াবার পথ নেই, নরবলি দিয়ে ফল হয়নি। প্রয়োগের নতুন অস্ত্র নিয়ে এবারে আসছে নবজাতক। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে জ্ঞানে কর্মে ভাবনায় একটি সচেতন কল্যাণশক্তির অভ্যুদয় আসন্ন হ'ল। তারই আবাহন রয়েছে কবিতায়।

"নবজাতক"-এর অন্য প্রসঙ্গ ভারতবর্ষ। যদিও বিশেষ ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত সত্যভাবনের মূল্য দেশকালে আবদ্ধ নয়, তারও ব্যঞ্জনা বিশ্বমানবিক। অসম্মানিত নিপীড়িত জনগণকে পায়ে চেপে রেখেই আমরা ঐক্যশক্তি চেয়েছি, মুক্তির ইচ্ছাকে ব্যর্থ করেছি। বহুকোটি মানুষ অর্ধাশনে রোগে মুমূর্ষু, প্রকৃতির রাজ্যে তারা অসহায়, সমাজে উদ্ধতের পদদলিত। নিবার্য মৃত্যুকে আমরা মেনে নিয়েছি ; দেশজোড়া দুঃখের অসংগতি আমাদের চোখে পড়ে না। জীর্ণ প্রাচীনকে নিয়ে বিলাসী যারা, অপৌরুষেয় বর্তমানের দীনতা তাদেরই। গৌরবের আলো পৌঁচচ্ছে না কোনো দিক হতে। ছেয়ে রয়েছে ধনিক-বণিকদের সংঘবদ্ধ গৃধ্নুতা, পররাষ্ট্রের দুঃশাসন এবং অপমান। নবজাতক কোথায়? তারা আমাদের লক্ষ-কোটির দল। জাগছে তারাই। বাঁচবে এরা এবং বাঁচাবে ভারতবর্ষকে। বঞ্চিত হয়েও সহজ মনুষ্যত্বের তেজ তাদের ; মাটির যোগে মনকে ঐশ্বর্যবান করবার শক্তি তাদের মরেনি, এখনো শিরায়-শিরায় বইছে। ভারতবর্ষের জীবন্ত প্রতীক তারা, যুগের বিকৃতি তাদের স্পর্শ করেনি। বিদ্রোহের ছন্দে তারা প্রাণের দেশ

গড়বে। তারা চিরযুগের। আর যুগবিলাসীর দল? ভস্মের ডালা সাজিয়ে তারা লুপ্ত হবে, যন্ত্রতন্ত্রকিংকরগুলোর সঙ্গে।

শেষের পংক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্যলিখা,
নামিবে অন্তিম যবনিকা,
উত্তাল রজতপিণ্ড উদ্ধারের শেষ হবে পালা,
যন্ত্রের কিংকরগুলো নিয়ে ভস্মডালা
লুপ্ত হবে নেপথ্যে যখন,
পশ্চাতে যাবে না রেখে প্রেতের প্রগল্‌ভ প্রহসন ॥

দেশের দিকে তাকিয়ে কবিব ভয় নেই। ইতিহাসের মহাশক্তি কখন জেগে ওঠে কেউ জানে না। সৃষ্টির দিগন্তে বিপুল হাওয়া ব'য়ে এল।

তুলিল উদ্ভেদ করি কলোল্লোলে মহা-ইতিহাস
প্রাণে উচ্ছ্বসিত, মৃত্যুতে ফেনিল; তাবি তপ্তশ্বাস
স্পর্শ দেয় মনে, রক্ত উঠে আবর্তিয়া বুকে—

দেশের সেবায় দেশকেও ভুলতে হবে। সৃষ্টিব অন্তরতম সত্য হিতার্থেরও অতীত। শুভকর্মের মূলে শক্তি পৌঁছয় সেই সত্যের যোগে। সেখানে দ্বন্দ্ব-নিরসিত কল্যাণের উপলব্ধি, ভারতভাগ্যদেবতাব পরিচয় বিলীন হয়েছে 'ভাগ্য-রাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বরূপে। মুক্তির প্রে গায় মঙ্গলকর্মেব সীমা পেরিয়েই জ্যোতিকে কর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারই অপেক্ষা র'য়ে গেল। বাণী আসবে সর্বময়ী আসন্নতায় পূর্ণ হয়ে।

অকথিত বাণীর ইঙ্গিতে
চারিভিতে
নীরবতা-উৎকণ্ঠিত মুখ
রয়েছে উৎসুক।

এইখানে নবজাতকের তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিকা দেখতে পাই। আন্তর্জাতিক সাম্যের সাধনে জাগল পৃথিবীজোড়া আন্দোলন; ভারতবর্ষেও দুর্যোগের অন্ধকারেই কোটি জীবন উদ্যত হয়ে উঠছে; সমস্তকে ধারণ ক'রে প্রকাশিত হচ্ছে বিশ্বনীহারিকার কেন্দ্রবর্তী একটি নবীনতার বেগ। এই তিন স্তরে মিলে

আছে নবজাতকের তত্ত্ব। মিলে আছে, অর্থাৎ পৃথক হয়ে নেই; কিন্তু অনু-শীলনের ক্ষেত্রে কবিতাগুলিকে স্বতন্ত্র আলোচনা করা চলে।

বিজ্ঞানে বলছে কস্‌মিক রশ্মির কথা। এদিকে বিশ্ববস্তু যাচ্ছে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে, অন্যদিকে জমা হয়ে উঠছে নতুন শক্তির সঞ্চয়। আলো হারিয়ে যাচ্ছে প্রাত্যহিক দীপ্তির খরচে, আবার নতুন আলো কোন অদৃশ্য কোষ হতে সঞ্চারিত হয়ে ক্ষতিপূরণ করছে। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্র হতে কবি দেওয়া-নেওয়ার উপমা সংগ্রহ করলেন।

যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।

ভাণ্ডার শূন্য ক'রে আলোর বদান্যতা। এই যেমন, তেমনি দেখি—

...মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।

এই লীলার সংগতি কোনখানে? বলছেন 'ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-কন্দর-মাঝে' যা-কিছু দেওয়া এবং হারানোর হিসাব মিলছে। সবসুদ্ধ ক্ষয় নেই, অখণ্ড পূর্ণতা বিরাজিত।

সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা-মেলা ভাষা।
সেথা হতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি
সৃষ্টির আরম্ভবীজ লয় ভরি ভরি
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।

নিত্যনবজন্মের রহস্য পরমা প্রকৃতির মধ্যে; যখন চৈতন্যে তার বেগ অনুভব করি তখন জন্মমৃত্যুর ছায়া স'রে গিয়ে বিশ্বসংসারের ধ্রুবত্ব আমাদের

কাছে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশের অন্ত নেই, কত তার রং, কত বেদনা, সংখ্যাতীত সৌরলোকে যেমন আলোর সমাবর্তন।

কিন্তু সৃষ্টির এই রহস্য যেমন আদিতে প্রৈতি, তেমনি তার প্রকাশ সার্থক হচ্ছে আমার চেতনায়। বিশ্বসংসারের নবজাতক এই 'আমি'।

বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

বহু 'আমি' আসে যায়, কিন্তু 'আমি'র নবজাতকমালা লোকে-লোকে রচনা হচ্ছে।

"নবজাতক"-এর তৃতীয় পর্যায় 'আমি'কে নিয়ে।

কবিতার চেয়ে বেশি

রবীন্দ্রনাথের সায়াহ্নিক কাব্যে সংসার জেগেছে একটি শুভ্র দৃষ্টির তলে। এই শুভ্রতার তত্ত্ব কোনো সাহিত্যিক সংজ্ঞায় ধরা পড়ে কিনা জানি না। চৈতন্যের যে অপরিমেয় আলোয় প্রাত্যহিক জীবনকে তিনি ব্যক্ত করেছেন, তার পিছনে আছে তাঁর বহুপ্রাঙ্গণিত ধ্যান এবং ধারণা, কর্মের অধ্যবসায়, কিন্তু সব মিলে তৈরি হয়েছে একটি দেখার আকাশ। তাঁর কাব্যে ফুটে উঠছে পৃথিবীর মাটি ঘর মানুষ, চিনতে পারছি নিজেকে, অন্যকে ; অনেকটা দূর পর্যন্ত চেয়ে কথার দিগন্তে আর দৃষ্টি পৌঁছয় না। বিস্ময়ের সুর লেগে থাকে হাওয়ায়, মাটির তৃপ্তিরসে মন ভরে ওঠে।

ঝংকৃত ছন্দে যাত্রা শুরু ক'রে কবির বাক্য এসে দাঁড়িয়েছে মহাবাক্যের তটে— সেখানে সর্বব্যাপী বিরলতায় কাব্যের পুনরাগমন।

> শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
> বলে যাব, তোমার ধূলির
> তিলক পরেছি ভালে।

যে-উপমায় বলা হ'ল তা বাঙালীর হৃদয়ে সর্বজনীন। 'তিলক' বলতে এখানে জয়ের সম্মান, প্রীতির দান ; প্রাণমৃত্তিকার অভিষেক। আত্মীয়তার চিহ্ন নিলেন ললাটে, বিদায় তো বিচ্ছেদ নয়। চরম মুহূর্তের বেগ এখানে ভাষায় অন্তর্লীন, বাহিরে সাজ নেই।

> পাখিদের অকারণ গান
> সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।
> সব-কিছু-সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
> অমৃতের অর্থ দেয় তারে।

অমৃতের অর্থ এই ভাষায়। কোনো সাহিত্য এই জায়গায় পৌঁছয়নি ; রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্টি তাঁর অন্য রচনার কিনারা পেরিয়ে গেছে। ছোটো-ছোটো কবিতায় স্ফটিক-পাত্রে আলো আছে এক হয়ে, ভাবে রূপে আবির্ভাব, আলাদা

দেখানো যায় না। শাদার উপরে শাদার কারুকাজ, দিব্যভাষিত, বর্ণানেকান্-এর মাধুরীতে পূর্ণ। এমন অঙ্গরচনার আঙ্গিক বিশ্লেষণ করবে কে? তাই রবীন্দ্রনাথের শেষের কাব্যমণ্ডল সম্বন্ধে অবাঙ্মানসগোচর সংজ্ঞা ব্যবহার করা অন্যায় হবে না যা সমালোচনায় অচলিত। বলতে হয় এই পর্যায়ের কবিতা কবিতার চেয়ে বেশি।

দুই

বেঁচে আছি এই কথাটার মূল্য কবির কাছে নিঃসীম বেড়ে চলল। রোগে, আরোগ্যে, জন্মদিনে তিনি এমন রূপ রচলেন, যাতে সত্তার অব্যবহিত প্রকাশ বিচ্ছুরিত হয়; স্বচ্ছ কাব্যে, সূক্ষ্মতম ধ্বনিতে অস্তিত্বের মাধুর্যকে বাঁধলেন। অথচ কবিতার নিবিড়তম ভাষণেও তাঁর তৃপ্তি নেই—

> কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
> ব্যগ্র এই মনের আকূতি।
> অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ,
> করে থাকে চুপ,
> বলে, আমি আনন্দিত— ছন্দ যায় থামি।
> বলে, ধন্য আমি।

অন্য জায়গায় বলেছেন, ভাষা তাঁর ফুরিয়েছে, যা বলতে চান তা ব্যক্ত হতে পারত মন্ত্রে—

> বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
> মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।
>   ভাষা নাই, ভাষা নাই;
>   চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
> মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

কখনো তাঁর কথা আপনি মিশে গেছে উপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে, অনেকগুলি কবিতায় তার পরিচয় আছে। কিন্তু, সেই বিশেষ অর্থে মন্ত্রের যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি প্রকাশকেই বলতে চেয়েছেন মন্ত্র, কাব্যের ভাষা। বিশ্ববিরহিত বাণী নয়, কাছে দেখার বাণী। ধ্যানের পরিচয়ে দেখেছেন আনাগোনার হাট,

প্রাচীন অশথতলায় খেয়ার লোক বসে; গঞ্জের টিনের চালাঘর, তাতে সারি-সারি গুড়ের কলসি। রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি, পাটের বোঝাই ভরা; বস্তা টেনে উচ্চস্বরে ওজন চলছে আড়তের আঙিনায়। বাঁধা-খোলা বলদেরা রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খাচ্ছে, লেজের চামর হানছে পিঠে; সর্ষে রয়েছে স্তূপাকার, গোলায় উঠবে। জেলে-নৌকো ঘাটে এল, ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি; মাথার উপরে উড়ন্ত চিল। এমনি সব দৃশ্য। বলা যায় বিশ্ববাংলার। আমাদের চিরদিনের নদী-মাঠ-শহর-গ্রামের ঘনিষ্ঠ বার্তা, যার ঢেউ উঠছে পৃথিবীর বুকে। এতে ধ্যান ভাঙে না। ধ্যান ভ'রে তোলে।

পথে-চলা এই দেখাশোনা,
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে।...

একদা কবি বলেছিলেন, এখানে নয়, দূরে আরো দূরে— বলাকা উড়েছিল যে-দিকে। আজ সমস্তখানি কাছে এল :

...এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে,
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।

'শেষ তীর্থ-মন্দিরের চূড়া' জীবনের সামনে দেখা দিল, শেষ এবং প্রথমকে আনল সংসারের মাঝখানেই। মৃত্যুব খেলা চলছে জীবনে, প্রাণ তাকেও দেখছে। কখনো অশ্রু ছায়া ক'রে আসে, আবার সোনার হাওয়ায় ঘরের কাজ চলতে থাকে। প্রাণশিল্পীর নানা সুতোয় বুনোনি।

এই কাব্যে সকলেব জায়গা; আধ্যাত্মিক নিষেধ নেই। বৃদ্ধ মহানিম, নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া, রাত্রে তাতে বকের আশ্রয়; পাশে দুপুরের রোদে ভজিয়া জাঁতায় গম ভাঙছে, পিতলের-কাঁকন-পরা হাতে, সে-ও আছে, গুনগুন গান করছে। ইঁদারায় টানা জল নালা বেয়ে ভুট্টার ফসল-ক্ষেতে এসে পড়ছে। পশ্চিমের একটি দিন।

কাজ চলেছে। বৃহৎ পৃথিবীতে এই প্রাণের ব্যাপার। 'ওরা কাজ করে।'

ইতিহাসকে দেখছেন, আধুনিক কালকে, ভারতের প্রদেশে-প্রদেশে ব্যাবসা, কৃষি ; মাঠে-জলে মানবিক কাহিনী। সমুদ্র-পার থেকে শোনা যায় যুদ্ধের গর্জন। কিন্তু সংহারও অবসান নয়। মানুষ বাঁচবে। তার বাঁচাকে, মরণকে, 'আছি'র মধ্যে গ্রহণ করছেন। গ্রহণ করার অর্থ অন্যায়কে মানা নয়, মঙ্গলকে জানা যে মূল ক্ষয় ক'রে দেয় অন্যায়ের। মঙ্গল হচ্ছে প্রাণ। সেই প্রাণশক্তির মন্ত্র আছে জাগা চোখে। জাগ্রত কর্মে। আড়ালে নয়, সকলের কাছে এসে বসলেন কবি।

তিন

মনে রাখতে হবে এই কবিতাগুলি সন্তবেদনার কালে রচিত। দেহগত দুঃখের তপস্যা রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনায় এমন ক'রে দেখা দেয়নি। দাহনকে স্নিগ্ধ প্রাণরশ্মিতে পরিণত করা সূর্যশক্তির ধর্ম, তার পরিচয় বিশেষভাবে এই কাব্যে পরিকীর্ণ। কিন্তু ক্লেশের দিক সামান্য নয়, সংসারে তা প্রাণের আনুষঙ্গিক।

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে···

মানুষের স্নায়ুতে ঠেকে আকাশব্যাপী ব্যথা চেতন হয়ে উঠল, এর ভার বইতে হয় সমস্ত চৈতন্য দিয়ে। সহনীয়তার পরীক্ষা চলেছে ঘরে-ঘরে।

মানুষেব ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।···

শারীর ছায়াকেও সত্তা আপন অন্তর্গত ক'রে নেয়, তার আশ্চর্য রহস্য কবি দেখছেন :

মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখহোমানলে
যে অর্ঘের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যা।
তার কি তুলনা কোথা আছে।

নিদারুণ রোগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে আর-একটি সুর যোজনা করলেন। যন্ত্রণার বর্ণাগুলি অনেকগুলি কবিতায় ছড়িয়ে আছে, অন্যান্য রঙের সঙ্গে মিশ্রিত। দুঃখতাপের ব্যক্তিগত ইতিহাস কবি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন ; কষ্টের

আঘাতে চিরমানবিক সেই রূপকে আপনার মধ্যে জানছেন যাকে মানুষের বৃহৎ শরীর বলা যেতে পারে। 'পীড়নের যন্ত্রশালে' সকল আঘাতের উপর জয়ী হয়ে মর্তবাসী নারায়ণের প্রতিষ্ঠা।

অস্তিত্বের বেদনা মানবধারায় প্রবাহিত, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে জাগছে 'অপরাজিত বীর্যের সম্পদ', 'নির্ভীক সহিষ্ণুতা'য় মানুষের যাত্রা।

বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে।

যেমন একদিকে মানুষের চৈতন্যের ধর্মই প্রাণের সহায়, তেমনি প্রকৃতির হাতের সেবাও আমাদের কল্যাণে নিযুক্ত। বাঁচবার শরীরকে সুস্থ ক'রে তুলছেন যিনি, তাঁকে কবি দেখছেন। তিনি সেই

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে,...

'স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে' প্রাণস্বরূপিণী মানবলক্ষ্মীও রয়েছেন ঘরে-ঘরে। কবিকে যাঁরা সেবা করেছেন তাঁদেরই উদ্দেশে উৎসর্গের কবিতাটি রচিত।

দুঃখের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে তাপক্লিষ্ট ভারতের জনসাধারণের আরো কাছে নিয়ে এল। বেদনার আত্মীয়তায় তিনি তাদের দুর্বিষহ ভার মেনে নিচ্ছেন। অসহায়ের দৈহিক পীড়ন তাঁব ব্যক্তিগত রোগযন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে দেখা দিল।

অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়াব,
নিষ্ঠুর তাহাব চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যর পথে রোগের অবাধ অভিঘাত...

এই দুঃখের দায়িত্ব কে স্বীকার করবে? অন্যায়কারীকে, নিশ্চল সমাজকে, রাজশক্তিকে বিচার করবার দেশজোড়া সাহস জুগিয়েছেন তিনি, কেননা তিনি নির্ভয়। তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাবার শক্তি নেই কারো, কেননা তাঁর দৃষ্টি মুক্ত এবং তাঁর বিচার সত্যের বিচার, খণ্ডবিদ্রোহ নয়। মানুষের অন্যায় সর্বমানবের চৈতন্যে পৌঁচচ্ছে, আসবে প্রতিবিধান। আসবে মানুষের হাতেই।

বিশ্ববিধানে প্রলয়ের দূত দেখা দেয়; অন্যায় যে চিরন্তন হয়ে নেই তারই আশ্বাস ওড়ে ঝোড়ো পতাকায়।

দারুণ ভাঙন এ যে পূর্ণেরি আদেশে,
কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে···

প্রতাপের শিবির ভেঙে 'সুতীব্র অক্ষমা' সংসারে নামে, 'পরমা শক্তি সে যে'। তার কাজ মানুষকে জাগিয়ে তোলা। যতদিন পর্যন্ত সাম্যের বিধান না গ'ড়ে ওঠে, সমাজে অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া চলবে।

প্রাণশিল্পী কবি তপস্যার আনন্দকে দেখিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখের কথা ভাবতে দেননি। আন্তর সাধন মিলেছে সমস্ত মানুষের সাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র হয়ে তিনি নিজের কষ্টকে দেখেননি, কষ্টের মুক্তি চাননি। তাই যখন তিনি দীর্ঘরজনীর যন্ত্রণাময় গ্লানিকে অস্বীকার করে বলছেন—

প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহদুর্গের শিখরে

তখন তাঁর কণ্ঠে দেশের এবং সর্বদেশীয় মানুষের বিজয়বার্তা শুনতে পাই। শ্রেষ্ঠ পুরুষ মর্তবাসী সকলের গ্লানি ভোগ ক'রে আহ্বান জানিয়ে গেলেন আমাদের পৌরুষকে।

চার

বিদায়-দরজায় দাঁড়িয়ে কবি বলছেন,

সময় যাবার
শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।

জন্মমৃত্যুর অতীত যিনি প্রাণবান, বিদায়ের ভাবনা তাঁকে সম্মোহিত করে না। অদর্শনের বেদনা অন্যকেও যেন আবিষ্ট না করে, কেননা মৃত্যুর কল্পনা মৃত্যু নয়। সংসারে যে-প্রবাহের মধ্যে আমরা চলেছি, থাকা না-থাকার পর্যায়ে, তার স্বরূপ কী তা নিয়ে নতুন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বর দিয়েছেন।

এই যা আছি, যার মধ্যে আছি, তার নাম কী? —মূল স্বরের মতো ধ্বনিত হয়েছে এই প্রশ্ন।

> চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী,
> এই শুধু জানি।
> চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,
> পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে।
>
> ...
>
> চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
> মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
> স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
> খোলা আর ঢাকা,
> কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে—
> মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

যা অনির্বচনীয় কাব্যে তাই বলা হ'ল।

> অনিঃশেষ প্রাণ
> অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান…

দুয়ে মিলে আনন্দময় রচনা। মানুষ যখন সেই রচনায় যোগ দেয় তখন সে কবি। সেইখানে তার কাব্য। সমস্ত সংসার সেখানে কাব্যের আশ্রয়।

রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টি সেই অর্থে কবিতার চরম অর্থ পূর্ণ করে। কবিতার আদর্শ যখন পর্যন্ত ধারণার বাহিরে থাকে, তাঁর এই কবিতাকে বলতে হয় কবিতার চেয়ে বেশি। এখন বলব কবিতার শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা তাঁর নতুন তিনখানি বইয়ে পাওয়া গেল। এগুলি পূর্ণতম, সহজতম প্রকাশের কবিতা।'

ছড়া

'ছেলেভুলানো ছড়া'কে যখন কবি সাহিত্যে উত্তীর্ণ করলেন তখন দেখা গেল কাঁচা গাঁথুনির রচনায় জনচিত্তের পরিচয় শাশ্বত হয়ে রয়েছে। কালের আঘাতে বড়ো ইমারত ভাঙে, মাটির ঘর দেশের হৃদয়ে রক্ষা পায়, সেই কথা তিনি বলেছিলেন। অত্যন্ত শিক্ষিতের সামনে ১৩০১ সালে তিনি 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি পাঠ করেন; পূর্বোক্ত রচনাও ঐ বৎসরে লিখিত। শুনেছি গ্রাম্য ভাষার কাহিনী যখন কবির কণ্ঠে প্রকাশিত হ'ল অনেক উচ্চভুরু তার্কিকও সভাস্থলে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। সেই অপূর্ব সংগ্রহ কবিব বাণীতে মণ্ডিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের মর্মে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে নানাদেশীয় লোকসাহিত্যের যাচাই হয়েছে। কিন্তু কবি যে-কথাটি সেই যুগে বলেছিলেন তা ভবিষ্যদ্বাণী, অর্থাৎ নৃতত্ত্ব মনস্তত্ত্বে যা দেখাচ্ছে অন্তর্দৃষ্টির বলে পূর্ব হতেই তিনি ব্যক্ত করেন। ছড়া যেন সমস্ত জাতির মনোনীহারিকার সৃষ্টি; বহু জীবনের অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষায় রঞ্জিত স্বপ্নময় ইতিহাস। তাব মধ্যে আছে 'লোকস্মৃতি'।

রবীন্দ্রনাথের "ছড়া" গ্রন্থের কবিতায় তেমনি দেখি শুধু জাগ্রত কবি-চিত্তকে নয়, তাঁর মহামানসিক সৃষ্টিরাজ্য ক যেখানে নানা মহলের মনন বেদনময় অনুভূতি আলোড়িত হচ্ছে, সংজ্ঞায় পৌছয়নি। তাঁর বৃহৎ সত্তার যেন আর-একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় তঁ.ব নিজেব কাছেই নতুন; বড়ো সৃষ্টির অবসরে আপন অগোচরলোক হতে চিন্তা-ভাবনার ভগ্নখণ্ডগুলি তুলে দেখছেন, ছন্দের বাহনে আমাদেবও কাছে হাসির ছটায় ব্যক্ত হ'ল। হঠাৎ-লব্ধ আকস্মিকতাই এর প্রধান স্বর, কথাগুলি স্বপ্নের ন্যায়সূত্রে বাঁধা। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেকদিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়-বেদনা সহজেই সংলগ্ন রহিয়াছে।" সহজ সংলগ্নতার এই লক্ষণ ছড়ার ভাষায় ধরা পড়ে। এই গ্রন্থের ছড়া-ঘেঁষা শৈথিল্যেও অবশ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নিপুণ প্রভুত্ব আছেই যেমন রয়েছে চিন্তার আঙ্গিক, কিন্তু ছাঁদ সেই লোকসাহিত্যের, এবং ভাবনাকে জড়িয়ে আছে বর্ণবিলাস।

ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন যার পরিচয় এই বইয়ে পাই। অবচেতনের প্রসঙ্গ তখনো নতুন বিজ্ঞানে দেখা দেয়নি। ছড়ার রাজ্য অনেকাংশে অবচেতনের রাজ্য। মগ্ন মনোলোক হতে কীভাবে রচনার সামগ্রী উদ্ধার হয় একটি উপমার সাহায্যে কবি বুঝিয়েছিলেন: "ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক খেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকুই গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই এড়াইয়া যায়।" শিল্পকুশলতাকে যা এড়িয়ে যায় তা হঠাৎ-লগ্নে ভেসে ওঠে ছড়াব রাজ্যে। বস্তুত সকল সৃষ্টি-কাজেই অজ্ঞাতসারে ছিন্ন ঘটনার গতি প্রকাশের গভীরে মিলতে থাকে, ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়, কিন্তু ছড়ায় তির্যক প্রক্রিয়ার প্রাবল্য। লোকসাহিত্যে অবচেতনার এই স্বতঃস্ফুরণ সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন, "আপনি জন্মিয়াছে এ-কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে।" কেননা 'হয়' এবং 'এইরকম হয়' এইটে সব-চেয়ে বড়ো আশ্চর্য; সজ্ঞান মনের অভ্যাস অনেকরকম হওয়াকে বাধা দেয়, ছড়ায় যেন অব্যাহত আবির্ভাব। একই সঙ্গে বিচিত্র-বৈষয়িক আবির্ভাব, যা অন্য শিল্পে সম্ভব নয়।

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে,
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে-মুহূর্তে থামে,
এলোমেলো ছিন্ন চেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক।

দেখা যাচ্ছে সৃষ্টিশালী কবি মনে অনাসৃষ্টির লীলাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যা ঘটত লোকসাহিত্যের স্বাভাবিক আত্মবিলীনতার মধ্য দিয়ে, কবির রচনায় তার চেয়ে বেশি ঘটল, বিস্মরণের লীলাকে তিনি চারুশিল্পের অধিকারে আনলেন। এখানে অবচেতনার বেগের সঙ্গে মিলেছে সজ্ঞান মনের আত্মসমর্পণ এবং তারই সঙ্গে কবি-ধীবরের এমন সূক্ষ্ম জাল তৈরি যাতে রঙিন ঝিনুক-শামুকের টুকরো পর্যন্ত উঠে আসে। কী উঠেছে দেখতে সকল বয়সের চির-শিশুর ভিড় জমে। নতুন এই "ছড়া" বইখানি পড়তে তেমনি ভিড় হবে।

ঔৎসুক্যের প্রধান একটি কারণ মানুষের মনে চিরস্থায়ী 'কী-জানি' এই ভাব। সৃষ্টির রহস্যে বাস ক'রে কেবলি চারিদিক থেকে দেখতে চাই, বুঝতে পারি জ্ঞানের মধ্যে দৃষ্টিতত্ত্বের সবখানি নেই। স্বপ্নের মধ্যে শুধু স্বপ্নের সন্ধান নয়— সে-ও তো বাস্তব, যেহেতু আছে— জাগ্রত বিশ্বেরও দিগন্ত বিস্তীর্ণ হয়। "ছড়া"র ভূমিকায় কবি বলছেন—

পষ্ট আলোর সৃষ্টি-পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি।
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়মঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।

সহজ সংলগ্নতার কথা কবি বলেছিলেন ; তার প্রকাশ হয় অসংলগ্নতায়। অথচ মন বলে এই যদৃচ্ছ রচনাভঙ্গিতে কোথাও একটি নিগূঢ় ঐক্যের সন্ধান আছে যার উপর বিশ্ববৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠা। ছড়ার মধ্যে স্বপ্নের টেক্‌নিক আছে, অথবা অবচেতনার, সেটাও টেক্‌নিক, যদিও আগাগোড়া এলোমেলো। "ছড়া"র ষষ্ঠ কবিতায় পুকুরের মাছ থেকে গল্প কান ডাঙায় ভেসে এল ; মধ্যে শুনলাম বেডিয়ো, দেখলাম অদৃশ্য ব্যাক্‌টিরিয়া, সাঁতরাগাছির ড্রাইভার, নাচনমণির নাচ, খাঁচাব মধ্যে শ্যামা পাখি, কত-কী। মন বলছে ক্ষীণ ভাবের সূত্র আছে, কিন্তু সেটা এতই লক্ষ্যের বাহিরে যে উপলক্ষ বলতে দোষ নেই। আসল সূত্র সহজাত এই বিশ্বে প্রতিবেশীর ভাব।

ছড়ার রাজ্যে আছে অস্তিত্বের মধ্যে একটা অসংগতির ছবি, যার নিহিতার্থ-সংগতিকে মানুষ খোঁজে। একেই য়েট্‌স্ বলেছেন আধুনিক কবিতার দৃষ্টিতে অসংগতির দার্শনিকতা। বাহিরে এবং মনে ঘটনার পারম্পর্য নয়, প্রতিবেশিত্বও রয়েছে। "যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প— এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ-সকল— সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ ('ছেলেভুলানো ছড়া')।"

সংসারে শতবস্তুর সমাবেশ একটা অদ্ভুত রহস্য। "ছড়া"র সাত নম্বর কাবতায় জুটেছে গলদা চিংড়ি, ফটকে ছোঁড়া, পুলিস সার্জন, নাগা সন্ন্যাসী, মুর্গিহাটার মিঞা— কত নাম করব? কেবল বলতে হয় তারা সবাই আছে। অস্তিত্বের নিগূঢ়তম অসংগতি দেখি ছড়ার রাজ্যে, কিন্তু ছড়া সেখানে আয়না, যা সর্বত্র হচ্ছে তারই চলচ্ছবি। দেখতেই মজা, কিন্তু প্রশ্নও থামে না— কেন? চাবিটা কি হারিয়ে গেছে স্বপ্নে? গানে আছে,

কেউ কখনো পায় কি খুঁজে
স্বপ্নলোকের চাবি?

ছড়ার অসংলগ্নতা সংলগ্ন হয়ে আছে আর-এক সূত্রে। সেটা হচ্ছে মিলের মিল, ছন্দঝংকারের বন্ধন। "ছড়া" বইয়ের কবিতায় মিল এবং অনুপ্রাসের চমৎকারিত্ব চকমকি জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোন পথে চলেছি খেয়াল হয় না, ছন্দে পা ফেলে অনুসরণ করি। মিলের অভিনবত্ব কোন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার দৃষ্টান্ত কী ক'রে দেব, "ছড়া"র প্রতি পদেই এই মিরাক্‌ল্‌ ঘটছে। সব-চেয়ে যা অভাব্য সেইটে এল অভাবনীয় মিলের স্কন্ধে চড়ে,* একেবারে অনিবার্য। 'বস্তা বস্তা কদমা যে' পড়ল 'ব্রহ্মপুত্র নদ মাঝে', 'হাংলু ফিরাং পর্বতের' ধারা 'শর্বতের' স্রোতে পরিণত হলে আশ্চর্য কী? মিলেই খুশি, মিলেই ভাবের ঝল্‌কানি, মিলেই বর্ণ এবং ব্যঞ্জনা, মিলেই অনির্বচনীয়তা। আবার মিলেই প্রচ্ছন্ন পরিহাস-তীব্র সমালোচনা, আধুনিককালের প্রসঙ্গ, রূপকথার আভাস। ছড়া বইখানিকে মিলের প্রসাধন বলা যায়, এমন বৈচিত্র্য কোথাও নেই। "ছড়ার ছবি"তেও নয়।

মিল যেমন অসংগতিকে যোজনা করেছে তেমনি ছড়ার রাজ্যে গরমিল ঘটিয়েছে এই মিল। মিলের টানে যা হবার নয় তা হয়েছে। 'চুল ছাঁটে চাঁদনির দর্জি', এই লাইনটা এবং পরের অনেকগুলি লাইন কবি একদিন পেয়েছিলেন ঘুমের মধ্যে। জেগে উঠেও মিল থামতে চায় না, অগত্যা লিখে ফেলতে হ'ল এবং মিল বেড়েই চলল। দর্জি আনে মর্জি, সেই লাইনটা গেল আগে (লেখবার সময়), জুল্‌ফি থেকে এলো full fee। ভাবতেই সময় পাই না যে দর্জির প্রধান কাজ চুল-ছাঁটা নয়। অনুপ্রাসেও এই হুড়োহুড়ি— চাঁদনি থেকে রাঁধুনি, পিরান থেকে ইরান। মিলান্ত পদের মধ্যবর্তী রাশি-রাশি মিলের খেলা। স্বপ্নের দুর্লভায় যেমন 'আরো-সত্য'কে মেনে নিই, কথার ভেল্‌কিতেও তেমনি সম্ভবকে ডিঙিয়ে যাই।

লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া
নাসা-পথে পাখা দাও গুঁজিয়া।

না দিয়ে উপায় কী? মিলের উপচে পড়ছে রস।

তার পরে হল মজা ভরপুর
যখন সে গেল মজাফরপুর।

দেখা যাচ্ছে ছড়ার দীপ জ্বাললে রক্ষা নেই।

একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চারদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

তা ছাড়া আছে ছবি। আলাদা ক'রে দেখলে নিখুঁত, সম্পূর্ণ; সব মিলে, স্বপ্ন। কোনো-কোনো ছডায় একটি স্পষ্ট ছবির পরিমণ্ডলে বহু স্বতন্ত্র ছবি রয়েছে। সুবের ঐক্য এখানে অনেকটা চেতনা-গ্রাহ্য। একই আলোয় দেখা-পটে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা; কিন্তু দেখার রহস্যটুকু সম্পূর্ণ ভেদ করা যাবে না।

ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
দেউলচূড়ার ত্রিশূলে।

সেই মেঘের আলো পড়ল গ্রামের অনেকখানি জীবনের উপর। সেখানে দেউলের সঙ্গে আছে কামারের কাসারির ব্যবসায়, ধানের ক্ষেত, বর্ষাজলের মাঠ। অথচ অদ্ভুতের হাওয়া বইছে। গীতিকবিতার হৃদয়াবেগ থেকেও নেই; ছবিগুলি যেমন খুশি এসে পডেছে। এতেও 'জোনাবালি মির্জার' ছড়াটির মতো অহেতুকতা, যদিও সেখানে উনপঞ্চাশী পবন জোরে বইছে। সব ছড়াতেই লৌকিক এবং ঘোর অলীক ঘটনার ছড়াছড়ি। সেতুর কাজ করছে স্বপ্নসম্ভাব্য বাক্যের ইন্দ্রধনু।

হাস্যের পিছনে যেখানে ঝলছে পরিহাস ত.ব ব্যাখ্যা করলে রসভঙ্গ হবে। দলাদলির সমরাঙ্গনে জাতীয় বীর্য রক্ষা হচ্ছে, স্থানটা বোধহয় গলির মোড়। উষ্মার মাত্রাটা দেখতে হবে, পরে অন্য বিচার।

এর পরে দুই দলে মিলে ইটপাটকেল ছোঁড়া—
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া।

পরিণামটা শোনাচ্ছে কম, কিন্তু,

পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এপারেতে একেই বলে লড়াই।

মেবার- পতন ও উদ্ধারের আধুনিক এইরকম অভিনয় যে সভায়, খেলার মাঠে, প্রবল হাততালির যোগে সম্পন্ন হয় এ-খবর ছড়ায় ধরা পড়েছে। কবিতাটা আরম্ভ হয়েছিল আজগুবি যুদ্ধে, হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠল দ্রুত কটাক্ষ। এমনি ক'রে নানা জায়গায় দৃষ্টিবাণ ছড়ানো, মর্মে পৌছনোর। দ্বিতীয় ছড়ায় 'নোন্‌তা এবং মিষ্টি'র তত্ত্ব আছে যা আধুনিক সাহিত্যের বোঝা দরকার। অতি সূক্ষ্ম ব'লেই নিগূঢ় তাৎপর্য মনে ব্যাপ্ত হতে থাকে, যদিও সূক্ষ্মতার চতুর্দিকে ম্যাজিকের কাণ্ড ঘটছে। কাগজি-সম্প্রদায়ের পক্ষে উপভোগ্য হওয়া উচিত তিন নম্বরের ছড়া। 'রিপোর্টারে'র কীর্তি এই কবিতায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন ; পুঁথি খুলে দেখুন। 'এডিটর'ও বাদ যাননি। শেষ অবধি সমাধান হ'ল বাক্যে এবং আরো বাক্যে।

পায়রা জমায় সভা বক্‌-বক্‌-বকমে।

অর্থাৎ, অর্থ নেই, শব্দ। বাক্যব্যাপারীর উপযুক্ত। আইনি এবং বিচারজ্ঞের জগৎ পড়বেন চতুর্থ ছড়া। কিছু অর্থোদ্গম হবেই।

নিজেকে নিয়ে খেলা। এর মধ্যে লোকসাহিত্যের রস মিলেছে সচেতনার ঐশ্বর্যে। যে-সময়ে কবি নিজেকে হাসিয়েছেন তাঁর সেই সময়ের ব্যক্তিগত ইতিহাস জানলে হাসির সম্পদকে আরো অমূল্য মনে হয়— কিন্তু আনন্দলোকে কোনো ছায়া নেই। ছায়াহীন মাধুরীকে এই ছড়ার জগতে দেখব। শৈশবের একটি নতুন ভুবন তৈরি হ'ল সাহিত্যে ; দূর কাল পর্যন্ত তাতে আলো পড়বে।

লোকসাহিত্য সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন, "এই-সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। ·· এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।" আর-এক জায়গায় বলছেন, "সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে ; অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।"

"ছড়া" বইখানি পড়বার কালে চিরনবীনতার এই তত্ত্ব মনে পড়েছিল।

গানের গান

'গানের গান' বলতে আমরা রবীন্দ্রগীতসৌধের বিশেষ একটি আশ্চর্য নির্দিষ্ট মহলকে বুঝি ; দ্রুত উল্লেখ করতে হলে কবি নিজেও তাঁর গান-সম্বন্ধীয় গানকে ঐ নাম দিতেন। হঠাৎ মনে না হতে পারে ঐ বিশেষ পরিচয়ের গান সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে কত ব্যাপক, সৃজনীধারার কত বাঁকে-বাঁকে তার ইতিহাস কবির জীবনের সঙ্গে জড়িত। একদিকে ধ্যানোজ্জ্বল আদি হিমাদ্রি, অন্যদিকে মহা-চিত্তের অতল প্রকাশ, দুয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর গানের প্রবাহিণী বৃহৎ মানব-সংসারের নানা ফসলের সন্ধান নিয়ে বয়ে চলেছে। তাই, গানকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিশীল জীবনের রূপকতায় বারংবার বর্ণনা করেছেন ; কৈশোর হতে প্রাণের সন্ধ্যা ও রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ পথ-চলার কাহিনী তাঁর গানের বাঁশিতে বেজেছে, আলোয় জ্বলেছে ; অন্তরের নীরবতায় ধ্বনিত হয়েছে এই গান। গান তাঁর বাণীর প্রতীক, তাঁর প্রেরণা, প্রাণের সঙ্গে পৃথিবীর সেতু। গান শোনাতে তাঁর আসা, গানের তার বাঁধতে হবে প্রাণের যন্ত্রে, গীতসাধনার মধ্য দিয়ে কবির চিরমানবিক তপস্যা। গানের চোখে ভুবনকে দেখলে তাকে চেনা যায় ; এই দেখবার চোখ তৈরি হ'ল মর্তলোকের কোন আদিকাল থেকে ; গান দিয়ে জানবার যাত্রা চলেছে জন্মমৃত্যুকে পার হয়ে ; চিরন্তন-প্রকাশ-রূপী তাঁর এই গান। নিজের কণ্ঠকে, বাঁশিকে, বীণার তন্ত্রকে তিনি গান শোনাবার কাজে লাগালেন ; যাবার কালে যন্ত্র রইল পড়ে, গান রেখে গেলেন পিছনে। কখনো বলেছেন, গান তাঁর শেষ-পারানির কড়ি ; সমস্ত জীবনের সুখদুঃখকে একটি গানের সুরে গেঁথে নেবেন ; এই এক বর চেয়েছেন যেন মৃত্যু হতে জেগে ওঠেন গানের নতুন সুর-লোকে। পৃথিবীতে রেখে গেলেন যে-গান তার জন্যে মায়া না জাগুক, ভেসে যাক তারা বিদায়ের হাওয়ায়, থাকুক জড়িয়ে হৃদয়ের রঙে, বর্ষার মেঘে ; গানে-গানেই প্রাণের বন্ধন কাটিয়ে মুক্তি দেখা দিক।

কত বিচিত্র নতুন প্রসঙ্গে গানের কথা রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন তা গীতবিতানের পথিক মাত্রেই জানেন। অনুশীলন করলে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর এই বিশেষ গানগুলিকে সাজানো চলে। পরিবেশের পার্থক্যে এক-একটি গান নতুনতর উজ্জ্বলতায় দেখা দেয়, গানের মালায় তার রং বদলায়। সাজাবার সময়

গ্রন্থনকারের মনে রাগরাগিণীর অনন্য স্বরূপও কথার সঙ্গে গুঞ্জরিত হবে, কিন্তু সে আর-একটি বড়ো দিক। রবীন্দ্রনাথের গানে কোনোখানে কথা ও সংগীতে মাধুরীর ছেদ নেই, সমগ্র গানের স্বকীয়তা দুয়ের যুগাত্মক; কিন্তু বিশ্লেষণের কালে কাব্যের দিক থেকেও গানের বিচার সম্ভবপর। শুধুমাত্র কথার ভাব অনুসারে গানের গানগুলিকে ভাগ করলে সৃজনলোকের বহু সন্ধান পাওয়া যায়।

তিনটি পর্যায়ে গানগুলিকে সাজানো চলে।

যিনি গান শুনছেন, গান শোনাবার তাগিদ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন কবিকে, তিনি স্বয়ং সুরস্রষ্টা। সমস্ত রূপলোকই তাঁর সংগীত, তিনি বেঁধে দিয়েছেন ধ্রুবপদ, সেই বিশ্বতানে জীবনকে মেলাতে হবে। গগনের নীলের সঙ্গে হোক মনের মিল, জীবনের উদয়াস্ত ভ'রে উঠুক নিত্যের সংগীতে। এই গান শোনান যিনি তাঁর সুরের ধারা পাষাণ ভেঙে বয়ে যায়, ভুবনের কোটি আলোয় ছেয়ে থাকে, সুরের মহাবায়ু আকাশে-আকাশে সঞ্চারিত। কবি বাসা বাঁধতে চান উৎসধারার পাশে, যেখানে অনন্তের বিশ্বগীত নির্ঝরিত হয়ে প্রাণের অন্তরে ভিড়ে ওঠে, ধ্বনির তরঙ্গে ফোটায় গানের তারা, ফুলের কেন্দ্রে মধুর মতো পূর্ণ হয় হৃদয়ের সুর। কখনো বলছেন, মাটির কলস তাঁর ছাপিয়ে গেল, ঝরনা-তলার নির্জনে এসে তিনি সকল দানের অতিরিক্ত পেলেন অসীমের তটে: করুণধারার কলসংগীত শুনতে এসেছেন কবি দিনান্তের একাকী মুহূর্তে। উপমা বদলে যায়; শান্তিবারির স্থলে দেখি সুরের আগুন; মরা ডালে নৃত্য করে তারই মন্ত্রশিখা, রাতের আকাশে ফোটে সেই অনলের স্বর্ণকমল। অগ্নিবীণা বাজিয়ে তিনি নতুন সৃষ্টির বেদনা জাগালেন। যিনি সুরবিধাতা তাঁর বাণী জ্বলে ওঠে বিশ্বের দীপালিকায়, কবির চিত্তপ্রদীপে তারই আগুন জ্বলুক; নির্বাণহীন তাঁর আলোকিত ইচ্ছায় ব্যক্ত হোক এই রূপের সাধনা। একই গানে অরূপের সুরকে বলা হয়েছে বসন্তের গীতলেখা, প্রাণের কেন্দ্রে সে সংগীতের নিশ্বাস ভ'রে দেয়, পুষ্পে-পর্ণে অন্তরে-অন্তরে তাই রঙের উৎসব। যিনি বাঁশি বাজান তিনি সুরের রাখাল, মহাগগনতলে তাঁর আলোক-ধেনুগুলি চরছে, সূর্যতারা দলে-দলে যাতায়াত করে সেই বেণুর সংকেতে। কখনো এই বেণু বাজে বনের পাতায়, পাখির গানে· পাষাণ দিয়ে বাঁধা জীবনের বাহিরে গিয়ে কবি শুনতে চান সেই সৃষ্টির বাঁশি, সহজ প্রাণের সুর। বীণাপাণি বাজান তাঁর অদৃশ্য বীণা, কখনো শুনি কখনো ভুলি, কিন্তু সুরের গোপন কথা আকাশে ধরণীতে প্রকাশ পায়, মধুকরের ত্বরিত পাখা চলে সেই সুরের পথ খুঁজে।

এমনি ক'রে কত শ্রাবণের ধারার মতো, কত গন্ধে বরনে গানে, বিশ্ব জুড়ে উদার সুরে সৃষ্টির আনন্দ বেজে উঠল ; সীমার মধ্যে অসীমের এই সুর, এই সুরে তিনি আমাদের ঘুম ভাঙান, যখন শুনি না তখনো আমাদেরই জন্যে নিত্যবীণা বাজতে থাকে। শুভ্র নবশঙ্খে বাজে তাঁর সুর, পিনাকে লাগে তাঁর টংকার, বজ্রে বাঁশি বাজিয়ে সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তকে তিনি সৃষ্টির নৃত্যে মাতান ; আঘাতে-আঘাতে ঝংকৃত হয় তাঁরই স্পর্শ জীবনের তারে, নিঠুর মূর্ছনায় গানের মূর্তি-সঞ্চার করেন তিনি। তিনিই আসেন নীরব মহামন্ত্রে, গভীর রজনীতে ; কবির হৃদয়-বাঁশি কেড়ে নিয়ে আপনি বাজান, গ্রহ-শশী যে-তান শুনে অবাক, সেই জীবনমরণপারের সুর অকূল তিমিরে শুনতে থাকেন কবি।

পৃথিবীর কবির কণ্ঠে জাগল উত্তর। কখনো গান-শোনার আনন্দই তাঁর গান, সুর-সুরধুনীর স্রোতে আপন গীতসমর্পণে তিনি ধন্য। গীতময় প্রত্যুত্তর দেবার পালা এই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'গানেব গানে' বিচিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এইখানে মর্তকবির বিশিষ্ট অধিকার। গীতসৃষ্টির তপস্যায় আগুন জ্বালিয়ে আলোয় উত্তরণ, ব্যক্তিগত এই সাধনার বিরাম নেই। ঝড়ে আলো নিবে যায়, মেঘে আচ্ছন্ন করে ; যন্ত্রকে বারে-বারে নতুন বাঁধতে হবে, ছেঁড়া তার বদলানো চাই। নিজের শক্তিতে যখন কুলোয় না, সুরের গুরুর কাছে ফিরে-ফিরে কবি সুরের দীক্ষা নিতে বসেন। দুঃখে পুড়িয়ে, সংসারের শোকে সংগ্রামে আজীবন প্রতিষ্ঠিত ক'বে তারই মধ্যে মুক্তির সুখ দিয়ে কবির কণ্ঠে গান জাগালেন সৃষ্টি-কার। সমস্ত সংসারটাই কবির কণ্ঠে গান জাগানোর আয়োজন, সুরের পরীক্ষা প্রতিমুহূর্তে ; মাটির জীবনে কত বিচিত্র কত আশ্চর্য প্রাণের সংগীত কবির অনুরাগে বিরাগে ধ্বনিত হ'ল। যাকে বলা যায় পরিবেশ-ধরণী, জল মাটি হাওয়ার সংসার, তাকে নিয়ে গানের-গানে নিত্যনতুন উৎসব। সবুজ ঘাস, বর্ষার মেঘ, ঝরাপাতার রং, বসন্তের ফুল আসে আরম্ভ এবং অবসানের সুর নিয়ে, রেখে যায় নিরবসান মাধুর্য। কোনো-একটি পুষ্পিত পর্ব নেই যাকে রবীন্দ্রনাথের গানে বাঁধা হয়নি ; ফল-ফসলের গান, শূন্য মাঠের গান, জল-ঝরানো দিনের মর্মরতা তাঁর গানের ঋতুচক্রে আবর্তিত। হৃদয়-মনের সূক্ষ্মতম বোধ মাটির ভূমিকায় ধরা দিল। আবার মানবজীবনের একটি আকাশিকা আছে, যেখানে অদৃশ্য হাওয়াবদল হয়, রঙের দিগন্তে মেঘ-বিদ্যুতের খেলা, সৌরভের উৎসব ; যেখানে পূর্ণিমার চাঁদ এবং কালোরাত্রির তারা দেখা দেয়, সূর্যদিন নেমে আসে পৃথিবীতে। মাটি ও আকাশের সমাবর্ত, তাপ ও আলোর অনুষ্ঠান, ঋতুলগ্নগুলির

মঙ্গলসমারোহ কবির গানে ভাষা পেয়েছে। প্রকৃতির নিত্য-সৌন্দর্যবিভিন্নতা তাঁর অজস্র নতুন গানকে সঙ্গে নিয়ে এল। এই তাঁর গীতময় প্রত্যুত্তর। বর্ষামুখর রাত্রে, ফাল্গুনী হাওয়ায়, গ্রীষ্মশীতের কঠোরমাধুর্যে তিনি তাঁর গান শোনালেন সৃষ্টির কবিকে, যিনি মর্তকবিকে গান শুনিয়ে নিজেও শুনছেন। এতই স্পষ্ট স্বতন্ত্র হয়ে এই প্রাকৃত ধরণীর গানগুলি শিল্পরূপ নিয়েছে যে মনে হয় বাংলার বিশ্বপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার; আমরা তাঁরই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের ভুবনকে সত্য ক'রে দেখলাম, জানলাম, গ্রহণ করলাম।

এরই পাশাপাশি মিশিয়ে রয়েছে মানুষের সংসার; আকাশ ও মাটির সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন এই আমাদের জীবনপর্যায়। সেখানে কান্নাহাসির পৌষ-ফাগুনের মধ্য দিয়ে যাত্রা। কখনো মিলনে, কখনো বিরহে গানের ডালা নিয়ে চলেন কবি। বিরাম নেই তাঁর সৃষ্টিকাজে; ফুল ফুটিয়ে, ফল ধরিয়ে অর্ঘ নিয়ে যেতে হবে। গানে-গানে তিনি জানিয়ে গেছেন কতবড়ো দুঃসহ সৌভাগ্য তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। যখন সবাই ফিরেছে দীপ-জ্বালা ঘরে, তাঁকে ডেকেছে বাহিরের রাস্তায়; ঘুম-ভাঙানিয়া এসেছেন নিবিড় দুঃখের রাত্রে, তাঁরই গান শুনতে। পথের কাঁটা মাড়িয়ে দগ্ধ দুপুরে তিনি দিগন্তের গান বাঁধলেন; দীর্ঘ-দিনের তপ তাঁর সন্ধ্যাব গীতাগ্নিতে আবার জ্বলে উঠল। অনাদরে অবহেলায় তাঁকে গান গাইতে হয়েছে, দিনের পথিক সবাই তা জানে না; ভয় তাঁর পাছে সুরভ্রষ্ট হন, ছিন্নতারের জয় হলে তাঁরই ব্যর্থতা। রজনীগন্ধার রাত্রে হয়তো কে আসবেন, যদি আজই হয় লগ্ন, স্তিমিতদীপ প্রহরে-প্রহরে কবি জেগে আছেন গান নিয়ে। নক্ষত্রের গান, ভোরেব গান, প্রভাত-রৌদ্রের গান শোনাবার ভার তাঁর উপর; গানের পর গান শোনাবেন, অবসর তিনি চাননি।

কখনো মনে হয়েছে সাধনা সম্পূর্ণ হ'ল; অলোক-অদৃশ্য-চারিণী ছায়াকে গীতছন্দে ধরবেন বলে পণ করেছিলেন, এতদিনে তাঁর গানের বন্ধন মেনে নিল। গান তাঁর ছুঁয়েছে মুক্তিকে, পেয়েছে শ্রেষ্ঠতমের চরণ, নিজে তিনি পড়ে রইলেন এপারে। কখনো বিশ্বস্রষ্টার সমাসনে বসেন মর্তের কবি, যিনি বিধাতা তাঁকে পান বন্ধুরূপে, গীতসৃষ্টির তন্ময় সহযোগিতায় জেগে ওঠে গান। গান গাইতেই তাঁর আসা, গানের অনন্ত পথে দূরে যাওয়া, আসা-যাওয়ার পথের ধারে ব'সে তিনি গান শুনিয়ে গেছেন। তবু মনে হয়েছে, যে-গান গাইতে এসেছিলেন তা আজও গাওয়া হয়নি; সমস্ত জীবন কেটেছে সুরের সাধনায়, সুরের চরম মূর্তিকে মূর্তি দেওয়া যায় না। আবার কোনো গানে বলেছেন, যা চেয়েছিলেন

তা এই বিরাজে, গানে উদ্ভাসিত চিরন্তন সহজ রূপে তিনি এই তো পেয়েছেন, তিনি জেনেছেন। যারা কথা দিয়ে কথা বলে তারা জানে না, যারা অন্তরের সুর বাজায় তারাই জানে।

এই গান-শোনা, গান-শোনানো, গানের দেওয়া-নেওয়ার কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ গীতবিতানের 'পূজা', ও 'প্রেম' এই দুই ভাগে সাজিয়েছিলেন। 'পূজা'-অংশে প্রধানত স্বরস্রষ্টার কথা আছে, বিশ্বলোক যাঁর রাগিণী, বিশেষভাবে 'পূজা'র প্রথম কয়েকটি গানে। গান যেখানে ভক্তিরসে বিধৃত, কবির নিজেব সংগীতও সেখানে পূজার পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। 'প্রেম'-অংশে দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ, বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়ে গীতলীলা , বিশেষভাবে কবিব আনন্দময় আসন সুখদুঃখের সুরে শিল্পিত এই গান। কিন্তু পূজা ও প্রেমেব মধ্যে তো ছেদ নেই , কবির সংকল্পিত গীতবিতানে তাই লীবিকের মালা গাঁথা হয়েছে, বিশেষ উপভোগের জন্য; ভাবেব বিভিন্নতা কিন্তু বক্ষা হয়নি। গীতবিতানের প্রথম খণ্ডেব প্রায় সমস্তখানি 'পূজা' ; তার অন্তর্গত ৬২৯টি গানকে একুশটি স্বতন্ত্র নামে ভাগ করা হয়েছে, যেমন, গান বন্ধু প্রার্থনা বিরহ দুঃখ আত্মবোধন ইত্যাদি , এর মধ্যে বহু গানকেই অন্যভাবেও দেখা চলে। সব জড়িয়ে পাঠক একটি ঐক্যধারা অনুভব করবেন। শেষ অংশের 'পবিণয়'-এর গানগুলিতেও পূজাব সংগীত শোনা যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু পবিণয়েব গান তো প্রেমেরও, সুতরাং গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডে 'প্রেম'-শীর্ষক বিভাগে তা যুক্ত হলেও ক্ষতি হ'ত না। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্রে গ নব প্রথম লাইনগুলি পড়েও গানের গানগুলি বেছে নেওয়া যায়, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এরকম সঞ্চয়নের কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। কেননা, শুধু গান, অথবা সুবব্যঞ্জক বিশেষ শব্দ যন্ত্র বা অলক্ষ্য অনাহত সংগীতের উল্লেখ অনুসারে গান সংগ্রহ করলে চলবে না। তাতে যে-গানগুলি পাওয়া যাবে তা সংখ্যায় অনেক হলেও বহু গানের-গান তা থেকে বাদ পড়বে। অপরপক্ষে সংগীতের বিশেষ নামোল্লেখ নেই, অথচ গানের মধ্য দিয়ে কবি যেখানে তাঁর উত্তব দিয়েছেন, এমন গান খুঁজতে গেলে প্রায় বেশির ভাগ গানকেই ধরতে হয়।

তবু বলা চলে গীতবিতানের মালঞ্চে যে-কোনোখান থেকে কতকগুলি গান তুলে নিলে তার মধ্যে বিশ্বগীতস্রষ্টার গান, এবং কবির আপন গান, এই দুই পর্যায়ের রচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কঠিন নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু উদাহরণ উপরে আছে। গীতরচয়িতা কবির আপন গানের

বাণীরূপে দ্বিতীয় পর্যায়ের আরও কিছু গানের প্রথম লাইন এইখানে উদ্‌ধৃত করি :

(১) কূল থেকে মোর গানের তরী (২) আপন গানের টানে (৩) আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান (৪) গানের সুরের আসনখানি (৫) খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী (৬) আমার যে-গান তোমার (৭) আমার ঢালা গানের ধারা (৮) আমার মনের মাঝে যে-গান বাজে (৯) কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার (১০) গানের ডালি ভরে দে গো (১১) নিদ্রাহারা রাতের এ গান (১২) সময় কারো যে নাই (১৩) আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে (১৪) গানের ভেলায় বেলা-অবেলায় (১৫) অনেক দিনের আমার যে-গান (১৬) আমার আপন গান আমার অগোচরে (১৭) উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে (১৮) আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে (১৯) দিন পরে যায় দিন (২০) আমি কী গান গাব (২১) আকাশভরা সূর্যতারা (২২) আকাশ আমায় ভরল আলোয় (২৩) তোমার নয়ন আমায় বারে বারে (২৪) আনন্দগান উঠুক তবে বাজি (২৫) কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে।

এইরকম আরো অনেকগুচ্ছ গান একত্র ক'রে স্বকীয় গান সম্বন্ধে কবির গীতরচনাকে হারে গাঁথা চলে। আশ্চর্য এই যে একটিমাত্র লাইনের সোনার কাঠিতে মন মাধুর্যে ভরে যায়; যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে একাত্ম তাঁরা একটু ইশারার মধ্য দিয়েও মায়ারাজ্যের নানা পথে সঞ্চরণ ক'রে থাকেন। এক-একটি পদের অন্তরালে সমস্ত গানের রূপ মনে আবির্ভূত হয়। সুরের স্মৃতি এবং কবিতা-পড়ার আনন্দ একত্র মিলিয়ে যাঁরা গান পড়েন তাঁরা ভাগ্যবান; কিন্তু সুর না জানা থাকলেও সূচীপত্র থেকে ভিতরের পৃষ্ঠা এবং নানা প্রসঙ্গে সংযোজিত গানের কথায় যাতায়াত করাতেও বিশেষ একটি তৃপ্তি আছে, যা কেবলমাত্র কবিতার বইয়ে মেলে না। ছোটো-ছোটো লিরিকের ভিতর দিয়ে যে-কাব্যরস মনে সঞ্চারিত হয় তারই পরিবেশন করা রবীন্দ্রনাথের সাজানো গীতবিতানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল; সব গান খুব ছোটোও নয়। বিশুদ্ধ গীতিকবিতার বিশ্ব-সাহিত্যে এই রচনাগুলির তুলনা আছে বলে জানি না।

গানের-গান বলতে সব-চেয়ে নির্দিষ্টভাবে তৃতীয় একটি গীতপরিধি নির্ণয় করা যায়। উৎসবে অনুষ্ঠানে গান বাঁধতে তাঁর ভালো লাগত; নতুন-নতুন গান রচনা করে কবি কত আনন্দ পেয়েছেন তা আমরা জানি; এই ব্যক্তিগত

কথাটুকু তাঁর নানা গানে ছড়িয়ে আছে। নিজের মনে গান গেয়েছেন, অন্যকে শুনিয়েছেন; সুখে-দুঃখে তাঁর গান সংসারে শান্তি এনেছে, ভালোবাসা ভ'রে দিয়েছে; এরই প্রসঙ্গ দেখি তাঁর গানে। গানের বন্যা অভাবিত নামত তাঁর মনে, শৈবালের দলের মতো চঞ্চল লীলাস্রোতে দুলত আলোয়, তার কথা কত সহজ কত আশ্চর্য ক'রে গেয়েছেন। 'বাঁশি আমি বাজাইনি কি পথের ধারে ধারে' এই কথা তিনি কখনো দুঃখে, কখনো ব্যাকুলতার অভিমানে, কখনো আনন্দে, প্রশ্নোত্তর বা প্রশ্নের আকারে সাজিয়ে গেছেন। যেমন দেখি বহু কবিতায় এবং গদ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রেখে যাওয়ার গূঢ়তম তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন, বলেছেন গীতচিত্রিত এই হ'ল তাঁর প্রত্যুপহার পৃথিবীকে মানুষকে জীবনকে; তেমনি তাঁর কয়েকটি গানে এই তাঁর আপন একান্ত সৃষ্টি তাঁর গানগুলিকে পিছনে রেখে যাবার প্রসঙ্গে তাঁর গভীরতম সৃষ্টিচেতনা ব্যক্ত হয়েছে। কত অল্পে, কত সহজে ছিল তাঁর গানের দুর্লভ আয়োজন। সামান্য একটু আলো স্পর্শ; হাওয়ায় সৌরভের ছোঁওয়া; কিছু পলাশ, কিছু চাঁপার মোহাবিষ্ট মুহূর্ত; এরই রঙে-রসে জড়িয়ে মাটির ফাল্গুনী পাত্র তাঁর স্বরচিত ফাল্গুনীর গান দিয়ে ভরে দিয়েছেন। বসন্তে-বসন্তে যে কবিকে ডাক পড়ত, তিনি যাবার আগে বসন্তের গানখানি রচনা করেছিলেন— সমস্ত জীবনটাই প্রাণবসন্তের রাগিণীতে এসে সমাহিত হ'ল। যে-গান তিনি এই পৃথিবীর অধীশ্বর পরম-পার্থিব কবিকে শোনালেন তা ফিরে-ফিরে দেখা দেবে, বর্ষামুখর রাত্রে দক্ষিণ-হাওয়ায়; সেই গানগুলি একটি মর্ত কবির স্মারণিক হয়ে রইল। কিন্তু ঐ একই গানে দেখি মোহের অবসান, নিজের সৃষ্টির উপর কবির চরম নির্ভর নেই। তাঁর গানও ভুলে হারিয়ে থাক্, সমস্ত সৃষ্টিলোকের সংগীত শুনে তিনি গানের যে-প্রেরণা পেয়েছিলেন তা তো হারাবে না। স্মরণ-বিস্মরণের বন্ধনে কবির গান বাঁধা থাকবে না, তিনিও না; যাক ভেসে তাঁর গান দিনের পসরাটুকু নিয়ে, প্রসন্নমনে বিদায়ের বেলা কাটুক। কালের স্রোতে নৌকো অদৃশ্য হয়ে যায়, ভুলে-যাওয়া সম্ভার কে চায় ফিরে নিতে? কিন্তু আপন গান সম্বন্ধে এই মুক্তির আনন্দ কত গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে কবিকে অর্জন করতে হয়েছিল তা গানের সুরে, কথার আবেগে প্রকাশ পেয়েছে। গানের-গানগুলিতে আপন বাঁশিকে প্রতীক করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন গান সম্বন্ধে মর্মতম অনুভূতি জানিয়ে গেছেন। সমস্ত জীবনের মূলে তাঁর একটি কথা ছিল, যা কথায় বলা যায় না, বুকের তলায় ভ'রে রইল, সমস্ত জীবনের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন যে-চরম

অজানা কথা তারই সুর কেবল লাগল তাঁর বাঁশিতে— 'বাঁশিটিকে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে।' সেই গানের বাঁশিকেও রেখে যেতে হবে। অগোচরে সে-ই চুরি ক'রে নিয়েছিল প্রাণের কথা, কবির জীবনের সকাল সন্ধ্যায় বিদায়-আগমনীর কত সুর কত ছন্দ বাজল তাঁর বাঁশিতে। রাত্রি ভোর হ'ল। শুভ্র শরৎপ্রাতে একই সঙ্গে অবসান এবং নতুন জাগরণ। শিউলিফুলের মতো গানগুলি পড়ে থাক, সুন্দর অবসান হোক তাদেরও। শিশিরাশ্রুতে পড়েছে আশ্চর্য প্রভাতের আলো ; গানের-গানে এই আলোর জাগরণ, আলোর বেদনা দেখতে পাই।

গীতাঞ্জলি'ও সত্য-কবিতা

[গত ফাল্গুন মাসের 'অলকা'য় শ্রীমান মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বি. এ. 'গীতাঞ্জলি ও সত্য কবিতা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের অনেক মত বিচার্য। শ্রীমান অমিয় চক্রবর্তী এই প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ করেন। প্রবন্ধটা 'অলকা'র জন্যই লেখা হয় কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটা গত মাঘ ফাল্গুনের 'সবুজপত্রে' ছাপা হয। সবুজপত্র হ'তে সেই প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হ'ল। শ্রীমান মহেন্দ্র এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছেন 'পুনশ্চ' নাম দিয়ে, এবার শ্রীমান অমিয় 'সমাপ্তি' নামে ছোট একটি টিপ্পনী কেটেছেন। এই বাদ-প্রতিবাদের মীমাংসা করুন 'অলকা'র পাঠক পাঠিকা। তবে আমাদেব মনে হয দু-পক্ষেই কিছু বলা যেতে পারে', অবশ্য এ মতটাও বহুদিনেব, Sir Roger de Coverly-ব কাছ থেকে ধাব কবা।

সম্পাদক

প্রমথ চৌধুবী]

উপরোক্ত প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে এই সমালোচকেব অমিল কেবল মতামতের পার্থক্যে নয়, সাহিত্য জিনিসটাকে উনি যেভাবে দেখেন তা কিছু পরিমাণে আমার দৃষ্টিবিরুদ্ধ— এ-বিষয়ে প্রকৃতিগত রুচিভেদ মানতে হবে। তর্কবিতর্কে কোনো বিশেষ ফল হবে ব'লে আশা কবি না। সাহিত্যকে নিজের অনুভূতি, নিজের আনন্দের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা ক'বে থাকি। এই অনুভূতি এই আনন্দই আমার কাছে সত্য, পাশ্চাত্য দেশের কোনো বিশেষ পন্থীর মতামত, তাদের রুচি বিচাবের নিয়মাবলী, কাব্যকে রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা সম্বন্ধে তাদের বিচিত্র বিধিবিধান— এ সমস্তই যেন দূরের কথা, এবং অনেকটা কম মূল্যবান। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের অনুকরণপ্রিয় সমালোচকগোষ্ঠীর মতো এই প্রবন্ধ রচয়িতার মনও বিশেষ তত্ত্বেব দিকে ঝুঁকেছে; নিজের স্বতন্ত্র ভালো লাগার বা মন্দ লাগার হাওয়া যে সহজে বয়ে যাবে সে-পথ উনি খোলা রাখতে সাহস পাননি— দরকারও বোধ করেননি। পশ্চিম দেশের লোকের বিচারশক্তির উপর এঁদের এতটা অন্ধ প্রতীতি যে, অজ্ঞাতকুলশীল যে-কোনো বিদেশী লেখকের রচনা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত ক'রে দিতে পারলে এঁদের মন সান্ত্বনা পায়; প্রবন্ধের গোড়াতেই লেখক আড়ম্বর-সহকারে Miss

এই নিবন্ধটি লেখকের প্রথম প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৩২৯) সাহিত্যসমালোচনা

Sturgeon নামে কোনো-এক ইংরেজ লেখিকার যে-কয়েকটি অতিগম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য তুলে দিয়েছেন তাতেই এ-কথা প্রমাণিত হচ্ছে। তাছাড়া, প্রবন্ধটি আগাগোড়াই নানা পাশ্চাত্যদেশী সমালোচকের অতিপুরাতন যুক্তি-তর্কের ছায়া-চিত্রে এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারণে পরিপূর্ণ। *New Ways of Literature* বইটি আমি পড়িনি, কিন্তু উদ্ধৃত বাক্যগুলি প'ড়ে উক্ত বইয়ের জন্যে অধীর হইনি। সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের অনুকরণে কাব্যকে অংশ-প্রত্যংশে বিচ্ছিন্ন ক'রে চুল-চেরা সমালোচনার দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে রস ও বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করবার লোভ সংবরণ করব।

প্রবন্ধ-লেখকের দু-একটি বিশেষ তীব্র মন্তব্য নিয়েও কিছু বলবার ইচ্ছে আছে। যদি গোলাপ ফুল দেখে কেউ বলে আমার ভালো লাগে না, খানিকটা রং আর গন্ধের অর্থহীন সংমিশ্রণ দেখে খুশি হয়ে ওঠা আমার কাছে নিতান্ত মানসিক দুর্বলতার পরিচয় ব'লেই মনে হয়— তাহলে অবশ্য তার উপর কথা বলতে যাওয়া নিষ্ফল। যেখানে প্রভেদের হেতু গভীর-প্রতিষ্ঠিত সেখানে বিতর্ক শক্তিব অপব্যয় মাত্র। তাছাডা ভালো-লাগা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু ছাপার অক্ষরে দশজনের সমুখে যদি কেবলি বলা যায় যে, ফুল আমার ভালো লাগে না এবং কেন লাগে না তা-ও বুঝিয়ে বলছি, তাহলে অন্য কথা ; কারণ এ-জায়গায় 'আমাব ভালো লাগে না' বলার মধ্যে এই কথা বলার চেষ্টা রয়েছে, ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, শুধু-যে আমার লাগছে না তা নয়, আর কারো ভালো লাগা উচিত নয়। অন্যের মতামতের বিরুদ্ধে এখানে একটা স্পর্ধাপূর্ণ আহ্বান : সেইজন্য অন্যের পক্ষেও উত্তর দেওয়া সম্ভব। গত সংখ্যার 'অলকা'য় যে-প্রবন্ধটি বেরিয়েছে তারও ভাব এই, লেখক যে শুধু "গীতাঞ্জলি" প'ড়ে খুশি হননি তা নয়, অন্যে প'ড়ে যে আনন্দ পাচ্ছে এ দেখেও তাঁর মনে বিরুদ্ধভাব জেগে উঠেছে। নইলে ঐ প্রবন্ধ-লেখার কোনো মানে থাকত না। উক্ত রচনার বিস্তৃত সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যে দুটি-একটি কথা আমার মনে রয়ে গেছে তার উত্তরে কিছু বলতে চাই।

১. প্রথম এবং প্রধান কথা এই যে, প্রবন্ধের নামকরণের মধ্যেই "গীতাঞ্জলি" সম্বন্ধে লেখকের একটা প্রকাণ্ড অবিচার ব্যক্ত হয়েছে। সকলেই জানেন যে, "গীতাঞ্জলি"তে যা আছে তার প্রত্যেকটিই হচ্ছে গান। গান মাত্রেই সুরের অপেক্ষা রাখে, তা না হলে তার অন্তরতম ভাবরূপের পূর্ণ বিকাশ নেই।

গানের কথার মধ্যে কবি ইচ্ছে ক'রেই সুরের জন্যে খানিকটা ক'রে ফাঁক রেখে যান, সংগীতে সেই ফাঁকগুলি ভ'রে দেয়। সুতরাং গানকে 'সত্য-কবিতা'র মাপকাঠিতে পরীক্ষা করতে যাওয়া বিশেষ রসজ্ঞতার পরিচায়ক বলে মনে হয় না। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' এই গানটির উপরই দেখছি প্রবন্ধ-লেখকের রাগ সব-চেয়ে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে, তিনি বলেছেন এই গানের মধ্যে কোনো কবিত্বপ্রকাশ, মাধুর্য, কোনো সৌন্দর্যই নেই, এটা কেবল একটা ছন্দোবদ্ধ নীতি-উপদেশ মাত্র। কথাটা যে নিছক সত্য নয় তা সহজ মনে যিনি ঐ গানটি পড়েছেন, বা যাঁর ঐ গানটি সুর-সংযোগে শোনবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য ঘটেছে তিনিই বুঝবেন। এ-বিষয়ে আর বেশি কিছু বলবার আছে মনে করি না।

২. "গীতাঞ্জলি"র গানগুলিকে খামকা তিন-চার ভাগে বিভক্ত করার কোনো তাৎপর্য আমি বুঝতে পারিনি, এবং কোন আদর্শের দিক থেকে, কোন বিচারে এই ভিন্ন-ভিন্ন ভাগ কবা হয়েছে তা আমার কাছে এবং খুবই সম্ভব অন্য পাঠকের কাছেও স্পষ্ট হয়নি। প্রত্যেক কবিতার বইয়ে নানাজাতীয় লেখা থাকে, কোনোটা হয়তো আমাদেব মন অনির্দিষ্ট ব্যাকুলতায় চঞ্চল ক'রে তোলে, কোনোটা হৃদয়ে গভীব পুলকের সঞ্চার করে, কোনোটা-বা নিবিড় বেদনায় মীড় টেনে-টেনে চলে। কিন্তু এর মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণীর রচনা হঠাৎ ভালো লেগে গিয়েছে ব'লে শুধু তারই খানিকটা প্রশংসা ক'বে অন্যান্য লেখার মধ্যে যে কবিব কবিত্বশক্তির অভাব প্রমাণ করতে হবে এমন কথা নেই। যদি কেউ বলেন, সেই ধরনের লেখাই আমার পছন্দ যা তেমন গভীর ভাব-সম্পদে পূর্ণ নয় অথচ মনকে বেশ একটু দোলা দিয়ে যায়, চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত ক'রে তোলা যার উদ্দেশ্য নয়, মনকে হিল্লোলিত ক'রে তোলাতেই যার সার্থকতা— তাহলে কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই বিরত না হয়ে যদি তিনি আরো ব'লে বসেন যে ভাবমূলক কবিতামাত্রই কবিতা হিসাবে অচল, এবং সেই-সব রচনার মধ্যে যদি কবির প্রতিভার অবসান এবং অস্তগমনের চিহ্ন দেখাবার অক্লান্ত চেষ্টা চলতে থাকে তাহলে প্রতিবাদ করব। রবীন্দ্রনাথের যে-গানগুলি লেখক-মহাশয়ের অত ক্রোধের কারণ হয়েছে সেগুলি সবই চিন্তাশীল, এমনকি অধ্যাত্ম-দর্শনময় রচনা; কিন্তু এ-ধরনের লেখা তো কবির শৈশবসংগীত, সন্ধ্যাসংগীত থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক কবিতা-পুস্তকেই কিছু-না-কিছু আছে, এবং বিশেষ কাব্যরূপে দেখা দিয়েছে। ঐ যুক্তি অবলম্বন

ক'রে কবির আধুনিকতর রচনার উপর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে ওঠবার কি কোনো প্রকৃত হেতু আছে? এই অকারণ বিরোধই কিন্তু সাহিত্যে নানা ভাব ও সৃষ্টি-রূপের প্রয়োজন প্রমাণ করে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যজগতে নব-নব পন্থা উদ্ঘাটন ক'রে এসেছেন এবং যখনই তিনি কোনো বিশেষ শিল্পতত্ত্বকে আঘাত ক'রে নতুন শিল্পের সাধনায় নেমেছেন তখনই নির্দিষ্ট তাত্ত্বিকের দল সাধ্যমতো তাঁর কাজে বাধা দিতে ত্রুটি করেননি। রবীন্দ্রনাথের কোনো নতুন রচনা প'ড়ে এককালে যাঁরা বিষম উত্তেজিত হয়েছিলেন, সেই লেখাটি যখন কতক সয়ে গেল এবং তার বাণী যখন মনে কিছু-কিছু সঞ্চারিত হ'ল, তখন সেই-সব লোকই ফের তাঁর সেই লেখারই দোহাই দিয়ে কবির অন্য নতুন রচনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। "কড়ি ও কোমল" "সোনার তরী" প্রভৃতি কবির প্রায় কবিতা-পুস্তককেই এই নিন্দা অপমান ও ঈর্ষার ঝড় কাটিয়ে আসতে হয়েছে, এখন দেখছি "গীতাঞ্জলি" বা অন্যান্য আরো শেষের দিকের লেখার বিরুদ্ধে লোকের নিদারুণ মনঃক্ষোভ ঘূর্ণিবায়ুর মতো আবর্তিত হয়ে উঠেছে। যাঁরা একসময় কবির আগেকার কবিতাকে যথাশক্তি আক্রমণ করতে ছাড়েননি, এখন দেখছি তাঁরাই সেই-সব পুরাতন লেখার দিকে তাকিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে উঠেছেন এবং অশ্রুবাষ্পাকুল কণ্ঠে ব'লে বেড়াচ্ছেন— "হায়, আমাদের সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রাণোন্মাদিনী বীণার ঝংকারে বাঙালীর কোমল প্রাণে কত-না মধুর ভাবের মদিরতা এনেছিল, কত-না ব্যথা জেগেছিল, তিনি কিনা শেষে এই "গীতাঞ্জলি"র মরুপথে একলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বলো ভাই, এ-ও কি সওয়া যায়, এ-ও কি চোখে দেখে চুপ ক'রে থাকা চলে, এ-ও কি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. লেখক বলেছেন রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখা 'নতুনত্বে আর প্রাণ চমকিত করে না', 'পুরাতন বন্ধুর মতো আনন্দ দান করে।' নিন্দাচ্ছলেই অবশ্য কথাগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু শুধু এইটুকু শুনলে বোঝা শক্ত কবির বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে, না তাঁর প্রশংসা করা হচ্ছে। কেন তা বলছি।

'নতুনত্বে প্রাণ চমকিত' করার মানে কী? লেখক কি মনে করেন যে জাদুকর যেমন রুমালের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা মস্ত পাখি উড়িয়ে দিয়ে সকলকে চমকিত ক'রে দেয়, সেইরকম ভাষা ও ছন্দের মধ্য থেকে অকস্মাৎ কোনো-একটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাব প্রকাশ ক'রে পাঠকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়াই কবিতার চরম উদ্দেশ্য? মোটের উপর ধরতে গেলে জন্ম, মৃত্যু, ভালোবাসা, এই রকম দু-চারটে বড়ো-বড়ো ব্যাপার অবলম্বন ক'রেই

আজ পর্যন্ত জগতের যা-কিছু সব-চেয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিত হয়েছে; এবং প্রকৃতপক্ষে, এই-সকল চিরন্তন সত্যকে ক্ষণে-ক্ষণে নতুন ক'রে দেখার শক্তিতেই কবির সঙ্গে সাধারণ লোকের প্রভেদ। অভ্যাস এবং নিত্যপরিচয়ের মোহাবরণ কিছুতেই তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না, তিনি সদ্যোজাত শিশুর মতো বিশ্বকে বিস্মিত পুলকে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন, আর তাঁর এই অপূর্ব আনন্দ আমাদের প্রাণকেও উদ্দীপিত ক'রে তোলে। লেখক নিজেই বলছেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা পরিচিত ভাবের ভিতর দিয়ে মনকে আনন্দিত করছে। তা যদি হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই, এর চেয়ে প্রশংসা কবির পক্ষে আর কী হতে পারে।

৪. কবিতায় 'বিশুদ্ধ অনুভূতি' বা 'অনুভূতি-স্মৃতি' কোনটা থাকলে কবিতা সাহিত্য হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে এ নিয়ে লেখক-মহাশয় বহু বাক্যজাল বিস্তার করেছেন। তিনি বলতে চান কবিতায় 'অনুভূতির স্মৃতি' থাকলে সে-কবিতা হেয় হয়ে পড়ে, সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য চলে যায়। তিনি কবিতার মধ্যে সদ্য-ভাবের তপ্ত কায়া না তপ্ত-ভাবের সদ্য ছায়া এমনি কী-একটা কিছু অনুভব করতে চান, এবং যে-কবিতা তাঁর মনের এই সুখসাধ পূর্ণ করতে পারে তাকেই তিনি বলেন 'সত্য কবিতা', 'বিশুদ্ধ অনুভূতির কবিতা'। তাঁর বিশ্বাস মনে ভাব আসা মাত্র তৎক্ষণাৎ একটা নোটবুক ও পেন্সিল নিয়ে বসে গেলে তবেই যথার্থ কবিতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে তাজমহল দেখার অনেক পরে এলাহাবাদে এসে সে-বিষয়ে কবিতা লেখেন, তাঁর মনের অনির্বচনীয় ভাবরাশি যে বিশ্বসাহিত্যের এই এক্টি সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতায় ধীরে-ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এর জন্যে সমালোচক-মহাশয়ের কাছে ঐ কবিতায় 'বিশুদ্ধ অনুভূতি'র নিদারুণ অভাব ঘটেছে। লেখক হয়তো মনে করেন তাজমহল দেখামাত্র কবির উচিত ছিল পাথরের উপর বসে পড়া এবং পকেট থেকে সযত্নরক্ষিত খাতাটি বার ক'রে লেখা শুরু করা·

ওরে তাজ,
তোরে আজ
কী যে ভালবাসি! ··ইত্যাদি

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই একসময়ে খাঁটি কথা বলেছেন—

"···কোন সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন যে, লেখা ভাল হইবে এমন কোনো কথা নাই। তখন গদ্গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না, তেমনি একেবারে

অব্যবধান ঘটলেও কাব্য-রচনার পক্ষে তা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিতার রং ফোটে ভাল। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে— কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয়, সকল প্রকার চারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটা নির্লিপ্ততা থাকা চাই— মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে, কর্তৃত্ব তাহারি হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয় প্রতিমূর্তি হয় না।"

অনেকদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ এ-কথা লিখেছিলেন, সুতরাং 'শেষ বয়সের বিকৃত বিচার' বলা চলবে না। লেখক-মহাশয় তো সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজ-লেখকের নাম বিশেষ মানেন; তিনি কবিতা সম্বন্ধে Wordsworth-এর সর্ববাদিসম্মত সেই বাক্যগুলি কি ভুলে গিয়েছেন যে 'Emotion remembered in tranquillity" এক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতার উপাদান!

৫. রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি ও সাধকের বিচ্ছেদ ঘটেছে এ-কথা নতুন বটে। আমরা তো জানতাম দেশে বিদেশে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, 'সাধক ও কবির হরগৌরীর মিলনেই' তাঁর প্রতিভার প্রধান বিশেষত্ব। তিনি ভগবানকে পাওয়ার জন্যে সংসার ছেড়ে মরীচিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েননি, মানুষের প্রতিদিনকার জীবনেব সুখে দুঃখে, তার বিচিত্র অনুভূতি অভিজ্ঞতার মধ্যেই তিনি সৃষ্টিকর্তার পরিচয় পেয়েছেন, সংসারের মধ্যে থেকেই তিনি সংসারের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। নিরাসক্ত নির্বিকার সাধক বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনো দিনই হতে পারলেন না। "গীতাঞ্জলি"র সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল 'নিছক নীতিকথা এবং দার্শনিক তত্ত্ব' বিবৃত করে আসছেন, কবির "ফাল্গুনী", "গল্প সপ্তক", "পলাতকা" এবং তাঁর এখনকার "কথিকা" ও 'শিশু' কবিতা প'ড়ে লেখকের কি শেষে এই কথাই মনে হ'ল! তিনি বলছেন "খেয়া", "নৈবেদ্য", ও "গীতাঞ্জলি"র 'অন্বেষণ, আবেদন ও নিবেদনের সুরের' পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'অন্তরের সাধক-আমিটি কবিকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিশ্ববৈচিত্র্যের বাহিরে ছুটিল।' সাধক-আমি ও বিশ্ববৈচিত্র্যের মিলনেই রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা সমৃদ্ধ এ-কথা জানি অনেকেই স্বীকার করবেন।

৬. সমালোচকের শেষ মন্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের যা বলার ছিল তা ফুরিয়ে গেছে, তাঁর আধুনিক রচনা প'ড়ে ওঁর (সমালোচক-মহাশয়ের) হৃদয় আর 'অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠে না, অনুভূতির পশ্চাতেই অশ্রু প্রবল হয় না!'

কথাটা যে দুঃখের সে-বিষয়ে সন্দেহ কী। কিন্তু আশা করি তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ সাহিত্য-সৃষ্টি সাঙ্গ করবেন না, এবং কবির লেখা প'ড়ে যাঁরা যথার্থ আনন্দ পেয়ে থাকেন তাঁদেরও প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁরা যেন আকস্মিক শোকের আঘাতে আত্মহারা না হয়ে পড়েন। অকপটচিত্তে স্বীকার করছি যে, রবীন্দ্রনাথের নতুন রচনা পাবার জন্য আমরা অনেকে উন্মুখ হয়ে থাকি, যেদিন ওঁর কোনো নতুন লেখা বেরোয় সে-দিনটি আমাদের কাছে স্মরণীয়, এ-বিষয়ে আমাদেব আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দের অবধি নেই। কবির প্রথম দিকের এবং শেষের দিকের বহু লেখা আমাদের কাছে সমান উপভোগ্য। 'এক রাত্রি' আমার যেমন ভালো লাগে 'শেষেব রাত্রি'ও তেমনি, "কথা ও কাহিনী"ব গল্প আমাকে যেমন আনন্দ দেয় "পলাতকা"র গল্প-কবিতাও তার চেয়ে কিছু কম দেয় না , এখন তিনি যে নতুন 'শিশু' কবিতা লিখছেন তা আমাকে ততটাই বিচলিত কবে যেমন করেছিল তাঁব আগেকার "শিশু" পুস্তকের কবিতাগুলি। 'কথিকা' যখন পড়ি তখন পাশ্চাত্ত্য দেশের বহুবিখ্যাত prose poem-জাতীয় বচনা নিষ্প্রভ মনে হয়।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার বলেছিলেন, 'মানুষের বোঝবার শক্তির সীমা আছে কিন্তু তাব না বোঝবাব শক্তি অসীম।' এই সাবগর্ভ সত্যটি স্মরণ ক'রে এই নিবন্ধ শেষ কবি।

শেষ লেখা

"শেষ লেখা"য় রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ তেরোটি কবিতা ও দুটি গান বের হয়েছে। এগুলির স্থান তাঁর শিখরসূর্যে। বইখানি একটু পড়লেই তা বোঝা যায়। আজকের অন্ধকার আমাদের চক্ষে যতই ঘন হয়ে থাকুক, কবিতাপাঠের সময় চিরমধ্যাহ্ন-লোকে প্রবেশ করি। প্রাণধরণী সেখানে প্রকাশিত।

কোনো সাহিত্যে এই স্তরের কবিতা নেই। এর সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর মনে করি না।

মূল একটি কথার উল্লেখ করব। প্রাণের বিশেষ দৃষ্টি কবিতাগুলিতে ছড়ানো রয়েছে; নতুন ভাবে বোঝাবার ইঙ্গিতও আছে। প্রাণ পরম, প্রাণ অক্ষয়, প্রাণ আনন্দ, দুঃখে এবং সুখাগ্নিতে অনাচ্ছন্ন। তার স্পর্শে পৃথিবী সত্য, স্বপ্ন হতে নতুন জন্মগ্রহণ। "শেষ লেখা"র কাব্য জীবন পার হ'ল, মৃত্যু পার হ'ল। যেখান থেকে আরম্ভ হ'ল সেইখানে প্রাণ নতুন রহস্যময়। তার স্বরূপ কী?

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

তেরোই মে শেষ রাত্রে উঠে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা লিখেছিলেন। এ কোন জাগা? যিনি সমস্ত চৈতন্য নিয়ে চলে এসেছেন, চরম কোন বেদনার অভাবে সত্তার শেষ পরিচয় তাঁর কাছে অনুদ্ঘাটিত ছিল? মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ হ'ল দেহের অন্তিম দুঃখে।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়।

বলেছেন 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন।' কিন্তু তপস্যা পূর্ণ হয়ে এলে দুঃখজয়ী প্রাণ কোন পাওয়াকে ব্যক্ত করে।

কষ্টের বিকৃত ভান*, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

দুঃখে জয়ী হতে হবে। জীবনের মুখোশ খ'সে যায়। কিন্তু জয় শেষ হলেও শুধুমাত্র আরম্ভ।

'এই হার-জিৎ খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক।' কুহকের বাহিবে যা তার কথা আলাদা ক'রে বলা হ'ল না। কিন্তু কুহকেব বাহিরে গিয়ে যে-দৃষ্টি তার পরিচয় রইল। সেখানে ছবি, অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত দ্রষ্টার প্রাণদৃষ্টি। তিনি দেখছেন :

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধাবে।

মৃত্যু এবং জীবনেব নানা শিল্পে প্রাণেব যবনিকা কারুখচিত। দুঃখেব বিচিত্র ভঙ্গি সেখানে মিশেছে, সেই একই আশ্চর্য আঙ্গিকে। 'অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার,' তাকে প্রাণ চেয়ে দেখছে। ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি বহিরঙ্গনে ছলনার অঙ্গ।

ছলনার কথা শেষ কবিতায় বলা হয়েছে। 'সৃষ্টি' অর্থে জীবন-সংক্রান্ত আমাদের জানার যা-কিছু। সেইখানে ছলনা। তাবই সঙ্গে আর-এক জগৎ, যা হওয়ার, যেখানে যেতে হয় অন্তরেব পথ দিয়ে। দুয়েব মধ্যে আমাদেব বাস পৃথিবীতে। সমস্ত নিয়ে প্রাণ। সৃষ্টির জগ· সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনাব জালে আকীর্ণ, সেখানে জন্মীমাত্রকেই ছলনায় চিহ্নিত হতে হবে। সরল জীবনেও ছলনার ছায়া এসে পড়ে ; মহত্ত্বকেও দাগী করে, তারও গোপন রাত্রি নেই সম্পূর্ণ পালাবার। সৃষ্টির জগতে তাই অপরিসীম দুঃখ। কিন্তু যে এই দুঃখের কুহক সহ্য করতে পারল তার চলবার পথের কথাও বলা হয়েছে :

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,

* এখন জানা গিয়েছে কথাটি 'ভাল' নয়। (এই কবিতার নাম কবি দেননি।)

সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।

বাহিরের পথ যত কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু। এই পথে বহন ক'রে নেওয়া যায় শেষ পুরস্কার।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে কবি তাঁর জীবনের শেষ রচিত তিনটি পদ বললেন।

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

দুই

প্রাণের রহস্য কথায় ব্যক্ত হয় না। অক্ষয় অধিকারের মধ্যে দিয়ে যার পরিচয় জীবনের ভাষায় তা প্রকাশ করলে প্রশ্নের উত্তরকে প্রশ্নের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

এই একটি সম্পূর্ণ কবিতা। পৃথিবীর সাহিত্যে এর তুলনা সম্বন্ধে কিছু বলা বৃথা। ২৭ জুলাই প্রভাতে রচনাকালে কবি বলেন: 'সকালবেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে— কয়েক লাইন— লিখে রাখো— নয়তো হারিয়ে ফেলব।'

তিন

এই কবিতার বইয়ে একটি কবিতা আছে যা মৃত্যুশোকের প্রতীক। চৌকি শূন্য।·

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।···

সে-দিক দিয়ে কোনোই সান্ত্বনা নেই।

শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

সান্ত্বনা আছে প্রাণে। তাছাড়া নেই। তারই বলে জীবনের মধ্য দিয়েই 'জীবনের স্বর্গীয় অমৃত'কে লাভ করার কথা কবিতায় আছে। সেখানে মৃত্যুর হরণ নেই। দ্বিতীয় কবিতায় আনন্দের প্রত্যুচ্চারণ,

এ কথা নিশ্চিত মনে জানি

ঘুরে-ঘুরে এসেছে গানের সমের মতো। মৃত্যুশোক অতিক্রম করবার সাধনা "শেষ লেখা"র কবিতায় প্রকাশিত।

৪

স্মৃতি-রচনা

৩৯।১৫

মহাত্মা গান্ধী

বিশ্ববিধানের মধ্যে একটি ভারসামঞ্জস্যের প্রক্রিয়া আছে। যদি তাপের অসাম্য ঘটে তাহলে ঝড়ের দ্বারা সাম্যসাধনের চেষ্টা চলে বায়ুস্তরে; যেখানে মারীর প্রকোপ এমনকি যুদ্ধ-ঘটিত বহু হত্যা সেখানে প্রকৃতির জীবরাজ্যে প্রাণ-প্রজননের বৃদ্ধি দেখা যায়; এক বৎসরের শস্যহীন ক্ষেত ফিরিয়ে আনে অন্য বৎসরের অধিক ফসলকে। কিন্তু এইরকম অনির্দিষ্ট ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হিসাব-মেলানোর চেষ্টা আমাদের মানবিক আদর্শ আয়োজনের অযোগ্য ব'লেই মনে হয়। যতই আমরা প্রকৃতির অধীন হই না কেন, আমাদের সমস্ত আত্মিক শক্তির স্ফুরণ হয় সেই পরাধীন দশা ঘোচাবার প্রয়াসে, আকস্মিকতার স্থানে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ক'রে আমরা এগিয়ে চলি। একদিকে বন্যা অন্যদিকে দারুণ অনাবৃষ্টি, কোথাও পর্যাপ্ত খাদ্য কোথাও দুর্ভিক্ষ, এই প্রাকৃতিক অনির্ণয়ের উপর নির্ভর ক'রে থাকলে আমাদের নির্ঘাত মৃত্যু। তাই শ্রেষ্ঠ মানুষ যাঁরা তাঁদের কাছ থেকে আমরা জীবলোকের অন্ধ অনুবর্তন করবার দীক্ষা পাইনি; তাঁরা আধিভৌতিক জগতের তথ্য নির্ধারণ ক'রে নিয়ে তারই উপর আমাদের মনের সংকল্পকে জয়ী করবার পথ দেখিয়েছেন। যারা প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে তারই অনুকরণে এক অন্ধশক্তির দ্বারা অন্য অন্ধশক্তিকে নিবস্ত ক'রে বাঁচতে চায়, পৃথিবীতে তাদের দুঃখের অবধি নেই।

পাপকে পাপের দ্বারা, যুদ্ধকে ভীষণতর যুদ্ধের দ্বারা প্রতিহত করতে গিয়ে ক্রমাগত তারা চক্রপথে আবর্তিত হয়; সেখানে মানবিক ধর্মের সমূহ বিনষ্টি, নিষ্কৃতির কোনো উপায় থাকে না। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার উগ্র সংগ্রামে যারই জিৎ হোক তাতে মনুষ্যত্বেরই পরাজয়, অন্যায়ের উপর অন্যায় যোগ ক'রে ন্যায়ের দিক থেকে হ্রাসই ঘটে, তাতে সমৃদ্ধি নেই। মহাত্মা গান্ধী সেই উজ্জ্বল পক্ষের মহাপুরুষ যিনি শ্রেষ্ঠ মানবিক শক্তিতে বিশ্বাসী। প্রবৃত্তির দাসত্ব ক'রে আত্মকর্তৃত্বের বিসর্জন দেওয়া তাঁর ধর্মবিরুদ্ধ। প্রকৃতির অভ্যস্ত ক্ষেত্রেই কল্যাণ নিয়ন্ত্রণের নবশক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি আমাদের যথার্থ মানব-স্বভাবকেই মুক্তি দিচ্ছেন।

হঠাৎ দেখা যায় আত্মশক্তির দুরূহতম সাধনায় প্রবৃত্ত হলে প্রকৃতিও

আমাদের সহায়ক হয়, কেননা মানবধর্ম প্রাকৃতিক ধর্মের বিরোধী নয়, তারই নিয়ামক। জড়ী পৃথিবীতেও যে একটি অন্তর্লীন ভারসামঞ্জস্যের প্রবণতা আছে, জীবজগতে পরিস্ফুটতর রূপে যে-সাম্যের চেষ্টা সর্বদাই ব্যক্ত হচ্ছে তারই চরম পরিণতি দেখা যায় মানুষের ন্যায়ানুবর্তিতায়, শ্রেষ্ঠ নিয়মের প্রয়োগ-সাধনে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে বারংবার আমরা এই সত্য অনুভব করেছি। যা সম্পূর্ণ অকল্পিত অসম্ভব ব'লে মনে হ'ত তা চোখের সামনে ঘটল। সমস্ত ঘটনাপরম্পরা একটি অবিচল মনঃশক্তির বলে দুর্যোগের মধ্যেই মঙ্গলকারী হয়ে উঠল। জনচিত্তে প্রবৃত্তির আন্দোলন শান্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সংসারে একটি পরমত্ব দেখা দিল, যেমন আঁধির ঝড় প্রশমিত হয়ে নীল আকাশ প্রকাশিত হয়। কলকাতায় আমরা উপর্যুপরি দুইবার তাঁর প্রবর্তিত নীতির আশ্চর্য পরিণাম লক্ষ্য করলাম ; বস্তুত শুভফল এত দ্রুত এবং স্পষ্ট দেখা দেবে তা আশা করা যায় না। অনেকে বলেন এই নতুন অবস্থা স্থায়ী হবে না, প্রকৃতিরই জয় হবে, মনুষ্যত্বের নয়। তার উত্তরে এই বলা চলে, একবারও যে হতে পেরেছে এই আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট। যা একবার ঘটে পুনর্বারও ঘটবে, এবং শুভ ঘটনার পথ সহজ ক'রে দেবে। সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি এবং বিরোধের অবস্থা যে কোনোমতেই বদলাবে তা কেউ ভাবতে পারিনি।

একটা কথা মনে রাখা চাই যে মানবিক মন্ত্র দিয়ে মহাত্মা গান্ধী যে-ভাবে প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে আমাদের সহযোগিতার শক্তি জাগালেন তাতে কোনো অলৌকিকত্বের প্রমাণ হয় না, চিরন্তন লৌকিক সত্যেরই প্রমাণ হয়। সেই শক্তি উদ্দীপিত করলেন তিনি, কিন্তু সেই শক্তি আমাদেরই। বিশ্বজোড়া হন্তার যুগেই আমরা চিনতে পারলাম আমাদের অন্তর্নিহিত স্বরূপকে, আমাদের নরনারায়ণী শক্তিকে। যতবার যে-ভাবেই পরাস্ত হই না কেন, কিছুতে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হতে পারব না, কারণ গান্ধীজির চরম আহ্বানে বেরিয়ে এসে আমরা এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের যথার্থ স্থান দেখতে পেয়েছি। বর্বর সংগ্রামরত রুধিরাক্ত সংসারে যত-বড়ো নামেই ঘাতকের বৃত্তিকে অভিহিত করা হোক না কেন, আমরা তাতে ভুলব না এ-কথা নিঃসন্দেহ। কেননা, মানব-স্বভাবের যে-দিকটা জড়ধর্মী, জীবধর্মী, প্রকৃতির বশে অন্ধ নিয়মের অধীন, তাকে অতিক্রম ক'রে স্বাধীনতার বৃহৎ ক্ষেত্রে গান্ধীজি আমাদের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। তিনি যোগী হয়েও সংসার-কর্মী, সর্বত্যাগী হয়েও মানবের কল্যাণে

আসক্ত, মানুষের দোষ-পাপ সত্ত্বেও মানুষ সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল। মৃত্যুঞ্জয় এই পুরুষ অগণ্য মৃত্যুর মধ্যেও আমাদের প্রাণনের শক্তি দিচ্ছেন; উচ্চ-নীচ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি মানবিক দীক্ষা নিয়ে এসেছেন প্রত্যেকের কাছে। কোথায় নোয়াখালি, কোথায় বেহার, কোথায় পঞ্জাব, তিনি একটি মানুষ চলেছেন মানুষের ধর্ম প্রচার করতে। যুগান্ধকারের পটভূমিতে তাঁর সহজ মানবরূপ আরও সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হ'ল। নম্রতার প্রতীক তিনি, সকলেরই কাছে উপস্থিত, আমাদেরই একজন হয়ে সর্বদা বেদনা গ্রহণ করছেন অথচ অবিচল তাঁর নিষ্ঠা, অনন্ত তাঁর বিশ্বমানবিক সাধনা। মহাত্মাজির এই সার্ব-জনীন রূপ ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতির চিত্তে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে— তাঁকে জানা দ্বারা আমরা দেশে-দেশে নিজেদেরই অসীম সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করব। সহযোগী বিশ্বে নতুন সভ্যতা গড়ে তোলবাব প্রেরণা নিযে এলেন গান্ধীজি।

দুই

সেদিন একজন প্রসিদ্ধ মার্কিন অধ্যাপক আমাকে প্রশ্ন করছিলেন, মহাত্মা গান্ধী সর্বদাই একান্ত কর্মরত অথচ উনি নিয়ত নতুন উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয় দিয়ে জগৎকে আশ্চর্য ক'রে দেন— ওঁর অবসর কোথায়? প্রত্যূষ হতে সহস্র-বিধ কঠিন দায়িত্বেব পবম্পরা চলেছে, ত্রিবাঙ্কুব হতে উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত নানা দিগ্‌দেশেব সমস্যা নিয়ে লোক উপস্থিত, বচনা আলোচনা সভা-সমিতির বিরাম নেই, দর্শনার্থীর ভিড এবং দেশজোড়া সহকর্মীব দাবি, এরই মধ্যে চলছে চরকা, বাংলাশিক্ষার চর্চা, সাম্প্রদায়িক দাবানল থামাবাব জরুরি বিধান। শৃঙ্খলিত কর্মবিধি যদি-বা অনুসরণ কবা যায়, নতুন চিন্তাব অবকাশ চাই তো! অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন, দুরূহ প্রাত্যহিক-কৃত্য-সাধনেব কোন ফাঁকে হঠাৎ গান্ধীজির মনে বেলেঘাটার কথা উদয় হ'ল, বিশেষরকম সংসর্গ এবং অভূতপূর্ব পরীক্ষার ঐ ক্ষেত্র তাঁব স্থিব সংকল্পে কখন দেখা দিয়েছিল? উপযোগী তথ্য নির্ধারণ করতে হলে মনের বিবলতা চাই, আদর্শিক চিন্তার দুরূহ প্রয়োগ-ক্ষেত্র এবং সময়-বিচারের জন্যেও 'ধারণত মানুষকে অনন্য ব্রত নিয়ে বসতে হয়। অথচ মহাত্মা গান্ধী কোনো দায়িত্বকেই বাদ দেন না, কর্মের চাকা ঘুরছে ঘড়ির কাঁটার মতো। আমাদের দেশে যাকে অভ্যাসযোগ বলে তারই উল্লেখ করলাম। যিনি স্বাধীন, নিয়ন্ত্রিত কর্মে তাঁর বন্ধন নেই, একদিকে মন নিযুক্ত অন্যদিকে নিরাসক্ত; দীর্ঘকাল আত্মিক চরম নিয়োগের ফলেই

এই নিরন্তর কর্ম অথচ অনন্ত অবসরের যোগ ঘটে। সেইখানেই জাগে নবতন শক্তির উদ্দীপনা। কিন্তু রহস্য তবু থেকেই যায়। প্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশ যেমন আশ্চর্য, স্থানকালপাত্রের নিকষে তার অনিবার্য নির্দিষ্ট বিধানের শক্তিও তেমনি বিস্ময়কর। গান্ধীজির জীবনে এই দুই আশ্চর্যের সমবায় দৈবের মতোই মনে হয়। কোন সংকটের মুহূর্তে তিনি উপবাস-যজ্ঞ শুরু করবেন তা কারো জানা নেই। কিন্তু পরবর্তী নির্ণয় মীমাংসার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, ঠিক ঐ সময়েই দারুণ দুঃখ মেনে না নিলে দুঃখের ক্রিয়া জনচিত্তে পৌঁছত না।

তার একটি প্রমাণ সেদিন পেয়েছিলাম। অনুতপ্ত একটি যুবক এসে বলছিল, প্রতিহিংসার উত্তেজনায় নিজে লিপ্ত আছে এমন সময়েই প্রথম সে উপবাসের কথা শুনল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, অন্যায় করছি আমরা অথচ শাস্তি নিচ্ছেন তিনি, এ কীরকম ব্যাপার। কেমন অস্বাভাবিক লাগল দাঙ্গার উগ্রতাকে। শাস্তিবিধানের পর যখন কলকাতায় স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছে সেই সময়ে হন্যতার উদ্রেক বহু লোকের কাছেই শুধু আতঙ্ক বা ক্রোধের বিষয় নয়, অবান্তর বলেই মনে হয়েছিল। যে নিজে আক্রমণকারী তারও পক্ষে জনসাধারণের এই অনুদ্ধত ক্লান্ত মনোভাব বিঘ্নজনক, চতুর্দিকে অভ্যস্ত বিদ্বেষের ম্লানতা ঘটলে সংঘবদ্ধ, এমনকি একাকী ক্রোধের চাপ কমে যায়। অথচ কল্যাণ সহযোগিতার পথও খুঁজে পাওয়া কঠিন। ঠিক এই অবসরে গান্ধীজি আরও একটি কুণ্ঠার প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়ালেন। যিনি হত্যাও করেননি আঘাতও করেননি, সেই নির্মলচিত্ত পিতৃতুল্য পুরুষ ভয়ংকর দণ্ড মেনে নিচ্ছেন তাতে আশ্চর্য লাগে বই-কি। সকলের দুঃখদাহ কোনো-একজনকে পুরোপুরি মানতে হয় এটাও আমাদের বুদ্ধি না বলে পারে না। ক্রমে একটা সার্বজনীন দায়িত্ববোধ জেগে ওঠে। 'কার নিন্দা করো তুমি ? এ তোমার এ আমার পাপ।' —রবীন্দ্রনাথের এই বাণী য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের কালে আমাদেরও আত্মতৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। সামাজিক বোধের যদি বিশ্বগত ভিত্তি না থাকত তাহলে এমন যুক্তি কাজে লাগত না; কিন্তু মানুষ যা-ই বলুক, অন্তরে তার স্বপক্ষ পর-পক্ষের চেয়েও বড়ো স্বীকৃতি জড়িয়ে আছে। সকলেরই সঙ্গে আছি মানবিক অস্তিত্বের সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে। গান্ধীজি দোষারোপের চেয়েও বড়ো ক'রে তাই অন্যের দুঃখ নিজেই গ্রহণ করলেন। হঠাৎ জনচিত্তের উপর থেকে ভার কমে গেল। যুবকটি বলছিল তার মনে ঠিক যে অন্যায়বোধ জাগল তা নয় কিন্তু মনে হ'ল এবারে হয়তো একটা কোনো উপায় বেরোবে। বলা বাহুল্য, অনশন প্রায়োপবেশনের সাধারণ রাষ্ট্রিক

প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করছি না— এরকম ব্যতিক্রমের সত্য মহাপুরুষেরই সাধ্য এবং দ্বিতীয় বার দ্বিতীয় জনের অনুকরণীয় নয়। তৎসত্ত্বেও গান্ধীজির সর্বাস্তিবাদ এবং অহিংস্র সংগ্রামবিধির নৈপুণ্য সম্বন্ধে পৃথিবী জুড়ে মানুষ অবাক না হয়ে পারল না।

মার্কিন অধ্যাপকের প্রশ্নে ফিরে যাই। সময় পান কী ক'রে? আসল কথা সময়ের একটি অন্তরপ্রবাহ আছে— সংকল্পের সিদ্ধতা মুহূর্তে-মুহূর্তে তৈরি হতে থাকে, বাহিরে দেখা দেয় বিশেষ ঘটনার যোগে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে, কবির দিব্যবাণীতে, ধ্যানীর কর্মোদ্দীপনায় এই একই সত্যের পরিচয় পাই। যথাযথের নিত্যনিয়ন্ত্রিত অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলে সত্যের জগতেই 'আরও সত্য' দেখা দেয়। হঠাৎ মনে হতে পারে এই আরও সত্যটি পৃথক ভাবে সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার যোগ পূর্বাপরেব সঙ্গে অচ্ছেদ্য বিরাজমান। গান্ধীজি অগণিত মানুষের সূত্রে বাঁধা, সকলের সঙ্গেই তাঁর সত্য সম্বন্ধ, তাই দুই আপাতবিরোধী পক্ষের মূলগত ঐক্য-পথ তিনি বারংবার মুক্ত ক'রে দেন। স্বতন্ত্র নির্জন সময়ের জন্যে তাঁর অপেক্ষা নেই, যা-কিছু কর্ম করেন তার মধ্যেই সেই শ্রেষ্ঠ একতার ক্রিয়া চলেছে। যখন তাঁর কোনো কাজকে আমরা অলৌকিক মনে করি, তিনি নিজে জানেন তা সব-চেয়ে বেশি লোকাশ্রিত, কেননা মনুষ্যলোকে তিনি শ্রদ্ধাশীল। মানুষকে তিনি বিশ্বাস করেন ব'লেই তাঁর কর্ম সমাজের দৃঢ়তম সত্যকে অধিকার ক'রে দেখা দেয়। যথাযথ কর্মের যোগে তাঁর মনে অখণ্ড আকাশ বিস্তৃত হতে থাকে। চতুর্দিকের কর্ম ও বিবিধ ঘটনা সেই আকাশে বিধৃত কিন্তু তাকে আবৃত করতে পারে না।

বারংবার তাই আশ্চর্য হয়ে দেখেছি গান্ধীজির সময় আছে। যে-কোনো মুহূর্তে অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালে অগণ্য কর্মের মধ্যেও শান্তির সাড়া পাওয়া যায়। চোখে চেয়েই তিনি দেখতে পান কার মুখে বেদনা, শুনতে পান তার কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন অনুভূতি। বুঝতে পারা যায় চতুর্দিকের সমস্ত কর্মজগৎকে প্লাবিত ক'রে একটিমাত্র মানবিক সম্বন্ধও তার চরমতা নিয়ে তাঁর কাছে দেখা দিল। মৃত্যুর শোকে কাতর স্বজন তাঁর পাশে দু-দণ্ডের জন্যে গিয়ে অমরাবতীর সন্ধান পেয়েছে, তার কারণ তাঁরই সঙ্গে মৃত্যুহীন আত্মীয়সম্বন্ধ হঠাৎ উপলব্ধি করা দ্বারাই শোকের অতীতকে আমরা স্পর্শ করি। খণ্ডকালের যত বেদনা সবই তাঁর চরিত্রের যোগে অখণ্ড সময়ে উত্তীর্ণ হয়। তাঁর কাছে এলে কত শান্তি। চক্ষে করুণা, ব্যবহারে অসীম হৃদয়তা নিয়ে তিনি বিরাজমান।

চতুর্দিকে জনসমুদ্র কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়ালেই মনে হয়, পার হয়েছি, কেন্দ্র-স্থলে আছি।

একদিকে দুর্জয় মানস অন্যদিকে মমত্ব, এই দুয়ের যোগে মানুষকে তিনি এমন ক'রে জাগিয়ে তোলেন। হৃদয়মনের সব নিয়ে গান্ধীজি ডাক দেন, তাই জন-শক্তি সাড়া দেয়। ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। পৃথক দেশ, বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধনী নির্ধন, পল্লী নাগরিক একই সঙ্গে তাঁর চৈতন্যের শক্তিতে উদ্বোধিত হয়েছে— বিরুদ্ধতা ক'রেও তাঁকে স্বীকার করেছে। বই-পড়া কৌশলে, বুদ্ধির শাণিত আয়োজনে অথবা বিক্রমে বক্তৃতায় আমরা দু-চার জনের কাছে পৌঁছতে পারি কিন্তু বিপুল জন-শক্তির মর্মে প্রবেশ করবার শক্তি আমাদের কোথায়? এ যেন প্রখর বিজলি-প্রদীপ দিয়ে জোয়ার জাগাবার চেষ্টা, ওদিকে চাঁদ উঠলেই সমস্ত সমুদ্র জেগে ওঠে। পনেরোই আগস্ট তারিখে সেই ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যে-প্লাবন জাগল তাতে মানুষে-মানুষে ভেদ দ্রুত মিলিয়ে গেল, পথে-পথে হৃদ্যতার জোয়ার উপচিয়ে উঠে দু-ঘণ্টা পূর্ববর্তীর কলকাতাকে বদলে দিল। যারা অ্যাসিড ছুঁড়ত তারা গাড়ি থামিয়ে ছিটালো গোলাপজল, মন্দির-মসজিদের দরজা গেল খুলে। বোঝা গেল, জন-শক্তির মূলে কে এসে স্পর্শ করেছেন। তিনিই মানবসূর্য। তাঁর জাগরণী-মন্ত্রে হ'ল প্রভাত, কিন্তু পুনর্বার জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে নকল রাত্রির ঘুম সৃষ্টি করতে চায় দুর্বল মানুষ। যদি ভোরের আলো কেবল ঘটনামাত্র হয়ে দেখা দেয়, তার সঙ্গে-সঙ্গে জাগ্রত কর্মের দিন শুরু না করি, তাহলে সূর্য উঠলেও সংসার অন্ধকার হয়ে থাকে।

দেখছি একটি মানুষকে। একজনের যা করবার তার চেয়ে বেশি তিনি করেছেন। গান্ধীজির পক্ষে সকলের হয়ে বৃহৎ কর্মের প্রবর্তনা সম্ভব হ'ল, কেননা তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ ঘটেছে, ভিতরের দিকে তাঁর বাধা নেই। নতুন মনোবিজ্ঞান অনুসারে প্রতিভা হচ্ছে তাই যা হওয়া উচিত, যা স্বাভাবিক, যার মধ্যে সহজ মানবিক শক্তির বিকাশ ঘটেছে। এ-কথার-মধ্যে সত্য আছে। যেমন স্বাস্থ্যই সহজ, তেমনি অসাধারণ মানুষই প্রকৃত অর্থে সাধারণ— তার মধ্যে প্রকৃতির পূর্ণতা। খণ্ডিত বাধাগ্রস্ত আমরা সেই পূর্ণতা অন্তরে-বাহিরে প্রকাশিত হতে দিইনি, মহাপুরুষ তাঁর সহজতার আহ্বানে আমাদেরও ভিতরের দিকে অনেকখানি বাধা দূর ক'রে দেন। মহাত্মা গান্ধী মানুষের তাই এত কাছাকাছি; তাঁকে পেয়ে আমরা নিজেকেও বেশি ক'রে পাই। দুর্গমতার

বিলাস তাঁর নয়, তিনি কাছের মানুষ। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের মতো তিনি সব-চেয়ে সামান্যদের কাছে এসে সব-চেয়ে দুরূহ দাবি, সহজ হবার এবং পূর্ণ হবার দাবি উপস্থিত করেছেন। বারংবার দেখা গেল সব-চেয়ে যা চরম তারই আহ্বানে মানুষ দুরূহতম কর্মের শক্তি পায়। যাঁরা অধিকারীভেদ ক'রে কমিয়ে বাঁচিয়ে নানা সংস্করণের দাবি হিসাব ক'রে মানুষকে ডাকেন, তাঁদের স্বাক্ষর মানুষের ইতিহাসে টেঁকে না। তাঁরা দলের সীমানায় বদ্ধ থাকেন। মহাত্মা গান্ধী চরম হিংস্রতার যুগেই চরম অহিংসার মানবিক আহ্বান নিয়ে এসেছেন— লক্ষ কোটি লোক তাঁর সঙ্গে কঠিন পথে বেরিয়ে এল। দুঃখদাহে আনন্দিত বীর্যে দীক্ষিত জনসাধারণ এই ভারতবর্ষকে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যুগান্তরের স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ করল। রাষ্ট্রগঠনের দুঃসাধ্য কর্মে দেশের অগণিত নরনারী উদ্যত হয়েছে, এই উদ্যম থামায় কার সাধ্য। পররাজ্যের প্রতাপী দলকে গান্ধীজির নেতৃত্বে আমরা বিনাযুদ্ধের সমরে পরাস্ত করেছি; এমন ঘটনা মানব-সভ্যতার কোনো অধ্যায়ে ঘটেছে কিনা জানি না।

তিন

সমগ্র মানব-বসুন্ধরায় একটি অন্ধ-যুগ আবর্তিত হচ্ছে সন্দেহ নেই। এমনতরো বিশ্বচারী হন্যতা ইতিহাসের রঙ্গালয়ে দেখা দেয়নি। শহরে পল্লী-প্রান্তে বিষধূম্র ছড়িয়ে গেল জাতির নামে, ধর্মবর্ণ-সম্প্রদায়ের মারণমত্ততায় আজ সংসার শতচ্ছিন্ন। সভ্যতার অনুষ্ঠান চলেছে প্রাণের সর্বস্ব হরণ ক'রে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র নরবধের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। বিরোধের দেয়াল উঠছে অবিভক্ত দেশে, বিজ্ঞানবাহী বর্বরতায় পূর্বপশ্চিমের সমাজ পরিকীর্ণ: প্রাণধারণের ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে এল। এমন দেশ নেই যেখানে সামরিক আয়োজন অথবা প্রাত্যহিক ভ্রাতৃহত্যায় মানুষ বিরত। এমন সময়ে ভৌগোলিক যার নাম ভারতবর্ষ সেই প্রাচীন ভূখণ্ডের মৃত্তিকায় একটি মানুষ দেখা দিলেন যিনি অগণ্য কোটি জনসাধারণেরই একজন হয়ে জীবনকে অনন্ত মূল্য দিতে চান। সেই মূল্য মৃত্যুকে ছাড়িয়ে 'য়, কারণ তা মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু তা বাঁচবারই অমোঘ দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ কেবলমাত্র বাঁচার দ্বারা তাকে পাওয়া যায় না, কেননা মনুষ্যত্বের দামেই তা মহার্ঘ। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সেই প্রাণনের সন্ধান দিলেন যা অস্তিত্বের সার্বজনীন অধিকার মেনে নেয়, প্রত্যেকের সত্তায় যার সত্য। ধনী বা নির্ধন, নির্দোষ অথবা পাপাচারী, যে-স্তরের

মানুষই হোক, শুভাশুভের দ্বন্দ্বে তাকে প্রাণের প্রাথমিক দাবি অর্থাৎ বাঁচা হতে বঞ্চিত করলে কোনো সমস্যার সমাধান নেই। হত্যার মধ্য দিয়ে প্রাণের উত্তর পাওয়া যায় না। ঘাতকের যুক্তিতে অসত্যকে আরো জটিল ক'রে তোলা হয় মাত্র, এই হ'ল তাঁর দর্শন। অবনমিত স্বচ্ছ সেই দৃষ্টিতে নতুন মানবিক দিগন্ত আমাদের কাছে খুলে গেল। প্রাণের পৃথিবীর দিকে আমরা চেয়ে দেখলাম; কত বিরাট তার সম্ভাব্যতা।

আমরা বুঝেছি সহজীবনের আহ্বানেই মানুষ দুরূহতম সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হয়। বাঁচাও, বাঁচতে দাও। এই ডাক উঠছে নারীর কণ্ঠে, অগণিত শিশু আহত আর্তজনের ঘরে-ঘরে। প্রাণনের ডাকে সাড়া দিলে জীবনের একটি মহতী ইচ্ছা সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়; চতুর্দিক হতে সর্বজয়ী সহযোগিতা পাওয়া যায়। রোগী চায় বাঁচতে; তার রোগকে মারো, রোগীকে মেরো না। এই স্বীকৃতির মধ্যেই আছে আরোগ্যের উদ্ভাবনা। বিভিন্ন মতাবলম্বীর মতকে আক্রমণ করো, তাদের প্রাণহরণ করলে মত বদ্‌লায় না, আরও ছড়িয়ে যায়। রাষ্ট্রিক সমাধানেরও মূলতত্ত্ব এই। জাতীয় সংঘাত, উচ্চনীচের নিপীড়ন, ধনিকের ধনলিপ্সা, জমিদারের জমিদারি, সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের বাঁচবার চরম অধিকার মেনে নিলেই সংস্কারের অপবিহার্য পথ উদ্ভাবিত হতে থাকে। বাঁচবার দাম ফিরিয়ে দিলেন মহাত্মা গান্ধী। লোকরক্ষার দাবি নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন নরঘ্নিতার যুগে: এই তাঁর চরম পরিচয়।

মনে করলে ভুল হবে ভারতীয় সভ্যতারই বাণী লোকরক্ষার এই প্রতিজ্ঞা। প্রবণতা আমাদের সেই দিকে, কিন্তু প্রাচীন কালের ভারতবর্ষে তার দীর্ঘ সাক্ষ্য মেলে না। আজকের কথা না-বলাই ভালো। বিসংগত সত্যের অবাক দৃষ্টান্ত এই যে, সংঘাতী য়ুরোপেও অহিংস্রতার চরম মন্ত্রোচ্চারণ হয়েছে, যদিও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল। ভ্রাতৃহত্যা যখন দেশে বিদেশে প্রাত্যহিক সুলভ ব্যবসায়ে পরিণত, সেই যুগে একটি মানুষ পূর্ব ও পশ্চিমের বহুতর সভ্যতার অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত চরম ফল আগামী মানুষের হাতে পৌঁছিয়ে দিলেন।

উপহাস বিরুদ্ধতার মধ্যেও সমগ্র জগতের শ্রদ্ধার দ্বারা প্রমাণ হয় মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এবং প্রাণরক্ষণ-নীতি স্বীকৃত না হলেও উপেক্ষিত হয়নি। সমাজ-সংসারের বহুবিবিধ অঙ্গনে প্রাণমন্ত্রের এমন সর্বাঙ্গীণ সত্য প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই।

* * *

অশুভগ্রাহী সমাজের পাপ সচেতন দুঃখশীলনের দ্বারা শোধিত হয়, মহাত্মা গান্ধীর এই বিশ্বাস। অর্থাৎ সকলের অন্যায়ের জন্যে বহুকে এবং বহুর হয়ে একজনকে কষ্টস্বীকার করতে হবে। হয়তো যে নির্দোষ তারই তপ হবে কঠোর, কিন্তু উপায় নেই। এই বিশ্বাস প্রাচীন, অনেকে বলবেন মধ্যযুগীয়; কিন্তু গান্ধীজির ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রগত জীবনে প্রায়শ্চিত্তের বিধিকে না মানলে তাঁকে বোঝা যাবে না। আমাদের মন পরিতাপের সাধারণ সংজ্ঞা গ্রহণ ক'রেই পিছিয়ে যায়, কিন্তু দাবানলের শান্তিবিধান ব্যক্তিগত দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে প্রশস্ততর হয়, তপস্যার দ্বারা সঞ্চিত তাপ আলোকিত স্নিগ্ধরূপী হয়ে ওঠে: মহাত্মা গান্ধীর দীক্ষা তা-ই। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এই সংকল্পের বিরোধিতা আছে কিনা জানি না। নোয়াখালিতে দুঃসহ ব্রত গ্রহণ ক'রে চলেছেন তিনি; গ্রামে-গ্রামে প্রশমিত পাপের পথ দেখিয়েছেন ত্যাগের পরিচর্যায়। স্বীকার করব অনশনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী না হয়েও মহাত্মা গান্ধীর অনশনব্রতে প্রায়শ্চিত্তের শিখা জ্বলতে দেখেছিলাম, সে-কথা ভুলতে পারিনি। সেবারে তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হন। পূর্বে একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পুনায় গিয়ে গান্ধীজির অনশনব্রত দেখেছিলাম, হঠাৎ মনে হয়েছিল সঞ্চিত যুগের পাপ ক্ষয় হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কতদূব বিচলিত হয়েছিলেন ইতিহাসে তা লেখা আছে।

বহুজনের দুঃখতাপ শরীরে গ্রহণ ক'রে মানবকল্যাণী তপ করেছেন এমন কথা শুনতে পাই। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেদিন মহাত্মা গান্ধী অনশনের দশম দিনে মৃত্যুর অতিনিকটবর্তী হন, সমস্ত দেশে এমনকি বহির্জগতেও বিশ্বাস-অবিশ্বাসে বিমিশ্র বেদনা উন্মথিত হয়েছিল। তখন একটি কবিতায় গান্ধীজির প্রবর্তিত পুরানী প্রথার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। স্বরচিত সেই কবিতা এইখানে উপস্থিত ক'রে গান্ধীজির প্রায়শ্চিত্তনীতির মূল প্রেরণা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

অনশন মেলে হুতাশন
তাপী তিনি, মরণজীবন
মেলালেন তোমার আমার।
সৃষ্টির আগুন অগণন
খুলে দিল অরুণ গগন
পিছনে ভাঙ্‌ল কারাগার॥

তৃষ্ণাতাপ থাকে প্রাণ জুড়ে,
তবু তাকে ছেড়ে কিছু দূরে
দাঁড়ায়েছে আজ বহু লোক—
ভয়ের শিকল যায় পুড়ে
ছিঁড়ে দিল বন্ধনের শোক—
অগ্নিবাণী বুকে-বুকে উড়ে ॥
নীলাকাশে হোমশিখা তাঁর
সূর্যকে করেছে অঙ্গীকার ;
দাহে তাঁর উজ্জ্বল ক্ষরণ
যত পাপ তোমার আমার।
—প্রাণের সন্ধানে সবাকার
তিলে-তিলে মরণ বরণ ॥

একথা না মনে ক'রে পারি না যে এই প্রজ্জলিত পাপের যুগে নোয়াখালিতে তাঁর একটি মহা-অগ্নিপরীক্ষার পুনরাবৃত্তি সামনে রয়েছে। শেষ বারেও মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িকতার ঘনান্ধকারে কোনো আলোকপথ দেখতে পাননি। বেহারে, পঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, বারংবার কলকাতায়— এবং বোম্বাই, আগ্রা, কানপুর, গড়মুক্তেশ্বরে, আরও কত নাম বলব— যে সাংঘাতিক নরনারী-হত্যা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেল তাতে মহাত্মা গান্ধীর পরীক্ষা কঠিনতর হয়েছে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ভারতীয় অন্ধকার সামান্য অপসারিত হলেও মানব-সম্বন্ধের লোকালয়ে মিলন-মনোভাব দেখা দেয়নি, সাম্প্রদায়িক দেয়াল কঠিনতর হয়ে খণ্ডতাকেই স্থায়ী করতে উদ্যত। এমন কালে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালিতে ফিরে চললেন। সহজীবন, সহযোগিতা এবং সত্যাগ্রহের কর্মী ভেদান্ধকারের যে-ভূমিকায় নতুন অধ্যায় শুরু করলেন তার পরিণাম কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু পাকিস্তান হিন্দুস্থান নয়, ভারতীয় লোকায়ত সত্যের নির্ভরতা। পৃথিবীজোড়া বিভেদের পর্বে এই উত্তরের জন্যে মানবজাতির একটি অপেক্ষা রয়ে গেল।

য়োহান বয়ার

স্ট্যাগুসেটার নামে একটি ক্ষুদ্র নরোয়েজিয়ান শহরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন উত্তর-শীতের সোনালি বিকেলবেলা। ট্রেন আমাকে ফেলে রেখে ট্রণ্ডহয়েম-এর দিকে চলে গেল, সেই আমার শৈশব-কল্পনায় করুণার্দ্র মধুর সমুদ্রধারের ট্রণ্ডহয়েম শহর যেখান থেকে য়োহান বয়ার-এর গল্পের মাঝিরা নৌকো নিয়ে লোফোটেন দ্বীপে জাল ফেলে মাছ ধরত, কত সময় বাড়ি আর ফিরত না। নর্থ-সী'র উত্তাল ঝড়ে কত নৌকো ডুবে যায়, জীবিকার জন্যে প্রাণান্ত সংগ্রাম করে তবু আবার অন্য জেলের দল মাছ ধরতে বেরোয় যুগে-যুগে— ঘরে যে তা না হলে চলে না। ওদিকে তীরের বালিতে কত রাত্রি অবধি মেয়েরা উদ্বিগ্ন চোখ মেলে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিগন্তে, যদি সেই বাকি দুটি নৌকো ফেরে। কেউ মাথা নিচু ক'রে বাড়ি ফিরে যায়, শিশুটিকে কোলে নিয়ে দীপ জ্বেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। এদেরই একান্ত দুস্থ অথচ নিরন্ত অভিযানী সম্প্রদায়ের একজন হলেন য়োহান বয়ার, যিনি কত গল্পের আশ্চর্য ছবি এঁকেছেন তাদের নিয়ে। এবং যিনি এখন এই আমার সামনে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে!

বয়ারের কাছে এসেছি আমার জীবনতীর্থের নমস্কার জানাতে। ট্রেন চলে গেল, উত্তর-নরোয়ের দিকে আমার যাওয়া হ'ল না, কিন্তু বয়ার স্বয়ং আমার পাশে। ভাবতেই পারা যায় না অথচ সত্যি। তাঁর জোয়ান ছেলে অনায়াসে আমার বড়ো স্যুটকেসটা কাঁধে তুলে নিলেন, আমরা পাহাড়ে-পথ দিয়ে চললাম হেঁটে। আপত্তি জানিয়ে এই বয়ার-পরিবারের কাছে কোনো ফল হয় না, তাঁদের আতিথ্য এইরকম। গাড়ি করা হ'ল না, কারণ তাহলে সুন্দর পার্বত্য নরোয়ে পল্লীর প্রত্যক্ষতর স্পর্শ পাওয়া যাবে না— পায়ে চললে বন্ধুত্ব জমে ওঠে চতুর্দিকের সঙ্গে। বয়ারের বয়স হয়েছে কিন্তু বালকের মতো তিনি উৎসাহী, প্রাণে-ভরা কথাবার্তা, চলাফেরা, সব ক'রে এবং দেখিয়ে তাঁর সুখ। তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলাম, শৈশবে সুদূর আসামের পল্লীতে প্রবাসী বাংলা ছেলে তোমার বই হাতে নিয়ে লোফোটেন দ্বীপের দিকে কতবার যাত্রা করেছে। লাল-টালি-দেওয়া নরোয়ের ছোটো-ছোটো বাড়ি দেখা যায়, দশটা

রাত্রের পরও সূর্যালোকে ক্ষেতের পাশে নরোয়ের গান আর গ্রাম্য নাচ হচ্ছে। তারই উচ্ছল উৎসবে যোগ দিয়েছি। আসামের গৌরীপুর গ্রামটিতে সকালে বিকেলে একটি ক'রে ট্রেন যায়, বাহিরের সঙ্গে ঐ একমাত্র যাতায়াতের যোগ, বাংলো-বাড়ির কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমার-বইয়ে-ভরা মন নিয়ে চেয়ে দেখেছি কোন অজানা নরোয়ের দিকে তার ঠিক নেই। ব্যক্তিগত জীবনে মিলিয়ে জানা ছাড়া বাইরের ঘটনাকে কাছে পাওয়া যায় না, দূরবাসী মন যাদের, বয়ার যেন তাদেরই আরও কাছের সঙ্গ দেন তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে। তারপর দৈবক্রমে যখন যথার্থই উত্তর-য়ুরোপে এলাম, স্কাণ্ডিনেভিয়ায় এসে পড়লাম, চিঠির উত্তরে বয়ারের নিজের হাতের লেখা নিমন্ত্রণ এল আর আমার তখন কেমন লাগল তা বুঝতেই পারো।

গল্প করতে-করতে পাহাড়ের উঁচুতে ছোট্ট এক কুটিরে আমরা এসেছি, শাদা রং-করা কাঠের গেট রাস্তার ধারে, ভিতরের দরজা-জানালা নীল, ছাত লাল-টালির। এপাশে ওপাশে দূরে আরো ছোটো-ছোটো কুটির, তাতে মেষ-পালকেরা থাকে। অনেকেই ছাগল চরায়। ছাগলের দুধের খুব চল, তাই দিয়ে অতি সুস্বাদু একরকম চীজ তৈরি করে যা সর্বত্র য়ুরোপে বিক্রি হয়। খানিকটা এই পনীরের নমুনা দেশে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। শুনলাম নন্দলাল-বাবুর খুব ভালো লেগেছিল। ছোট্ট কুটির, ছাগল-চরানো সমাজ, চতুর্দিকে নির্জন মর্মরিত উঁচু পাইনগাছ, শীতকম্পিত বায়ু— দূরে আরও উঁচু পাহাড়, এরই মধ্যে য়োহান বয়ার বাস করছেন। যাঁর "গ্রেট হাঙ্গার" বইয়ের পৃথিবী জুড়ে নাম। "দি লাস্ট অফ দি ভাইকিংস্" গ্রন্থের লোফোটেন সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ীদের মহাকাব্য লিখে যিনি দেশ-বিদেশের হৃদয় জয় করেছেন তিনি যখনই ছুটি পান এই শৈলপল্লীতে এসে লুকিয়ে থাকেন। রাজধানী অসলো শহরের কাছে হ্বালস্টাড অঞ্চলে তাঁর এখন মস্ত বাড়ি হয়েছে, কিন্তু মন সেখানে নেই। গরিবের ছেলে তিনি, শৈশবের কথা ভুলতে পারেননি ; যাদের কিছু নেই, মস্ত হৃদয় আছে, তাদের চিরন্তন জীবনের কাছাকাছি তিনি থাকতে চান। শুধু থাকবার জন্যেই নয়। কতভাবে তাদের জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন, গ্রাম্য সমবায়, বিজলি-বাতি, নতুন কর্মকুশলতা ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রামে এনেছেন। সে আর-এক কাহিনী। কিন্তু যিনি ঝোড়ো শীত-সমুদ্রের লেখক, মাঝিদের যিনি সমগোত্রীয় ছিলেন, তিনি ছাগল-চরানোর দলে এই পাহাড়ে কেন ?

কারণটা অতি ধীরে-ধীরে বুঝতে পারলাম, দু-চারটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার

মধ্য দিয়ে। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা একে-একে প্রতিবেশী কুটিরগুলিতে গেলাম, সনসন করছে পাইনের বন, খানিক পরে পাইনের শীর্ষে তারা ঝকঝক ক'রে উঠল। সারাদিন জঙ্গলে-জঙ্গলে ছাগল চরিয়ে ক্লান্ত অথচ প্রসন্ন শৈলচারীদের সংসার ঘরে সমাগত ; আগুনের চারিদিকে সবাই চুপ ক'রে বসে আছে। কিছুই তাদের নেই অতিথিকে খেতে দেবে, কিন্তু খাওয়ানোই তো আতিথ্য নয়, অনেক সময় সেটা আতিথ্য ঢাকা দেবার উপায়। এরা স্নিগ্ধ বন্ধুতার আহ্বানে আতিথ্য জানালো। পাইন-তক্তায় তৈরি বেঞ্চিতে আমাদের পাশাপাশি বসতে দিল আর কত সহজে তাদের সঙ্গে প্রাণের গল্প জমে উঠল। যে যখন ইচ্ছে উঠে গিয়ে আগুনের কাছে হাত গরম ক'রে নেয়, মেয়েরা কেউ হয়তো নতুন কাঠ ঝুড়ি ক'রে আনছে, পুরুষেরাও ; মেয়েরা অনেকেই পশম দিয়ে কিছু-না-কিছু বুনছে। জানালার ওপারে স্বচ্ছ রাত্রি দূর পর্যন্ত নিবিড় শান্তি বিছিয়ে দিয়েছে। অরণ্যের গভীরতা পাহাড়ে-পাহাড়ে জাগ্রত। একটি কুটিব থেকে বেরোনোর সময় বয়ার হঠাৎ বললেন, "জানো, আমি এইরকম পাহাড়ে ছাগল চরিয়েছি অনেক বছর।"

জানলাম তাঁর এমন সময় এসেছিল যখন আপন বলতে কেউ নেই, বাড়ি নেই, ছোটো ছেলে তিনি বৃহৎ পৃথিবীতে একা। সারা গ্রীষ্মকাল ধ'রে নরোয়ের পাহাড়ে-পাহাড়ে ছাগল-চরাবার জন্যে লোক বেরিয়ে যায়, শৈলপল্লীতে তাদের কোথাও না কোথাও খাবার জোটে, কোনো মাইনে নেই কিন্তু 'মামলে' জামা কাপড়, একটা কম্বল সঙ্গে নিয়ে গরিব ছেলেরা দূরে-দূরে এই কাজে চলে যায়। তারা অনেক সময় পার্বত্য জঙ্গলেই গাছের তলায় রাত্রে শুয়ে থাকে। বয়ার বলছিলেন, তিনি বড়ো-বড়ো গাছের ফাঁক দিয়ে বহু উঁচুতে তারাগুলিকে দেখতেন— শুয়ে-শুয়ে এমনি ভাবে তাঁর নক্ষত্র-পরিচয় হয়েছিল। ক্যাল্‌ডীয় মেষপালকদের মধ্যে নক্ষত্রবিদ্যার চর্চার কথা মনে পড়ল। কল্পনায়-ভরা বালক য়োহান বয়ার অরণ্যে ছাগল চরাচ্ছেন, শহরে ফেরবার পথে তৃষিত চোখে তিনি দেখছেন ধনীদের লাল-টালি-অলা বাড়ি, ফুলে-ভরা বাগানে ছেলেমেয়ে দৌড়ে খেলা করছে, তাদের মা আছেন। মায়ের কথা বলতেই বয়ারের চোখে জল আসে। একলা ছেলে, যখন তাঁর বৃদ্ধা মা হাসপাতালে গরিবদের জীর্ণ বিভাগে শুয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন তখন থেকেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনে যেমন ক'রে হোক মাকে সুখ দেব, সেবা করব। দরিদ্রা মা-জননীই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা, তিনিই অসহায় শিশুর মনে সংকল্পের আলো জ্বাললেন।

ছেলেটি কোনো দুঃখকেই আর দুঃখ মানেনি, সামনের দিকে চলে গেছে। কিন্তু বয়ার মা-র কাছেও বেশিদিন থাকতে পেতেন না। ক্রীতদাসের মতো পাহাড়ে-পাহাড়ে ছাগল চরিয়েছেন, কাঠ কেটেছেন। ব্যাকুল হয়ে ফিরে-ফিরে আসতেন মায়ের শূন্য ভাঙা বাড়িতে, দেখতেন কত কষ্ট ক'রে মা কাজ করেন। ছেলের অবশেষে দুর্জয় অধ্যবসায়ের মধ্যে দিয়ে উন্নতি হ'ল, ধীরে-ধীরে নাম হ'ল, কিন্তু ধনসম্পদের কাল তাঁর মা তো দেখে যাননি। প্রতিদিন বয়ার তাঁর জননী ভগবতীকে স্মরণ করেন, দুঃখিনী তিনি তাঁর পরমারাধ্যা, চিরজীবনের পথে অনন্ত পুণ্যনির্দেশ। তার পরে যখন বয়ারের আবার সংকটকাল আসে, এবারে দারিদ্র্য নয়, একান্ত অস্বাস্থ্য, তখন আর-এক জন তাঁকে সেবা ক'রে বাঁচান—ইনি হলেন তাঁর কল্যাণী স্ত্রী, আমি যখন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নরোয়ে এলাম তখন তিনি মারা গিয়েছেন। বয়ারকে দেখে মনে হ'ল তিনি তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে শান্তি পেয়েছেন কিন্তু তাঁর মন একাকী। বিশ্ব তাঁর বন্ধু, কিন্তু অন্তরে সুদূরতা, এরকম প্রায়ই মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায়।

"পরম তৃষা" (গ্রেট হাঙ্গার) বইখানিতে সেই বৈরাগ্যের কথা আছে যা মানুষকে ভিতরে গেরুয়া বসন পরায়, অথচ বাহিরে আনন্দিত সেবার নির্লিপ্ত পরিচয়। পাহাড়ের শিখরে, সমুদ্রের ধারে মানুষকে কে ডাক দিয়ে যাচ্ছে—চিরদিনের সৃষ্টিশীল মানুষ সেই ডাকে চলে যায়। য়োহান বয়ারের সারা জীবন সেই দূরের চলা, মনে হয় লোফোটেন মাঝিরা উত্তাল তরঙ্গিত শঙ্কায় তাঁকে ডাকছে, কখনো মনে হয় লাল-টালি-বাড়ি-অলা সাধারণ জীবনের সুস্বপ্ন তাঁর চোখে, হয়তো তাঁর শৈশবের ব্যথায় ভরা মায়ের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু শুধু তাঁর কথাবার্তার স্নিগ্ধ প্রীতি এবং হাস্যময় একটি করুণার ভাবে নয়, প্রত্যহ কিছু-না-কিছু বিশেষ ব্যবহারে বয়ারের জীবনের অন্তর্বর্তী পূজার ভাব ধরা পড়ে।

এই মহাপুরুষ নিজেকে মনে করেন তিনি এখনো সেই গরিব ছেলে, সেবা ক'রে তিনি মাকে যেমন বোবা ব্যথিত বুকের অর্ঘ দিতেন, অতিথিদের পরিচর্যায় আজও সেই নিভৃত অর্ঘ দেওয়া তাঁর অভ্যাস। মনে করতে পারো য়োহান বয়ার তোমার জুতো পালিশ করছেন? আমি তাঁর অতিথি, কোন দূরাগত সামান্য আগন্তুক, ভোরে উঠে দেখি আমার শোবার ঘরের দরজার বাহিরে তিনি অতি সন্তর্পণে আমার জুতোজোড়া রেখে যাচ্ছেন। য়ুরোপের নিয়ম, দরজার বাহিরে জুতো রেখে দিতে হয়; হোটেলের বা বাড়ির ভৃত্যেরা

পরিষ্কার ক'রে পালিশ ক'রে তা সকালে রেখে দেয়। আমি একান্ত আশ্চর্য হয়ে কিছু বলবার পূর্বেই তিনি বললেন, "আমি গরিবের ছেলে।"

কাউকে দেখাবার জন্যে নয়, কোনো কথাবার্তা নেই, বয়ার প্রত্যহ এই-রকম দুটি-একটি কাজ করেন— তাঁকে দেখে বুঝি, সেবা দিয়েই ঐশ্বর্যবান আমরা, এমন আর-কোনো ঐশ্বর্য নেই। নরোত্তম যাঁরা তাঁরা রচনায়, কর্মে, দেশের জন্য অন্তিম দুঃখবরণের দ্বারা যা দেন তা হচ্ছে মানুষকে সেবার অর্ঘ, সেই অর্ঘ আরও দূরে গিয়ে পৌঁছয়। ঘনিষ্ঠ খবর নিলে জানব মহাপুরুষেরা প্রাত্যহিক ছোটো-ছোটো এইরকম পুণ্যকর্মের মধ্য দিয়েই বৃহৎ সৃষ্টির পথ খুলে রাখেন। ছোটো যাকে বলে তাঁদের কাছে তা মহৎ। সেদিন নরোয়ের সূর্যাভ প্রহরটি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাহাড়ের উপর পাইন-অরণ্য ঝলমল করছে, দূরে নিচুতে একটি ছোটো হ্রদ দেখা যাচ্ছে, পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন য়োহান বয়ার। অনেকক্ষণ কিছুই বললেন না, কিন্তু মুখের ভাব তাঁর করুণায় ভরে উঠেছে।

আলবার্ট আইনস্টাইন

আইনস্টাইনকে দেখলে মনে হয়, উড়ো শাদা চুলে-ভরা মাথা আর স্বপ্নদৃষ্টি চোখের এই মানুষটি নিশ্চয়ই কবি অথবা আর্টিস্ট— পাশের ঘরে বসে খেয়ালি রচনায় ডুবে ছিলেন, এইমাত্র বেরিয়ে এলেন। কিন্তু ভাবনায়-পাওয়া মস্ত লোকের রীতি অনেকটা একই রকম, কবি অথবা নক্ষত্রতাত্ত্বিক এমনকি নতুন মানবিক রাষ্ট্রনির্মাতার আচরণে ধ্যানের দূরত্ব আত্মভোলা ভাব প্রায়ই দেখা যায়। তখন রবীন্দ্রনাথ বার্লিনের ওয়ানসে অঞ্চলে ছিলেন, একদিন দেখি সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন সেই জগদ্বিখ্যাত মূর্তি— শিশুর মতো সহজ, গম্ভীর মুখের ভাব, এলোমেলো একরাশ শাদা চুল বিদ্যুল্লতার মতো প্রতিভাপ্রদীপ্ত কপাল ঘিরে আছে, অনেকটা যেন আলোর মণ্ডল। সুদূর স্মিত স্পর্শ তাঁর ঠোঁটের কোনায় চোখের দৃষ্টিতে ছুঁয়ে আছে— হাসবার সময় খুবই হাসেন, কিন্তু সেই হাসির আনন্দ গভীর আত্মোপলব্ধির সঙ্গে জড়িত, যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের, যেমন দেখি গান্ধীজির উজ্জ্বল ব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইন যখন পাশাপাশি বসলেন তখন একটি দেখবার মতো দৃশ্য— মনে হ'ল জগজ্জন দেখে যাক। পৃথিবীতে এমন দেবত্বপূর্ণ মানুষ— যাঁরা শুধু প্রতিভায় নয়, চারিত্রে এবং নিত্য আদর্শিক কর্মে নৃপতি, তাঁদের দুই স্বতন্ত্র আপন রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব-পশ্চিমের এমন মিলন ইতিহাসে কমই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের জানালার বাহিরে, ওয়ানসে হ্রদের সায়াহ্নমণ্ডিত জল তখন রঙিন, পাল তুলে ঐ ছুটিবিলাসীর ছোট্ট-ছোট্ট পান্সি নৌকো চলেছে, তীরে শিশু আর বয়স্ক শিশু খেলছে, চড়িভাতি করছে— ১৯৩০-এর বার্লিনে তখনো খুশির ঢেউ তীব্রতায় তলিয়ে যায়নি। কিন্তু এই দুই মহাবন্ধুর কথাবার্তায় সব আনন্দ অতিক্রম ক'রে মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে বেদনার প্রশ্ন দেখা দিচ্ছিল। তাঁরা পৃথিবীজোড়া একটা বৃহৎ ভ্রাতৃহত্যার প্রলয়পর্ব ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত দেখেছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ যে শান্তিময় হবে তখনকার পৃথিবী কোনোখানেই সে-আশ্বাস দেয়নি। এঁরা দু-জনে পূর্বেই পরস্পরকে চিনতেন কিন্তু এইবারই আলাপ জমে উঠল। কথায়-কথায় গভীর জলে আলোচনা গিয়ে ঠেকল— এই সমস্ত অস্তিত্ব, যা মানুষকে, পৃথিবীকে, নক্ষত্রময় জগৎব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে এক, যা আমাদের চেতনায় অনু-

পরমাণুতে অদৃশ্য অভাব্য গতিতে চলছে, হচ্ছে, তার স্বরূপ কী, উদ্দেশ্য কী? বিজ্ঞানী এই-সব অগম গহন রহস্যের দ্বারে পৌঁছলেন তারার দরজা খুলে, নক্ষত্র-গুচ্ছের দ্বীপ পেরিয়ে গিয়ে, অমোঘ অস্খলিত আঙ্কিক নিয়মের মধ্য দিয়ে দাঁড়ালেন এমন জায়গায়, যেখানে, যাকে বলি নিয়ম, তারও অতীতে অনন্ত সৃষ্টির ইচ্ছা চলেছে। সেই মহতী ইচ্ছাটি কী? রবীন্দ্রনাথ মহাকবির বিশুদ্ধ অনুভূতি-দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন পরমা ইচ্ছা কীরকম ক'রে নিয়মের রাজ্যে অনুবর্তিনী হয়ে চলছে, বন্ধনই তার প্রকাশ। বিচিত্র মানবলোকের উপলব্ধিগুলিকে তিনি বৃহৎ বিশ্বের ধ্রুব বিধিবিধানের মধ্যেও অনুসরণ করছেন। দুই রাস্তা দিয়ে কবি ও বৈজ্ঞানিক একই জায়গায় পৌঁছলেন, নিয়মের পর নিয়ম আবার স্বাধীন ইচ্ছার পর ইচ্ছার খেলা। জগৎ-রহস্য জ্যোতির্ময় হয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে। এই-সব প্রকাণ্ড চিরন্তন পটের সম্মুখে যুদ্ধ-শান্তি-ব্যাবসা-বাণিজ্য কতরকম প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের তরঙ্গ প্রাণসমুদ্রে নিত্য আন্দোলিত হচ্ছে— এও তো ছোটো নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষের চৈতন্যের আলোই সেই দীপ, যা হাতে ক'রে নীরন্ধ্র আশ্চর্য সৃষ্টি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়— বৈজ্ঞানিকের হাতেও সেই দীপ, কবিরও হাতে— তা না হলে দর্শকের দৃষ্টি কোথায়? সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে এই মহামানবিক সত্য— তারই যোগে বিশ্বব্যাপারের যোগসূত্র পাওয়া যায়। সেটি হারালে অঙ্কই বা করবে কে, চৈতন্য বাদ দিয়ে কোনো-কিছুর মূল্যবোধই বা কোথায়? মানুষের মন-প্রাণকে বাদ দিলে কী থাকে, তা মানুষের জ্ঞানের অগম্য। শুধু তা-ই নয়, মানুষের চৈতন্য-জ্ঞান-সত্য যখন পরম সত্য, তখন তার সঙ্গে সব-কিছুর সত্য জড়িত এবং এক; কোনো সত্যকে অস্বীকার ক'রে তো সমস্তের সত্য থাকতে পারে না। সত্য তো অনেক নয়, এক। তাই মানুষের সত্যকে অনন্ত উজ্জ্বল ক'রে জানো, জানাও। আইনস্টাইনও মানুষের আশ্চর্যতার কাছে অবাক, কিন্তু তিনি নিয়মের বিশ্বকেই বেশি চেনেন। তিনি বললেন, মানুষ না থাকলেও অঙ্কের নিয়ম থাকে, চৈতন্য বাদ দিয়েও বিশ্ব। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বললেন— তাহলে আমি আপনার চেয়েও ধার্মিক! অর্থাৎ মানুষকে বাদ দিয়েও বিশ্বকে জানা স্বীকার করা তো মনুষ্যধর্মের চেয়েও বড়ো ধর্ম। মুশকিল এই যে, মানুষ হয়ে মানুষকে বাদ দেওয়ার অর্থ কী? তা কি আমরা পারি; যদিও মনে করি যে পারি। তাছাড়া এই যে মানুষের মধ্যে দিব্যজ্যোতিস্বরূপ চৈতন্য তার সত্য মানুষের এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও, মানব-মনকে স্বীকার করার মধ্যে সীমাকেই মানা হয় না। আইনস্টাইনও চৈতন্যের অমেয়

রহস্তের কাছে দাঁড়িয়েছেন, কেননা আধুনিক বিজ্ঞান আজ সেই স্বীকৃতি চায় যা নিয়মের চেয়েও বেশি; কিন্তু সেদিনকার কথাবার্তায় বোঝা গেল বিজ্ঞান এখনও পথের মোহানায় দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে যে-সব কথাবার্তার আভাস দিলাম তা একদিনে হয়নি, দুই দিনে হয়েছিল; কিন্তু বিষয়টি এই। লুকিয়ে-লুকিয়ে আমি সমস্তটার নোট নিয়েছিলাম— পরে রবীন্দ্রনাথের হিবর্ট লেকচার "রিলিজন অফ ম্যান" বইখানিতে বেরিয়েছে।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তখন বার্লিনে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, গান্ধীজির একটি চিঠি আইনস্টাইনকে দেখালেন। আইনস্টাইন খুশি হয়ে উঠলেন, তিনি যে মহাত্মা গান্ধীকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করেন তা সর্বজনবিদিত। আইনস্টাইন বরাবরই যুদ্ধ-বিগ্রহকে ঘৃণা করেন এবং তার বিরোধী, তবে এই যুদ্ধে ইহুদিদের উপর জর্মানদের অত্যাচারের সময় বর্বরশক্তিকে শস্ত্রবলে প্রতিহত করা সম্ভব, এই মত তিনি প্রকাশ করেন। হায়রে, এই মহাযুদ্ধে কোটি-কোটি লোক মেরেও মানুষের অত্যাচার শেষ হ'ল কই? কমলো, না বাড়লো? মহাত্মাজি প্রতিকারের ধ্রুব পথ খুঁজছেন, এ নিয়ে আইনস্টাইন একান্ত শ্রদ্ধান্বিত, উৎসাহিত— পুরো বিশ্বাস না হলেও তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির কাছে প্রশ্ন নিয়ে আসেন, ঐ দুই মনীষীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব'লে তিনি আপন শ্রদ্ধা ঘোষণা করেছেন।

পট্‌স্‌ডামে রবীন্দ্র-আইনস্টাইন মিলন ঘটল ওয়ানসে-ভবনে তাঁদের সাক্ষাতের ক'দিন পরে। মহাবৈজ্ঞানিক যেখানে থাকতেন ঠিক সেই পাড়ার নাম হ'ল কাপুথ। ছোট্ট দোতলা বাড়ি, দেয়াল দিয়ে লতা উঠেছে, উপরের ঘরে হাসি-গল্পে চা-খাওয়ায় সময় কাটল। যুগ-যুগের বিজ্ঞানধারা যিনি একেবারে বদলিয়ে দিয়েছেন সেই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মানুষটিকে কাছে যতই দেখা যায় ততই আশ্চর্য হতে হয়। কত সহজ অনাড়ম্বর স্নেহশীল মানুষ, কোথাও কোনো বাধা নেই, নিয়ত শুভ্রতায় ভরা। তখন তাঁর স্ত্রী ও কন্যাও ছিলেন, বাড়িতে স্নিগ্ধ আনন্দ ছেয়ে আছে। ভাবি, আইনস্টাইন আজ কত একাকী! তাঁর স্ত্রী ও কন্যা দু-জনেই পরলোকে, আর তিনি নিজে নির্বাসিত। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইন বিজ্ঞান-গবেষণায় নিযুক্ত, যুদ্ধবিধ্বস্ত জর্মানিতে আর ফিরে যাবেন না। জর্মানির সুখ-দুঃখের চিরন্তন স্মৃতি, নাৎসী বিভীষিকা এবং যুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তির ধ্বংস-অত্যাচারের উন্মত্ততা, এর কোনো প্রসঙ্গই তিনি কাছে সইতে পারবেন না।

এখনো আইনস্টাইন বাজনা শোনেন, বেহালা বাজান। তিনি যে সংগীত-

পারদর্শী তা কারো অজানা নেই। বৈজ্ঞানিক তপস্যার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সুর-তন্ময় সাধনা জেগে আছে। কিন্তু কোথায় সেই বার্লিনের হ্রদ, যেখানে তিনি একা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, মহাবিশ্বের বিজ্ঞানপথিক সব ভাবনা ভুলে নিজের সংগীতযন্ত্রটির তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে ধ্বনি জাগাতেন— মনে হয় তাঁর জীবনের শীর্ষতম সৃষ্টির অধ্যায় আজ বিগত। কারণ, জ্ঞানই বলো বিজ্ঞানই বলো, তার সাধনা পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত, বন্ধু এবং সহকর্মীর সমবায়ে তা গড়ে ওঠে। সেই পরিবেশ যা জীবনের ভাষা, মাটি, পরিবারের সমবেত সৃষ্টি, তা ঠিক বদলানো যায় না। ম্যাক্স্ প্লাঙ্কের সঙ্গে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন বার্লিনে দেখা হয় তখন তিনি আমাকে এই কথা বলেছিলেন। ইনি আইনস্টাইনের চেয়ে বয়সে বড়ো, ছোটো-ভাই যেন দেশ ছেড়ে গিয়েছে— নিতান্ত সইতে না পেরে— এই ব'লে দুঃখ প্রকাশ করলেন। প্লাঙ্ক নিজেও কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে বিশ্ববিখ্যাত, তিনি ইহুদি না হলেও সমানভাবেই নাৎসী-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেননি। যে-আমেরিকায় আইন-স্টাইন জর্মানত্ব পরিহার ক'রে মার্কিন সিটিজেনশিপ, অর্থাৎ তারই স্বদেশী অধিকার আইনগতরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই দেশে যখন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার বেড়াতে এলেন তার কথা মনে পড়ছে।

এবারেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রসঙ্গ জড়িত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিয়ে তিনি একদিনের মতো ন্যুইয়র্কের তীব্র সাংবাদিক উৎসাহ-আক্রমণ হতে বেঁচেছিলেন। যখন আইনস্টাইনের জাহাজ আটলাণ্টিকের মাঝ-দরিয়ায় তখনই রাশি-রাশি বেতার টেলিগ্রাম তাঁর কাছে পৌঁছতে লাগল— কেউ চায় তাঁর ব্যবহৃত বিশেষ মাথার তেলের নাম (খবরের জন্যে বকশিশ পাবেন মস্ত টাকা); কারো অনুরোধ, যেন বলেন তাঁদেরই কলম ব্যবহার করেছিলেন রেলেটিভিটি তত্ত্ব বিশ্বের কাছে উপস্থিত করবার সময় (বকশিশ আরও মস্ত টাকা); কেউ চায়, ন্যুইয়র্কে নেমেই প্রথম তাদের ক্যামেরায় ছবি তোলান, কারো বিশেষ রেস্তরাঁয় খাবার খান, আমার এখানে বক্তৃতা দিন। ক'টার সময় ওঠেন, কী খেতে ভালোবাসেন, অমুকের অমুকের গল্প বা রাষ্ট্র বা চেহারা সম্বন্ধে তাঁর কী মত, এই-সব অত্যন্ত জরুরি খবরের জন্যে বেতার-আক্রমণ চলেছে— বকশিশের নির্লজ্জ প্রলোভনও বেতারে বিতরিত। প্রথমে আইনস্টাইন ঠিক করলেন ন্যুইয়র্কে নামবেনই না, জাহাজেই আত্মগোপন ক'রে থেকে যাবেন, শেষ পর্যন্ত সেবারে তিনি জাহাজ বন্দরে পৌঁছবার পূর্বেই ছোট্ট মোটর

বোটে নেমে ন্যুইয়র্কে অজ্ঞাতভাবে পদার্পণ করেন। কিন্তু ধরা পড়তে বেশিক্ষণ লাগল না। সেদিন টেলিফোন এল রবীন্দ্রনাথের কাছে— তিনি তখন পার্ক এভিনিউয়ে বন্ধু এল্‌মহর্স্টের সুন্দর একখানি ফ্ল্যাটে রয়েছেন— আইনস্টাইন তাঁর খবর পেয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে দিনটা কাটাতে চান। আমরা তো খবর পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। দোষ হয়ে থাকে তো স্বীকার করি, কাউকে না ব'লে তাড়াতাড়ি আমি এক উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফার আনিয়ে রেখেছিলাম, ওঁদের একত্র ছবি নেবার এমন একটি শুভযোগ ছাড়তে পারিনি। ফোটো-গ্রাফার মার্টিন ডস্‌ কমবয়সী, কিন্তু তিনি ছবি তোলায় তখনই যশ অর্জন করেছিলেন— ভদ্রলোকটিকে বহু ঘণ্টা বারান্দায় এক জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। কেননা প্রথমেই তাঁকে দেখলে ভিড়ের আক্রমণ হতে পলায়মান আইনস্টাইন নিশ্চয়ই লেশমাত্র খুশি হতেন না। বাড়ি থেকে নামবার সময় অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে যখন ছবিতোলার প্রস্তাব করলাম তখনো আইনস্টাইন মোটেই খুশিতে চমৎকৃত হলেন না। যা-ই হোক, দু-জনের ঐ শেষ ছবি অতি অপূর্ব উঠেছিল— মহাকবি ও মহাবৈজ্ঞানিক, দু-জনেরই চেহারা মানবর্ষির মতো অক্ষয় হয়ে একত্র রয়ে গেল। পৃথিবীর সর্বত্রই তা আজও ছাপা হচ্ছে।

জীবনীলেখক একজন বলেছেন, আইনস্টাইন শিশুবয়সেই পিতার কাছ থেকে একটি কম্পাস পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান— কম্পাসের চুম্বক-লাগানো কাঁটা দিক-নির্ণয়ের নিয়ম কী ক'রে জানে তার রহস্য তখনই তাঁর মনে অপরিসীম বিস্ময় জাগিয়েছিল। ছেলেবেলা হতেই তিনি বাজনা শুনেও মুগ্ধ। একটি তন্ময় নিগূঢ় আত্মজীবনে তিনি বাস করতেন বোঝা যেত। কিন্তু মনে যে-নীহারিকা গাঢ় হয়ে উজ্জ্বল ভাবনার তারা হয়ে ওঠে, বিশ্বকে পথ দেখায়, তার ক্রমপরিণতির প্রথম পর্যায়ে বালকটি স্বভাবতই আরও যেন একক এবং একান্ত নিভৃতচারী ছিলেন। বুদ্ধিমান ছেলেরা অনেক সময় যেমন বাহিরেও প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাঁর তা নয়, বাহিরে তাঁকে চেনাই যেত না। সর্বদা বই পড়তেন— পনেরো বছর হবার পূর্বেই য়্যুক্লিড, নিউটন, স্পিনোজা, দেকার্ত্‌ প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্র-বিদ্‌ দার্শনিকদের বেশির ভাগ গ্রন্থ তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় তিনি প্রথমবার পাস করতে পারেননি— তার কারণ ব্যাকরণ এবং বিদেশী ভাষা ছিল তাঁর বিভীষিকা। তারপর ক্রমেই তাঁর বিজ্ঞানের শক্তি খুলে গেল ; ছাব্বিশ বছর বয়সেই তিনি তাঁর আবিষ্কৃত রেলেটিভিটি তত্ত্বের মূল প্রমাণ জগৎসমক্ষে উপস্থিত করেন। দেখতে-দেখতে যশ, মান, অর্থ, প্রশস্তির প্রভূত

বাত্যা তাঁকে ঘিরে ফেলল, তাঁর নামে সমগ্র মানবজাতি উজ্জ্বল হ'ল। কিন্তু জনতাভীরু সলজ্জ নিভৃতচারী বালকত্ব কোনোদিনই তাঁর ঘুচল না, আজও নয়। জামার বোতাম বন্ধ করতে ভোলেন, বেলজিয়াম-সম্রাজ্ঞীর নিমন্ত্রণে যেতে ট্রেন থেকে নেমে এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে বেহালা ঝুলিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে স্টেশন থেকে রাজভবনে পৌঁছন— স্টেশনে গাড়ির কথা মনেই নেই— ভাবে-ভোলা-ছেলের দশা তাঁর আজীবন রইল। আইনস্টাইনের সম্বন্ধে গল্পের শেষ নেই। কতরকম ঘটনা যে ঘটেছে, সবই তাঁর অসাধারণ ভালোত্ব আর ভোলা মনের পরিচয়। অথচ সঙ্গে-সঙ্গেই দেখো বুদ্ধি ঠেকেছে গিয়ে যোজন-যোজন ঊর্ধ্ব নক্ষত্রলোকে, অভ্রান্ত মনঃশক্তি। মানুষের দুঃখে কাতর, ন্যায়ের সপক্ষে সংগ্রামশীল, ধ্যানসংবেদনময় তপস্বী জ্ঞানর্ষি এই মহামানুষটি আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন— বিশ্বের কত বড়ো কল্যাণ।

উইনিফ্রেড হোলট্‌বি

উইনিফ্রেড হোলটবির নাম হয়তো অনেকের জানা নেই, কেননা তিনি এখনো বিশ্বখ্যাত হননি। কিন্তু ইংলণ্ডে ক্রমেই তাঁকে আধুনিক যুগমনের সূক্ষ্ম শিল্পীর একজন ব'লে সমসাময়িকেরা গ্রহণ করছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "সাউথ রাইডিং" উপন্যাস ইয়র্কশিয়রের বিশেষ পরিবেশে রচা সাধারণী নানা জীবনীর সুতোয় শিল্পিত আশ্চর্য মানবিক ঘটনা, তার দৃশ্য বিশ্বজনীন। যখন নেপথ্যে মৃত্যুব ঘণ্টা বেজে উঠেছে তখন সাংঘাতিক রোগের মধ্যেই তিনি দ্রুত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই গল্পটি লেখা শেষ করেন— নার্সিং হোম-এ তাঁকে জানানো হ'ল বইখানি ছাপানোর আয়োজন সম্পূর্ণ। কৃতার্থ সৃষ্টির আনন্দে তাঁর মুখে ম্লান উজ্জ্বলতা দেখা দিল, যেন তিনি মানস-প্রতিনিধি এই রচনাটিকে রেখে গেলেন, যাবার বেলায় সেই তাঁর তৃপ্তিসুখ। মনে আছে আমরা বন্ধুজন সেই আরোগ্যভবনের অন্য প্রকোষ্ঠে দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম— অমন একটি বহ্নিময় আনন্দিনী আত্মা সংসারে হঠাৎ দীপ নিবিয়ে চলে গেলেন তা ভাবতেই পারা গেল না। যেদিন লণ্ডনে প্রসিদ্ধ একটি ধর্মালয়ে তাঁর মৃত্যুপ্রশস্তি উপলক্ষে লোকসমাগম হয়, দেখা গেল, দরিদ্র নিগ্রো, ভারতীয় নাবিক, লণ্ডনের বস্তিবাসী, ইস্ট-এণ্ড অঞ্চলের ইংরেজের সঙ্গে একত্র হয়েছেন বৈজ্ঞানিক সাংবাদিক শিল্পী মন্ত্রী কর্মীর দল— ধনী-নির্ধন, স্বজাতি-পরজাতি কত জনকে তিনি হৃদয়সূত্রে এক ক'রে জেনেছিলেন তা প্রত্যক্ষ হ'ল। তার কারণ প্রতিভাভাস্বরা একাকিনী এই অল্পবয়সী লেখিকা সেবায়, সৃজনে, কল্যাণসংগ্রামের সহযোগিতায় সকলকেই আপন ক'রে নিতেন, তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু যেন প্রত্যেকেরই কাছে পারিবারিক মৃত্যুর মতো।

উইনিফ্রেড হোলট্‌বিকে দেখে বোঝা যেত না কোথাও তাঁর সান্নিধ্যে অবসানের ছায়া থাকতে পারে। কিন্তু একটা ঘটনা বলি মৃত্যুর দু-বৎসর পূর্বেই তিনি জানতেন, অন্য কেউ জানত না, যে তাঁর দরজায় যমরাজের দূত উপনীত। শরীরের ভিতরে প্রচ্ছন্ন অশান্তি অনুভব করায় তিনি খুব বড়ো চিকিৎসক হার্লি স্ট্রিটের বিশেষজ্ঞ একজনের কাছে গিয়ে বলেন, কী হয়েছে বলুন। তখন উইনিফ্রেড ছোটোগল্প লেখায় খুব ব্যস্ত, সর্বদাই মাথায় নানা-

রকম গল্প ঘুরছে, সময় একটুও নেই অসুখ করবার বা সে-সব কথা ভাববার— এমন সময় ডাক্তারের দু-দণ্ড কাছে দাঁড়ানোও শক্ত। পরীক্ষা ক'রে নিয়ে ডাক্তার বললেন, "আপনি বুদ্ধিমতী মনস্বিনী, নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সত্যকে আপনি সইবেন।" "নিশ্চয়ই সইব, বলুন-না।" ডাক্তার জানালেন, কোনোমতেই উইনিফ্রেডের পরমায়ু আর দু-বৎসরের বেশি নয়, ব্রাইট্‌স্ ডিসিস যাকে বলে তা অনেক দূর এগিয়েছে, যদিও বাহিরে বোঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে চোখ-মুখের অসামান্য ঔজ্জ্বল্যের একটি কারণ ঐ আভ্যন্তরিক ক্ষয়রোগ, শক্তির অজস্রস্থ প্রখর স্রোতে বইছে সামনের আসন্নতারই টানে। উইনিফ্রেড হোলটবি মৃত্যুভয়হীনা, কত মৃত্যু কত শোকের গৃহে তিনি প্রেমের প্রদীপ হাতে ক'রে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, আফ্রিকায় নিগ্রোদের উপর অত্যাচারের কথা শুনে সমুদ্র পেরিয়ে তাদের কাছে গিয়েছেন মহাদুর্দিনের সময়, আপন মৃত্যুর কথা তাঁর কাছে নিতান্ত অবান্তর ঘটনা ব'লেই মনে হ'ল। শেষ দু-বৎসর কীভাবে শরীর-মনকে সব-চেয়ে ভালোভাবে কাজ করানো যায় তাই জেনে নিয়ে তিনি আবার নামলেন অন্তহীন মাঙ্গল্যসৃষ্টির কর্মে— সে এক অভাবনীয় অধ্যায়। আমি প্রথম তাঁকে দেখলাম অক্সফোর্ডে থাকবার সময়, শুনেছিলাম কয়েক বৎসর পূর্বে যখন তিনি এবং তাঁর পরম বন্ধু লেখিকা ভেরা ব্রিটেন অক্সফোর্ডে ছিলেন, উইনিফ্রেড হোলটবি মাধুর্যে, মননশীলতায়, বলবার দুর্লভ ক্ষমতায় বিশ্ববিদ্যালয়-রাজ্যে চমক এনে দিয়েছিলেন। লণ্ডনে যখন আন্তর্জাতিক 'জাতি-বর্ণ-অত্যাচারবিরোধী সভা' হয়, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে একই বক্তৃতামঞ্চে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা কখনো ভুলব না। তিনি দাঁড়িয়ে ওঠা মাত্র ঘর আলো হয়ে গেল, ক্লিষ্ট অসীম ধৈর্য-মণ্ডিত নিগ্রো শ্রোতৃবর্গের মুখে কতখানি স্বভাবপ্রসন্নতা ফুটে উঠল তার অসীম মূল্য যেন আমরা হঠাৎ পুরো বুঝতে পারলাম, আফ্রিকা-দেশবাসী মহিলা যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। যা বললেন তার মধ্যে যেমন মানবিক ক্রোধাগ্নি তেমনি প্রীতির সমুচ্চতা, যেমন তেজ তেমনি অভীত নতুন বিশ্বাস, একই সঙ্গে তিনি জাতিবর্ণ-অত্যাচারের বিষয়ে পৃথিবীজোড়া বিচিত্র প্রভূত তথ্যজ্ঞান এবং শিল্পী কর্মী ভাবুকের যুগসংকল্পের দৃঢ় পরিচয় তাঁর বক্তৃতায় ফুটিয়ে তুললেন। ফিরে এসে সেদিন অক্সফোর্ডে তাঁর "মাণ্ডোয়া" নামক আফ্রিকা-লাইবেরিয়া সম্বন্ধে উপন্যাস পড়লাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন বই লেখবার জন্যে তিনি বেঁচে থাকলেন না কেন।

উইনিফ্রেড হোলট্বি আমাকে বলতেন যে তাঁর মাথায় গল্পের নেশা যখন চাপত কেবলই তখন গল্পের চারা গজিয়ে উঠত, থামতেই পারতেন না। হয়তো 'টাইম অ্যাণ্ড্ টাইড্' পত্রিকার অফিসে যাচ্ছেন তাঁর সম্পাদকীয় কাজ করতে, খামকা রাস্তার ফুটপাথে একটি লোক যাচ্ছে বাদামি কাগজের পার্সেল সন্তর্পণে হাতে নিয়ে, ভালো ক'রে দাড়ি কামানো হয়নি, বোধহয় খুব ভোরে উঠেছে— অন্য কারণ কী তা-ও মনে আসছে— আচ্ছা, ঐ যে বাসে উঠল বোধহয়— হ্যাঁ নিশ্চয়— ও চলেছে সেই সবুজ দরজাঅলা বাড়িতে, দরজার কড়া নাড়বে কি না একটু দ্বিধা করল, জানালার ওপাশে তারই মেয়ে পাঁচ বছর হয়ে গেল তার ঠিকানা জানায়নি— ঐ দেখো সম্পূর্ণ ছোটোগল্প এল বলে, অফিসের কাজের মধ্যে লিখি কী ক'রে? এমনি ক'রে বাসে, টিউবে, দোকানের ভিড়ে শত-শত গল্পের টুকরো তিনি ছড়ানো দেখতে পেতেন, কথাবার্তা আলো রং জামা মনের ব্যাপার সব জড়িয়ে মানুষের জীবনে অসংখ্য গল্প কেবলি স্রোতের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে তৈরি হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে হ'ল, সময়ের ঘড়িটা যদি ধরো হঠাৎ থেমে যায়, মোটরগাড়িকে যেমন পিছনে চালানো যায় সময়কেও খানিকক্ষণ পিছনে চালাচ্ছি, যা হয়ে গেছে তা উলটো ভাবে আবার হচ্ছে— দেখ, তাহলে ঐ যে লোকটি কাল বাজারের ধারে খবরের কাগজ কিনছিল, মাথার টুপিটা একটু বাঁকা ক'রে পরেছে, মুখে চুরুট কিন্তু অন্যমনস্ক, জ্বালায়নি, বোধহয় পোলিশ ইহুদি হবে··· ঐ তো আবার ছোটোগল্প এল. বুঝি। অথচ গল্প তো খেয়াল নয়, সত্যি— রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'আরও সত্য'। উইনিফ্রেড হোলট্বির অনেক সমুজ্জ্বল গল্প এইভাবে সত্যিকে 'আরও সত্য' ক'রে লেখা, যেমন সেই আফ্রিকা-যাত্রী জাহাজের গল্পটা। রাত্রে আটলান্টিক সমুদ্র খুব দুলছে, একটা কমলা-রঙি মস্ত চাঁদ উঠেছে ফানুসের মতো, মনে হচ্ছে মাস্তুলের দড়িতে আটকা পড়েছে, ডেক-প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কারা ব্যাঞ্জো বাজিয়ে গান তুলেছে— কী সুন্দর গলা; কত যুগের প্রাচীন দেশস্মৃতি আরণ্যক আফ্রিকার হৃদয় হতে উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে গেল। ওদিকে য়ুরোপীয় ধনী বর্বরের দল দামী ক্যাবিনে বসে সুরহীন উগ্র একাকীত্বের গর্বে আলাদা হয়ে আছে— এমন বিশ্বজোড়া রাত্রি, অজানা দেশ— চাঁদ-লাগা সমুদ্রের তিথিতে যোগই দিতে পারছে না; এই-সব মিলিয়ে মিশিয়ে উইনিফ্রেড চমকপ্রদ গল্প লিখলেন। তাঁর সব-চেয়ে ভালো গল্পসংগ্রহ "ট্রুথ ইজ্ নট সোবার" বইখানিতে এই আফ্রিকার ঢেউ-ছোঁওয়া গল্পটি পাওয়া যাবে।

আবার একদিন উইনিফ্রেড হোলট্বির কথা বলব ; তাঁর বন্ধু ভেরা ব্রিটেনের লেখা জীবনী "টেস্টামেণ্ট অফ ফ্রেণ্ডশিপ" বইখানিতে তাঁর কথা অনেক পাওয়া যায়। একটি হাস্যোজ্জ্বল করুণায় ভরা জীবন, পাতায়-পাতায় বীর্য মহত্ত্বের উজ্জ্বল কণা ছড়ানো। এক-এক সময় মনে হয় প্রাণের আনন্দশক্তি উচ্ছল হয়ে পাত্র ছাপিয়ে পড়ছে, যেন খুব একটা প্রাণোৎসব মানুষের এই দুর্দিনের জীবন— তার মধ্যেই আবার আশ্চর্য সব মুহূর্ত আসে যখন জরা মৃত্যু শোকের সব প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে দিব্যতার পাগলামি দেখা দেয়। সেই সময় মানুষ বলে ওঠে, "চিত্ত-দুয়ার মুক্ত পেয়ে সাধু বুদ্ধি বহির্গতা ; / আজকে আমি কোনোমতেই বলবনাকো সত্য কথা!" অর্থাৎ আপাতসত্য বলতে যে-সত্য তারও চেয়ে সত্যি কথা বলব। যে-মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "জগতে যেন ঝোঁকের মাথায় সকল কথাই বাড়িয়ে বলে", সেই উদ্ভাসিত দুর্লভ আনন্দের অধিকারিণী হয়ে মানবমৈত্রেয়ী উইনিফ্রেড হোলট্বি তাঁর প্রাণে ভরা বাড়িয়ে-বলা অতিমর্মস্পর্শী গল্প-উপন্যাস রচনা করতে বসতেন। কিন্তু করুণ গভীর আর-এক রকম রচনাও তাঁর আছে। তিনি জীবনেব দুই মূর্তিই জানতেন। যেমন অজস্র বিশ্বাসে তিনি আপনাকে দান করতে ভালোবাসতেন মানুষের কল্যাণ-কাজে, তেমনি আনন্দকে কঠিন ত্যাগের মহিমায় কিনতে জানতেন— মৃত্যু সামনে রেখে তিনি জীবনকে নির্মল খুশিতে ভরে রাখতেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান, তখন অনেকে বলেছিলেন উইনিফ্রেড হোলট্বির জীবনের একটি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর খুব প্রিয় একটি 'মটো' অর্থাৎ মনোনীত বাণীতে। "টেক ইট— বাট পে ফর ইট।" নাও, কিন্তু তার দাম দাও। অর্থাৎ সেই জিনিসেই তোমার জীবনের অধিকার যার পুরো দাম তুমি দিতে পারো। জীবনের পুরো দাম উইনিফ্রেড ' য়ে গেছেন। তাঁর ক্ষমায়, সেবায়, আনন্দে, তাঁর সাধনায় নিভৃত আত্মত্যাগে তিনি জীবনকে অর্জন করেছিলেন।

২৯ শ্রাবণ, ১৩৫৪

মানব মহাজাতির ইতিহাসে এই দিন শুভস্মরণীয়। বহু কোটি জনের পরাধীন জীবন আজ রাষ্ট্রিক মুক্তির বৃহৎ অঙ্গনে প্রবেশ করল। সাম্রাজ্য-ব্যবসায়ীদের সশস্ত্র শাসন হতে রক্ষা পেয়ে আমরা আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং বিচিত্র স্বাধীন আত্মপ্রকাশের পথে প্রবৃত্ত হলাম। আজ এই দিনে ভারতের মুক্তিকামী অগণিত বীর্যসাধক ত্যাগী কর্মী ধ্যান-নেতাদের উদ্দেশে আমাদের প্রণাম। সকলের নাম ইতিহাসে লেখা নেই, সংবাদপত্রে তাঁদের খবর পৌঁছয়নি, কিন্তু নবীন ভারতীয় সম্ভাব্যতার স্তরে-স্তরে তাঁদের জীবনোৎসর্গ গ্রথিত হয়ে আছে, তাঁদের অক্ষয় দানের পুণ্যতা নির্মলতর ভারতীয় গগনে সমীরিত, তাঁদের সাধনার অগ্নি জ্বলছে নির্বাণহীন ভাবতীয় মুক্তিতপস্যার চিত্তপ্রদীপে, সম্মুখের আহ্বানে তাঁদের সমস্বর মিলেছে দুরূহ আগামীর প্রেরণায়। আমাদের প্রণাম তাঁকে, যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের ভূমিকায় আমাদের কাছে আজ মহান্ প্রত্যক্ষ হলেন; নগ্নপদে যিনি চলেছেন গ্রামে গ্রামান্তরে শহরে বিবল জনপদে, কোটি জনগণের প্রতীক মহাত্মা গান্ধী। অপরাজেয় তেজঃশক্তিব আঘাতে ভারতবর্ষকে জাগিয়েছেন তিনি; জরত্ব হতে উদ্ধার ক'রে প্রদেশে-প্রদেশে মুক্তির সংগ্রামে নামিয়েছেন লক্ষ-লক্ষ নরনারীকে; তাঁরই শঙ্খধ্বনি শুনে আমবা অভয়তার দীক্ষা নিয়েছি শোক-মৃত্যু-দুঃখাভাবে পরিকীর্ণ সংসারে। আসাম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দাক্ষিণাত্য মধ্যভারত সর্বত্র লোকনেতা তৈরি করেছেন এই সর্বলোকের নেতা; বন্ধন কারাগার নিবস্ত আক্রমণের মধ্য দিয়ে চরম অভিযানী মুক্তি-সংঘব্রতীদের চালনা কবেছেন, অনিবার্য সংঘর্ষেব ক্ষেত্রে মানবধর্মের পরাজয় ঘটতে দেননি। তাঁরই প্রদত্ত সত্যাগ্রহ আজ অক্ষৌহিণীকে জয় করেছে দিব্য মানবিকতার মন্ত্রবলে, অহিংস্র ঐক্যশক্তির অনুপ্রেরণায়! শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবী আজ ভারতীয় সংগ্রামের সফলতার দিকে, তাঁর অনুষ্ঠিত নতুন যুদ্ধপদ্ধতির প্রতি আশ্চর্য শ্রদ্ধায় চেয়ে দেখছে। প্রণাম আমাদের রবীন্দ্রনাথকে, যাঁব চিন্তাশক্তির পরম সত্যের উপরই ভারতীয় নবযুগ প্রতিষ্ঠিত। তাঁরই কল্যাণ-দৃষ্টির সূর্যালোকে নতুন ভারতবর্ষ আপনাকে চিনতে পারল। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে একাকী তিনি ভারতবর্ষকে শিক্ষায়, ধর্মে, জনচিত্তের ঐক্য-উপলব্ধির ক্ষেত্রে

চিরন্তন বিশিষ্ট ভারতীয়তার সন্ধান দিয়েছিলেন— বাংলার কবি সমস্ত দেশকে যে বিরাট স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছিলেন তারই ক্রিয়াবলে দেশের চিত্ত নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'ল। শিল্পে সাহিত্যে জ্ঞানময় কর্মের অনুশীলনে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে স্বকীয়তার পথ হতে বিচ্যুত না হয়ে চলবার পূর্ণ মানবিক শক্তি দিয়ে গেলেন। তাঁরই মনের ভাষা আমাদের ভাষা, তাঁরই দৃষ্টি আমাদের নতুন দৃষ্টি, আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি এবং চিরদিন তাঁরই বাণী ফিরে-ফিরে আবিষ্কার ক'রে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করব। প্রণাম আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে। তিনি আর ফিরলেন না, কিন্তু কোনোদিন কি তাঁর প্রত্যাবর্তন শেষ হবে? আকাশপ্রদীপ জেলে ভারতবর্ষ চেয়ে থাকবে একটি দিব্য পথের দিকে, যে-পথ দিয়ে তিনি চলে গেছেন, যে-পথ দিয়ে নিরন্ত সহস্রবার তিনি মুক্তির মশাল জেলে সর্বভারতের মর্মলোকে ফিরে আসছেন। তাঁর উচ্চারিত 'জয় হিন্দ,' আজ ধর্মসম্প্রদায়-জাতি-নির্বিশেষে সমগ্র ভারতীয় প্রতিজ্ঞা। আমাদের সঙ্গে যে-সকল বীরকর্মী রইলেন তাঁদের প্রণাম। সেবায় ত্যাগে অক্লান্ত কর্মপ্রবর্তনার মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে নিয়ে চলেছেন তাঁরা। ভুলব না যে ভারতবর্ষের পুণ্যভূমি আজ বিখণ্ডিত, ভ্রাতৃহত্যার কলুষবৃত্তি আজও নির্বাপিত হয়নি, বিদেশীর প্রতাপজাল ছিন্ন হয়েও আজও সম্পূর্ণ অপসারিত হ'ল না। সম্মুখে আরাম নেই, কেবলই সংগ্রাম। কিন্তু যে-পরিমাণে মুক্তি আমরা অর্জন করেছি তাতে আমাদের মনুষ্যত্বশক্তি দীপ্যমান হয়ে উঠল, ঐক্যের কল্যাণ-পুষ্প-ফল আমাদের উৎসবে পর্যাপ্ত আনন্দ এনে দিল, বাধা অতিক্রম করবার অমোঘ বিজয়গ আমাদের সামনে। ভারতবর্ষকে এক করা নয়, ভারতীয় সকলকে ঐক্যযোগে মেলানোর দীক্ষা নেব আজ ২৯ শ্রাবণে। মৃত্যুহীনকে প্রণাম।

এইচ. জি. ওয়েলস্

জেনিভায় লেক-এর কাছেই একটি বাগানবাড়িতে তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আছি, রাশিয়া যাবার আয়োজন চলছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম এইচ. জি. ওয়েলস্ দক্ষিণ-ফ্রান্স যাবার পথে এই শহরে এসেছেন। খুব ইচ্ছে হ'ল তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। সকালবেলার নীল জ্বলন্ত রোদ্দুর তখন আকাশে হ্রদের জলে ছড়িয়ে আছে, সুইস পাহাড়ের প্রাণবন্ত হাওয়া নতুন শীতের একটু আমেজ-ভরা অথচ বেশি ঠাণ্ডা নয়, অরণ্যে বাগানে সুন্দর বাড়ি আর ঘুরন্ত পথে ঘেরা শৈল-শহরের দৃশ্য অমরাবতীর এক টুকরো বললেই হয়— এই-সব আশ্চর্য ব্যাপারের মধ্য দিয়ে চলতে-চলতে ওয়েলস্-এর হোটেলে উপস্থিত হলাম। তিনিও তখন বেড়াতে বেরোচ্ছেন, রাস্তার ধারে নীল-রঙা একটা ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলছেন— সেই সময়ে কথা হ'ল। পূর্বে মধ্যে-মধ্যে এই মস্ত মানুষটির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, বিশেষ ক'রে লণ্ডনে তাঁর রিজেণ্টস্ পার্কের ফ্ল্যাটে, যেখানে তিনি দরজা বন্ধ ক'রে কেবলই লেখেন— সেই ফ্ল্যাটকে অনেকে বলতেন ওয়েলস্-এর লেখার ফ্যাক্টরি। সুইটজরলণ্ডে এসে তাঁকেও ছুটিতে পেয়েছে, কাঁধে ভ্রমণের থলি ঝুলোনো, হাতে ক্যামেরা। সর্বদাই তাঁর মুখ প্রসন্ন সহাস্য কিন্তু এখন যেন আরও বন্ধুতায় ভরে উঠল— বললেন, বেশ এখানে কত নানারকম কথাবার্তা জমবে। রবীন্দ্রনাথ জেনিভাতেই আছেন শুনে উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে যাবো ? স্কুল-বয়ের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে— একঝুড়ি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হব।" রবীন্দ্রনাথ যেবার নোবেল প্রাইজ পান, সেই আঠারো বছর পূর্বে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তখনই কবির সঙ্গে য়ুরোপের এই আশ্চর্য ঔপন্যাসিক, এই নিত্যনূতন উদ্ভাবনশীল, ভাবুক ওয়েলস্-এর পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন অথচ চঞ্চল উচ্ছল আধুনিক যুগের আবর্তে-পড়া মনীষী তিনি ভারতবর্ষের মহাদৃষ্টিসম্পন্ন কবিকে ঠিক বুঝে উঠতেও পারতেন না। তিনি আসছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বললেন, "দেখো তো, এতবড়ো মানুষ তৈরি প্রশ্ন নিয়ে আসবেন, আমি সে-সবের হঠাৎ উত্তর দেব কী ক'রে ?" দু-দিন পরে যখন অপরাহ্ণে দুই মনীষীর সাক্ষাৎ হ'ল, দু-জনের আলাপে হাসিতে বিবিধ বিষয়ের হাল্কা গভীর আলোচনায় তখন

সে বড়ো আশ্চর্য সময় কাটল— আমাদের দিক থেকেই বলছি, কেননা শোনবার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। কিছু নোটও লুকিয়ে নিয়েছিলাম। জেনিভায় অত্যন্ত পক্ব বুদ্ধির পুরোনো রাষ্ট্রজ্ঞরা নানা দেশ থেকে একত্র হয়ে পৃথিবীকে বাঁচাবেন, স্বার্থও ছাড়বেন না, কেবল কৌশল করবেন, লীগ্ অফ নেশনের মধ্যবর্তী সেই প্রকারের রাষ্ট্রিকদের অদ্ভুত চেষ্টা সম্বন্ধে দেখলাম এঁরা দু-জনেই অবিশ্বাসী। যাদের ব্যাবসাই হচ্ছে ষড়যন্ত্র করা তারাই দেশের অগণ্য সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবে ; এরা কাদের প্রতিনিধি ? কী মন্ত্র কোন মন্ত্রণা দেবে এরা ? ভারতবর্ষের কথাও উঠেছিল, ওয়েল্‌স্ বলেছিলেন, ইংরেজ রাজকর্মচারীর যতই দোষ থাক কর্মচারিণী অর্থাৎ কর্মচারীদের পত্নীদেরও দোষ কম নয়, কেননা, তাঁরা ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে সহজ সামাজিক যোগস্থাপনের কোনো চেষ্টাই করেননি। তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কেবল বাণিজ্য বা কর্মগৌরবের যোগে ভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ ভালো করা যায় না, তার পিছনে সমাজ-সৌহার্দ্যের আগ্রহশক্তি থাকা চাই। এই সহজ সম্বন্ধের ভাব গড়ে তোলাই আসল কাজ ; যাঁরা বিদেশে গিয়ে বিদেশী এবং বিদ্বেষী ভাব নিয়ে স্বতন্ত্র থাকেন, নিজেদের বাড়ি ক্লাব অফিসকে সমস্ত জনগণের কাছ থেকে আলাদা ক'বে আয়াস বিলাস প্রভুত্বের দ্বীপ তৈরি ক'রে নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যেই এক-একটি উদ্ধত দ্বীপান্তরে বাস করেন তাঁদের দায়িত্ব কতখানি তা-ই ভেবে দেখ। আমরাও যে বিদেশে গিয়ে ঐরকম সন্দিগ্ধ দূরত্বের দেয়াল রেখে চলি না তা নয়, কিন্তু সেরকম প্রায়ই ঘটে না। স্বভাবত ভারতীয় প্রকৃতি হচ্ছে মেলামেশার দিকে— লণ্ডনে প্যারিসে বার্লিনে গিয়েও দল বেঁধে বিদেশীদের পরনিন্দা, দেশের পুরোনো ব্যক্তিগত আলোচনা এবং কেবলমাত্র দেশী খাবার বা অভ্যাসের খোঁজ যারা করে তারা সংখ্যায় কত কম, আর তাদের পিছনে রাষ্ট্রশক্তির ঔদ্ধত্য নেই তো। মানুষে-মানুষে বিচিত্র নতুন মিলের মধ্য দিয়েই যথার্থ আন্তর্জাতিকতা ছড়িয়ে যায়, এই কথাই ওঁরা দু-জনে বলছিলেন। এই জায়গায় ওয়েলস্ চিরদিনই মুক্তমন শ্রেষ্ঠ য়ুরোপের প্রতিনিধি— শেষ পর্যন্ত তিনি এশিয়ার প্রতি পশ্চিমের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রিক পন্থা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমাদের সব বিষয়ে মিলতে না পারে কিন্তু যারাই তাঁর বিশ্ব-ইতিহাস "আউটলাইন অফ হিস্ট্রি" উল্টে দেখেছ, তোমরা জানো, ভগবান বুদ্ধের বিষয়ে, সম্রাট অশোকের বিষয়ে এবং সাধারণভাবে পূর্বদেশের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ওয়েলস কত গভীর হৃদয়াবেগের ভাষায় লিখে গেছেন।

সেদিন জেনিভায় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজও কথাবার্তার সময়ে উপস্থিত ছিলেন— এই রীতিমতো সেণ্ট, এই মূর্তিমান সাধু ইংরেজটির দিকে তাকিয়ে ওয়েলস্ হঠাৎ একবার বললেন, "ইনি আমাদের সব কথা বুঝবেন।" দেখা গেল জেনিভার লীগ অফ নেশন-এর ভাঙন-ধরা আধুনিক অবস্থা দেখে এঁরা পীড়িত। তাঁদের মনে বেদনা জমে উঠেছে। জেনিভায় বসে ঠিক তখনই রাষ্ট্রজ্ঞরা আর-একটি মহাযুদ্ধকে অনিবার্য ক'রে তুলছেন। রাশিয়ার প্রস্তাবিত নিরস্ত্রীকরণ সংকল্পকে তাঁরা হেসে উড়িয়ে দিলেন ; ইংরেজ প্রতিনিধি ভারতসীমান্তে বোমা ফেলবার কাজ প্রশস্ত রাখবার নির্লজ্জ প্রস্তাব করলেন ; জাপান ও জর্মানীকে অনর্থক অপমান করা হ'ল, অথচ কোটি-কোটি টাকার এই সাংঘাতিক রাষ্ট্রিক লীলাখেলায় জেনিভা শহরে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। ঐ সময়ে শান্ত একটি ঘরে বসে উজ্জ্বলমন তিনটি মানুষ অন্তদৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছেন। জানালার বাহিরে দূরে শুভ্র বরফের পাহাড় সোনার সূর্য প'রে পৃথিবীর দিব্যতা ঘোষণা করছে, স্বাধীনতার সন্ধানী পর্বতচারী কত সুইস কর্মী এবং তাদেরই ভাইবোন কত লক্ষ দূরদূরান্তের নরনারী দেশে-দেশে নতুন মানুষের ভবিষ্যৎ গড়তে চায়। যাঁরা চিন্তার রাজা, যাঁরা কল্যাণশক্তিমান, তাঁদের কোনোই স্থান ছিল না জেনিভার আন্তর্জাতিক বিশ্বরাষ্ট্রিক ইত্যাদি বিধানসভায়। এই কথাটা সেদিন আমার বিশেষ ক'রে মনে হয়েছিল।

ওয়েলস্-সাহেব যখন বেরিয়ে এলেন তাঁর চোখ উজ্জ্বল, মনে হ'ল এইবার গিয়ে হয়তো আশ্চর্য ইংরেজিতে কিছু লিখবেন। এঁর তুল্য লেখক ইংলণ্ডে কম জন্মেছেন। সব লেখা সমান নয়, কেননা লিখতেন বেশি, কিন্তু তাঁর ছোটোগল্পের গুচ্ছ "কান্ট্রি অফ দি ব্লাইণ্ড" (অন্ধের দেশ) যে পড়েছে সে কখনো ভোলেনি, তাছাড়া তাঁর বৈজ্ঞানিক খেয়ালি উপন্যাসগুলি— যেমন "ফার্স্ট মেন ইন দি মুন" (চাঁদের দেশে প্রথম মানুষ) আজও মনে তেমনি নেশা ধরিয়ে দেয়। উপন্যাসের মধ্যে উৎকট নানা ধরনের রচনা তাঁর আছে কিন্তু ছোটো-বড়ো সকলেরই মনোহরণ করেছে "কীপস্" বইখানি, আর সাইকেল চড়ে বেড়ানোর ভারি চমৎকার ঐ গল্প 'দি হুইলস্ অফ চান্স্'। লেখা তাঁর কলম থেকে বেরোত ঝরনার মতো— ছোটোগল্প, বড়োগল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক সামাজিক দার্শনিক প্রবন্ধের বিরাম ছিল না। কত তাঁর আশা, কত তাঁর করবার ইচ্ছে, মানুষের পৃথিবীটাকে বদলিয়ে, উলটিয়ে, ঢেলে সাজাবার পণ করেছিলেন তিনি— এমন উৎসাহ যে সকলেরই ছোঁয়াচ লাগত।

অন্যায়ের উপর ভারি রাগ করতেন, বন্ধুও ভুল করলে যা-তা লিখে বসতেন, আবার প্রশংসা করতে ভুল স্বীকার করতেও অদ্বিতীয়। এই-সব ওঠাপড়া উত্তেজনা-আলোচনার মধ্যে হঠাৎ কখন আরও একটি অপূর্ব গল্প লিখে বসতেন— সবাই ভুলে যেত মহাতার্কিক পৃথিবী-সংস্কারক ওয়েলস্‌কে। শুধু তা-ই নয়, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি মজা ক'রে ছোটদের জন্যে নানারকম খেলা বানিয়ে তা দিয়ে বই ছাপিয়েছেন তিনি— মজার ছবিগুলি নিজেরই আঁকা। চেহারা অনেকখানি, লম্বায় মাঝারি-গোছের, কিন্তু শেষদিকটায় বেশ রীতিমতো মোটা হয়ে পড়েছিলেন, গলার স্বর অদ্ভুত উৎসাহে-ভরা, আর একটু উঁচু-সুরের তীক্ষ্ণ যেমন কারো-কারো হয় তেমনি। খুব শৌখিন ছিলেন, আর সবাইকে নিয়ে বেড়ানো, খাওয়ানো, তা-ও খুব ভালোবাসতেন। সবরকম হৈচৈ চলছে বাড়িতে। হঠাৎ এর মধ্যে ওয়েলস্ কোথায়? খুঁজে পাওয়া গেল লেখবার ঘরের কোনায় বসে হঠাৎ ক্রমাগত লিখেই যাচ্ছেন, চারিদিকে কাগজ ছড়ানো, যেন ঝড়ে পাতা উড়ছে। এইরকম মানুষ ছিলেন তিনি।

শেষজীবনে শরীরের কষ্ট কম পাননি, বাড়িতেও সুখ ছিল না, তাঁর স্ত্রী পূর্বেই মারা যান, কিন্তু 'এইচ জি'— তাঁকে এই নামে ডাকতেন বন্ধুরা— সবার কথাই ভাবতেন নিজের ছাড়া। তারপর একদিন এল যখন তাঁর আনন্দ উৎসাহ আবার নিভল। কিন্তু এর কারণ ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা নয়, এমনকি মৃত্যুর শোকেও তিনি আপন বিশ্বাস হারাননি। যখন জেনিভায় তাঁকে দেখলাম তখন থেকেই পৃথিবীজোড়া মানুষের চরম দুর্গতি তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু তার প্রায় আট-নয় বছর পরে এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অমন-যে নিত্যউৎসাহী উৎসুক ভাবুক ওয়েলস্ তিনিও শেষ পর্যন্ত মন বেঁধে রাখতে পারলেন না। প্রসিদ্ধ লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বোমার আক্রমণে মানুষের ধ্বংসলীলা সহ্য না করতে পেরে লণ্ডনে আত্মহত্যা করেন, জর্মান লেখক আর্নস্ট্ টলারও নিজের জীবন দেন, এইরকম কত শিল্পী কত সহৃদয় মানুষ ভেঙে যান যুদ্ধের পাপচক্রে। ওয়েলস্-এর মানসিক মৃত্যুও কিছু কম সাংঘাতিক নয়। সব বিশ্বাস হারালেন তিনি। চতুর্দিকে বন্দুক বারুদ এটম বম্ব্ টর্পিডো নিয়ে জলে স্থলে হাওয়ায় ছুটছে মানুষ মানুষকে মারতে, পৃথিবীর একদিক থেকে অন্যদিকে জ্বলছে গ্রাম, পুড়ছে শহর, ছুটছে কোটি গৃহহীন সর্বস্বহীন নরনারী। য়ুরোপীয় সভ্যতার শ্মশান জ্বলছে, জাপানে চীনেও তাই। এখন বেঁচে থাকলে তিনি

দেখতেন ভারতীয় সাম্প্রদায়িক দাবানল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওয়েলস্ সমগ্র মানবজাতিকে কেবল একদিক থেকেই দেখেছিলেন। তাই তাঁর সহ্য হ'ল না। মানুষ তো কেবল সংহারক নয়, সে যেখানে নতুন সৃষ্টি করছে, জীবন-মরণ পণ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে তার সংবাদ ওয়েলস্-এর কাছে কেন পৌঁছল না। পৃথিবী তো কেবল শেষ মহাযুদ্ধের পৃথিবী নয়। চেয়ে দেখো প্রসারিত দৃষ্টিতে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিতে, অগণিত পুণ্যবান সক্রিয় অভয় মানুষের দৃষ্টিতে। "মাইণ্ড্ অ্যাট দি এণ্ড্ অফ ইটস্ টেদার" (মনের শেষের দশা) এই বইটিতে ওয়েলস-এর চরম নিরাশার কথা আছে— এই বইখানি হচ্ছে পুরোনো রাষ্ট্রিক অসাম্যতান্ত্রিক য়ুরোপের মৃত্যুচিহ্নিত সাক্ষ্য। অবশ্য সেই য়ুরোপ আজও মরেনি, পূর্বদেশেও মারবার মরবার আরও পালা চলছে। কিন্তু দিকে-দিকে আর-একটি নবমানব-যুগ উঠল, ভারতবর্ষেই তার নিশান উড়ছে দুর্যোগের মধ্যেই— ওয়েলস্ যদি এই দিনের জাগরণ-পর্ব দেখে যেতেন!

সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় নিয়ে আবার টুপি মাথায় দিয়ে জেনিভার সূর্যাস্তরঙিন পথে যখন ওয়েলস্ একাকী চলে গেলেন, তাঁকে দেখে মনে খুব একটি স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগল। তাঁর মধ্যে কী ছিল যাতে জীনিয়স হলেও তাঁকে খুব আপনার লোক ব'লে মনে হ'ত— আমাদেরই মতো দুঃখে সুখে বিচলিত অস্থির একটি মানুষ। অথচ ঐ লোকটি যে আশ্চর্য শিল্পরচনা রেখে গেলেন তা বহু সভ্যতার ভস্মদশা অতিক্রম ক'রে থেকে যাবে।

ক্যারিবিয়নের চিঠি

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রিয়বরেষু

এইমাত্র হাভানা শহর থেকে উড়ে এসেছি, জানি না এই চিঠিতে বিখ্যাত চুরটের গন্ধ পাবেন কি না। যদিও সিগারের রাজ্য আমার সম্পূর্ণ অজানা, তবু কার সাধ্য কিউবা দ্বীপে গিয়ে মহার্ঘ ধূম্রকে অস্বীকার করে? মধ্যে মায়ামি শহরে নেমেছিলাম ফ্লরিডায়, সেখানেও ধনীদের ডলার ভস্ম-ধোঁয়ায় রাত্রি হয়ে উঠেছে দিন। অথবা দিন হয়েছে মোহের রাত্রি। হোটেল-অট্টালিকায় ভ্রামণিক বিলাসপতিরা ক্যারিবিয়ন দ্বীপের সৌন্দর্যকে লঙ্ঘন করেছেন, নির্মল জলের নীলে তুলেছেন ক্যাসিনোর মর্মর জুয়াড়ি দেয়াল, বিদ্যুৎবিদ্ধ আকাশে ছুটেছে তাঁদের বিজ্ঞাপিত রঙিন মদ্যের চিত্রণ। Rock 'n' Roll-এর চীৎকৃত সংগীতহীনতা ভেদ ক'রেও দেখা দেয় দূরের বিধৃত শৈলশান্তি, অসীম সমুদ্রের ধৈর্যরেখা, এমনকি হাভানাতেও। হঠাৎ মনে পড়ে যায় পৃথিবীতে আছি, যার চতুর্দিকে কালের সমুদ্র, তারও পারে সময়হীন আকাশ, যেন সবটাই ক্যারিবিয়ন যে-কোনো দ্বীপের মতো আত্মসম্পূর্ণ জগৎপরিধি। তার মধ্যে দ্বীপবর্তী মানুষের জীবন ক্রেতা-ব্যবসায়ী-রাষ্ট্রলুব্ধের সম্পূর্ণ করায়ত্ত নয়; আড়কাঠির আক্রমণ সমাজের শেষ মর্মে সেখানে পৌঁছয় না; আখের ক্ষেতে কফি-কোকোর সারিজঙ্গলে যারা কাফ্রি দাস বা indentured labourer-এর ভারতীয় বংশধর তারাও কোনোখানে মরতে-মরতে অমরত্বের সন্ধান পেয়েছে। West Indies-এর দ্বীপরাজ্য সেই-সব বিগত বন্দী কর্মমুমূর্ষুদের চক্ষের ভঙ্গিতে আজও সজল, তাদের ভরসার দীর্ঘশ্বাস চাবুকের আঘাত-শব্দের চেয়ে দূরে গিয়ে পরমাশ্রিত। অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের পাশাপাশি অবর্ণনীয় অত্যাচার শ্রান্তির তীব্র বিসংগতি কত দ্বীপে দেখলাম; দৈবের জগতে এসে মানুষের তৈরি নারকীয় কীর্তি। অথচ এই নিরন্তর সংঘাতের মধ্য হতে উৎসিত হয়ে উঠেছে মানবিক বিজয়ী ইতিহাস, তার ধারায় নারায়ণী মহিমার ধ্বনি বারে-বারে শোনা গেল। ভাগ্যক্রমে যে-যুগে জন্মেছি তাতে জনসাধারণের মুক্তি সমধিক আসন্ন।

হেইটি দ্বীপে ট্যুরিস্ট-ব্যসনের অভাব নেই, কিন্তু সব-চেয়ে প্রথম স্বাধীন দ্বীপ রূপে ক্যারিবিয়ন-এ এর মর্যাদা দ্রুত লক্ষণীয়। হেইটির পার্বত্য দারিদ্র্যপূর্ণ

গ্রাম, তার উপরে জড়োয়া মেঘের কাজ, এবং ড্রিমিড্রিমি আফ্রিকান ড্রাম আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। তথ্যসঞ্চয়ের শ্রমে গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছি, voodoo নৃত্যে এবং rum-এ মেশা অদ্ভুত কৌশলী ধর্মনেশার কারিগরি অনভিভূত আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, চোখে ঠেকেছে সোনার বায়ুতে কাটা বিচিত্র শৈলান্তরেখা। কোথাও আরণ্যপর্বত হঠাৎ বালির তীরে নেমে একেবারে অগাধ ঢেউয়ে অদৃশ্য। কোথাও করতালি দিচ্ছে পাম্ গাছ, ফ্লামবয়াণ্ট্ (আমাদের কৃষ্ণচূড়াগোছের) আগাগোড়া ফুলে রক্তিম আচ্ছন্ন।

হেইটিতে ভারতীয় প্রায় কেউ নেই এক-ঘর সমৃদ্ধ দোকানি ছাড়া, কিন্তু 'মহামানবের সাগরতীরে' এসে ভারতবর্ষীয় পথিককে ঘরে-ঘরেই দেশে ফিরতে হয়। বন্দনা জানাতে নেমেছিলাম ক্রীতদাসের মুক্ত দ্বীপে, আকাশ যেখানে আজও তাদের প্রাচীন বেদনায় স্মার্ত, উদ্‌গাথা উঠেছে শৃঙ্খলধ্বংসের আবাহনে।

একটু ইতিহাস শুনুন : "The first Africans to set foot in Haiti came in the year 1510. Just precisely where they came from no one knows, but it was somewhere along the stretch from Singal to the Congo. What they went through is an old story : disease, thirst, brutality, sea-sickness. And their trials did not end when they were put ashore in the Indies. The masters who had annihilated the Indian (অর্থাৎ আদিম অধিবাসী 'আমেরিণ্ডিয়ান') in less than twenty years were not likely to consider the Africans, darker and stronger, as having any particular human right. One of the first prayers of the slaves in Haiti must have been gratefulness for the oxen, horses, and bourriques ; if it were not for them the Negroes would have had to bear even greater burdens.

"In the hard years which followed, more and more slaves were poured into Hispaniola, as Haiti was then called. The West Indies became the most prosperous of slave markets, and Haiti, Martinique and a few of the other island colonies absorbed all the slaves they could get. These men who came in chains were of all classes and types...".

সহৃদয় মার্কিন ঐতিহাসিকের এই বর্ণনা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর যে-কোনো দ্বীপের হৃৎসাক্ষীরূপে গ্রহণ করা চলে। প্রথম পালায় আমেরিণ্ডিয়ান (তীব্র কারিব্, শান্ত আরায়োয়াক্ এবং অন্যান্য মানুষের সংসার) ধ্বংস, সম্ভব হলে

নিশ্চিহ্ন বধ (কোথাও তারা দু-চার পরিবার এধারে ওধারে, যেমন দৈবাৎ ডমিনিকা দ্বীপে বা ল্যাটিন আমেরিকান বৃহৎ ভূখণ্ডের দু-এক কোনায়, পালিয়ে বেঁচেরর্তে আছে) ; দ্বিতীয় পর্যায়ে নিগ্রো আফ্রিকানদের বেঁধে আনা জাহাজ-ভর্তি করে ; এবং তৃতীয় স্তবকে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের অবসানে ভারতীয় বা অন্য কোনো এশিয়ান দেশ থেকে 'কুলি' চালনা করা। সব দ্বীপে ভারতীয় 'কুলি' পৌছয়নি, কিন্তু ট্রিনিডাডে, গ্রেনাডায়, ব্রিটিশ গিয়ানায়, ডাচ সুরীনামে, জামাইকা দ্বীপে সেই ভাগ্যহত ভারতীয়দেব শত-শত দেখলাম যারা এককালে এসেছিল ধিক্কৃত সাম্রাজ্যের 'কুলি' নাম নিয়ে। আজ তাদের অনেকের অবস্থান্তর ঘটেছে, কেউ-কেউ শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত অথবা কচিৎ ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু গভীর সমুদ্রের দূর অলগ্নতার মধ্যে অতিক্ষুদ্র দ্বীপে যাদের দু-তিন পুরুষ কাটল তাদের না আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ, না আছে পিতৃপুরুষের ধর্ম বা ভাষা। ট্রিনিডাড বিত্তশালী বৃহত্তর দ্বীপ, এবং সেখানে সংখ্যায় গরিষ্ঠ ভারতীয়ের দশা অনেকটা ভালো, কিন্তু গ্রেনাডা, সেণ্ট লুস্যা, এমনকি জামাইকা দ্বীপের ভারত-সম্পর্কিত বহু সহস্র লোকজনের দুর্দশা অবর্ণনীয়। ফরাসী মার্টিনিক্ দ্বীপে আফ্রিকানদের অবস্থা সর্বাধম ; অব্যবস্থা এবং ঘুণে-ধরা সাম্রাজ্যিকতার একান্ত পরিণাম দেখতে আসবেন ঐ সুশ্রী, ঐ দুঃখদীর্ণ সহায়হীন দ্বীপবাসীর ঘরে-জঙ্গলে। অন্য দ্বীপের মতো ওখানেও rum-এর দুঃখহরণ স্রোত বইছে, মানুষকে সস্তায় পাতালেব দিকে ঠেলে ফেলে। সেখানেও আখের ক্ষেতের ফালিতে কাঁচা রোদ পড়েছে, ঝরনা-জল ঝরছে, নিপুণ পাথরের নিকণে। কিন্তু .।নবদিগন্ত এখনো আঁধি-লাগা।

অপ্রাসঙ্গিকভাবে আবার হেইটিতে ফিরে আসি। এখানে এরা তীব্র যন্ত্রণাব বিপ্লবে ফরাসী ইস্পানির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। হেইটির কাহিনী আর-একটু বলি। তারপর ক্ষণকালের জন্যে, সোনার দেশ সুরীনাম ছুঁয়ে এই চিঠি শেষ করব।

সেই মার্কিন লেখক Harold Courlanger বলছেন: "In the hills of Haiti everyone sings and dan‹ ˀs. Babies of three years dance Vodoun and Pétro with their elders. Boys of seven are already master drummers and under the teaching of their fathers, who learned from their own fathers. And old women weighed down by years and infirmities still dance Ibo with their shoulders.

"In Haiti everyone works. If they do not work they do not live. Most of them work very hard. Whether they work so hard or not, living is unbounteous. Women walk great distances with heavy loads on their heads, some of them walk all day and night to get to market, where they may earn eight cents on their Congo bean and cotton, and they walk all day and night to get home. And the men plant and till their garden with a machette or hoe, hang their maize and Kaffir corn high in the branches to dry.

"Sometimes they sit and wait for their big-bananas and the cocoanuts to ripen, but they are not lazy, they are simply patient. They are patient of a summer sun which bakes their ground hard and unfruitful, of earth which often yields not enough to keep their bodies living.

"But when it is time to dance and sing, nature pours forth spiritual riches from the large end of the horn. For the moment, life surges in dulled bodies as well as in the quick. Drummers become one with their drums and the drums come alive. People move and sing and vibrate with nature ; they dance with each other ; with their ancestors, and with old African gods whom they have not forgotten..." (*Haiti Dances* বইখানি পড়ে দেখবেন)।

হেইটির ক্রিয়োল্ পুরুষ-মেয়েদের দেখে সাঁওতালি চেহারা এবং প্রকৃতি মনে পড়ে যায়। আগের বছরে গোল্ড-কোস্ট-এ ঠিক ঐরকম 'talking drums', 'male and female drums' শুনেছিলাম, মৃদঙ্গের দ্রুত আঙ্গিকে প্রাণের স্পন্দন, রক্তের ধ্বনি, সমস্ত অরণ্য থরথর ক'রে উঠেছিল কীবী ট্রাইবল্-নেতার ঘন গাছে ভরা অঙ্গনে।

স্বরীনাম। পারামারিবো শহর থেকে দূরে 'ভারতীয়' বসতি দেখতে বেরোলাম। তারা আজ ডাচ্-গিয়ানা-বাসী গিয়ানিজ; রাষ্ট্র-অধিকারে তারা ভারতীয় নয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাদের চেহারা ভাষা ধর্ম লোকাচার আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী। শাড়ি ধুতি অনেকে পরেন বিশেষ উপলক্ষে, পূজাপার্বণে, বিবাহের উৎসবে; কিন্তু সদাসর্বদা শাড়ি ব্যবহার করেন এমন গৃহিণীও এখানে চোখে পড়ল। স্বরামাক্কা নদী পেরিয়ে ফেরিঘাটের অনতিদূরে

এত সহস্র ভারতীয় জনতা দেখব ভাবিনি। একটি গাঁয়ে দারুণ রোদ্দুর ঠেলে চাষী শ্রমিক বোন-ভাই এসেছিল 'আপন দেশী' সন্ত-আগত ভাইকে দেখতে। বৃদ্ধ শুভ্রকেশ চাষী-সভাপতি হাত জোড় ক'রে স্তোত্রপাঠের নির্দেশ জানালেন, সকলে এককণ্ঠে সেই শক্তির স্তবে যোগ দিলেন যিনি "মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং"। পরিচিত শুভ শ্লোক ঐ সমাবেশে, ধুলোয় পরবাসে হঠাৎ কী মহিমায় আবির্ভূত হ'ল তা কী বলব। কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় এই ডাচ্ রাজ্য, এই লাটিন আমেরিকান দেশের আটলান্টিক-তীরের ফালি, ব্রেজিল-এর কাছে। আরও মন্ত্র যোগ হ'ল, "সহনাববতু, সহবীর্যং করবাবহৈ"— যোগসেতু স্পষ্ট হয়ে উঠল কালকে অতিক্রম ক'রে, দেশকে। সুরীনামের ভারতীয়েরা আজও জাগিয়ে রেখেছেন হিন্দি ভাষার দেউটি, জল দিচ্ছেন তুলসীতলায়, আতিথ্যদানের ইচ্ছা এতই বেশি যে, সমস্ত গরিব গ্রাম আগে থেকে চাঁদা তুলে আমাকে সুরীনামের সোনায় গড়া একটি সোনার আংটি উপহার দিলেন। কপালে ঠেকল চন্দন, গলায় পরলাম গাঁদাফুলের মালা। দেশ আর এই দেশের মধ্যে কত দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব, পনেরো হাজার মাইলের কত মহাভূমি-সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান তা ভুলে গেলাম। ভারতবর্ষ থেকে সব-চেয়ে দূরে সুরীনামের ভারতী-বসতিতে আজও অনেকে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম রক্ষা করেছেন, দুই ধর্মের চেয়ে বৃহত্তর গভীরতর মানবধর্মে তারা মিলিত। বিভক্ত ভারত-পাকিস্তানের প্রসঙ্গ তাঁদের পক্ষে একান্ত দুঃখকর; কয়েকজন বললেন, "ঐ ভাঙা মাতৃদেশে ফিরব না, তার চেয়ে এইখানেই থাকি।" পরে পানামায় গিয়েছি, সেখানেও একটি বাঙালী মুসলমান ঐ কথাই বললেন।

যে সোনার টুকরো হাতে নিয়ে সেদিন অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম তার দাম কোনোদিন শোধ হবে না। অন্যভাবে প্রতিদান দিয়েছি, সেটা কেবলমাত্র বস্তুগত, কিন্তু যথার্থ দানের প্রতিদান কোথায়। নদী পেরোবার সময় কারো কণ্ঠে কথা ছিল না, দৃষ্টি নামাতে হ'ল।

ঐ সুরামাক্কার কাছেই ওখানকার একটিমাত্র বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে দেখা হ'ল। হয়তো এখানে-ওখানে কচিৎ বাঙালী হিন্দিভাষীদের মধ্যে আছেন, ঠিক কেউ বলতে পারল না। হিন্দিকেই সুরীনামের ভারতীয়রা মাতৃভাষা ব'লে মেনে নিয়েছেন, যদিও অনেকের ভাষা ছিল তামিল, গুজরাটি, মারাঠি, বা অন্য। ঐ বাঙালী ভদ্রলোক বাংলা প্রায় ভুলে গেছেন, নাম বললেন— মন্-মোহন, ত্রিশ বছর কোনো বাংলা কথা বলেননি। মলিন পাতলুন পরা, ছেঁড়া

শার্ট গায়ে— আস্তে গলায় জানালেন, "বহু কষ্ট পেয়েছি, দাদা।" শুনলাম ভদ্রলোকের কোনো আত্মীয় কোথাও নেই। কোন এক জাহাজে চলে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। কিন্তু সুরীনামে কিংবা ব্রিটিশ গিয়ানায় 'কল্‌কাত্তা' মানে কলকাতায় এসে যে-কোনো জাহাজে ওঠা। অন্য অনেকে বিশেষ জাহাজের নামও জানেন, হিন্দু-মুসলমান তাঁরা নিজেকে সেই জাহাজের 'একজাহাজী' ব'লে বর্ণনা করেন, ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে পিতৃপুরুষের বাসস্থান তা সকলের স্মরণ নেই। হঠাৎ দেখি মন্‌-মোহনবাবু গাঁয়ের ভিড়ে কোথায় চলে গেছেন। বাংলা ভাষায় যা মনে জাগল সেই অনুভূতির ভাষা আর তাঁকে জানানো হ'ল না।

ইংরেজ-রাজ 'indentured labour'-এর ব্যাবসা বন্ধ করেছে ; স্বীকার করতে হবে সমস্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগুলিকে এক ফেডারেশন-এর ব্যবস্থায় বাঁধবার উদ্যম তাঁদের প্রশংসনীয়। যে-কোনো স্বাভাবিক, প্রাতিবেশিক রাষ্ট্ররূপ ঐ দ্বীপসভ্যতার বিচিত্র সমাজ ও সংসারকে অর্থ এবং ব্যাবসার আদান-প্রদানকে ঐক্যের সহযোগিতা দিতে সক্ষম আমরা তার পক্ষপাতী। কিন্তু এতদিনের হানি-গ্লানি-বিঘ্নের অন্ধতা সহজে শেষ হবে না। অন্য বিধান আজ যদি এগিয়ে এসে থাকে ভারতীয় পর্যটক আমি বলব, স্বাগত। যাঁরা ভারতীয় সংস্কার ভাষা ধর্ম রেখে ক্যারিবিয়ন্ রাষ্ট্রসভ্যতার অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাঁদের সমস্ত অধিকার যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। দেশ তাঁদের ভারত নয়, কিন্তু ট্রিনিডেডিয়ান, জামাইকান, গ্রেনাডিয়ান রূপে তাঁরা আপন ইচ্ছা ও বিশ্বাস-সংগত আচার ধর্ম ভাষা রক্ষা করবেন।

অবস্থার বিপর্যয়ে এবং একান্ত বিরুদ্ধ পরিবেশে যাঁরা ধর্ম ভাষা সংস্কার হারিয়ে বসেছেন তাঁদের অনেককে দেখলাম। জাহাজ-বোঝাই মানুষ-পণ্য, প্রথমে কাফ্রি 'স্লেভ', পরে ভারতীয় 'কুলি', কোথায় ছিল তাদের আপন রাষ্ট্র, কোথায় তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকার। কোথায় কোন মুল্লুকে, ডাচ বা ফরাসী-অধিকৃত ভূখণ্ডে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতীয়কে কোন আইনে নামানো হ'ল তা কে জানে। যেখানে পৌছল সেখানে তৎক্ষণাৎ তাদের জায়গা হ'ল মশায়-ভরা জঙ্গলে। ঢুকল তারা আখের অরণ্যে, মরল কেউ সাপের কামড়ে, যারা বাঁচল দলে-দলে তারা ভর্তি হ'ল দিনে বারো-চোদ্দ ঘণ্টার খাটুনিতে। আখের রস যথেষ্ট বেরোল, চিনির স্তূপ শাদা উঁচু হয়ে উঠল, কারখানার কল থামল না। জাহাজঘাঁটি লাভের বন্দর হ'ল স্ফীতকায়।

পালাবার পথ বন্ধ হ'ল, কেননা শুধু সমুদ্র লাফিয়ে বাড়ি ফেরার অসম্ভবতা নয়, শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাশক্তির হ্রাসে মন বদ্ধ হয়ে যায়, সম্ভবও হয়ে ওঠে একান্ত অবিশ্বাস্য। অনেক দ্বীপে, যেমন গ্রেনাডায়, এমনকি জামাইকার অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিপূর্ণ পার্বত্য গ্রামে লোকালয়ে দেখেছি বেশির ভাগ ভারতীয়রা ভাষা, ধর্ম, আপন পিতৃপুরুষের নাম-পরিচয়-সুদ্ধ সবই গেছেন ভুলে। সামনে এলেন উইলিয়ম জোন্স্— কিন্তু দেখামাত্র বোঝা যায় ভদ্রলোক না উইলিয়ম না জোন্স্— অর্থাৎ আসল কোনো ভাবে। দলে-দলে ওঁদের ক্রিশ্চান করা হয়েছে ; নাম ওঁদের বদলে দিয়েছেন শাসকপক্ষের ধার্মিকেরা, আছে শুধু পুরোনো এবং অ-বদলানো সাক্ষাৎ রং এবং চেহারা, অপরিবর্তনীয় ধরন। ঘরে গিয়ে উইলিয়ম জোন্স্ অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির রাত্রে ভূতপূজা করেন, পাথরের টুকরো নেড়ে-চেড়ে জন্তুব লোম বা শিং ছুঁয়ে থাকেন ত্রাণের ইচ্ছায়, রবিবারে যান গির্জায়। নয়তো রবিবার সকালেও পালিয়ে পান করেন rum। সহৃদয় ফ্যাক্টরি-কর্তৃপক্ষ দ্বীপে-দ্বীপে রাম্-এর আড়ত বানিয়েছেন, একই আখের গাঁজানো রসে চাষীর এবং মালিকের আনন্দবর্ধন হচ্ছে। মালিকেরা একটু সতর্ক, যথেষ্টই রাম্-পান করেন, কিন্তু সময় বুঝে ; তাছাড়া পাকস্থলীতে খাদ্যেব সঙ্গে মদ্য যোগ হলে অতটা দ্রুত অন্তিম দশা হয় না। দারিদ্র্যের অনুপানে মদ্যের যোগ হলে ব্যাপারটা দারুণ হতে বাধ্য। কোনো-কোনো দ্বীপে বক্তৃতায় বলতে বাধ্য হয়েছি —rum-এর রামায়ণে না আছে ধর্ম, না আছে বুদ্ধি। যথার্থ রামায়ণচর্চা করলে এরা বাঁচত। দু-চার জন দেখলাম ঠিকই বুঝলেন কী বলছি। এমনকি রাম-এর ব্যাবসা চালান যে-সব 'পা।ণ্ডত' (কেউ-কেউ এঁরা হিন্দুধর্ম রক্ষা করেছেন কিন্তু একই সঙ্গে রাম্ এবং রামায়ণের ব্য'বসা করেন) ট্রিনিডাডে তাঁদের কাছে থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছি। সবসুদ্ধ কী জটিল ব্যাপার তাই বুঝুন। যে-কোনো ধর্ম বা সভ্যতা গ্রহণ করাতে কোনোই দোষ নেই বলা-ই বাহুল্য, কিন্তু খিচুড়ি বানিয়ে ধর্মের বা সভ্যতার উৎকর্ষ হয় না। খিচুড়িতেও বাধা নেই, যদি সত্যি রান্না হয়, তার সঙ্গে প্রাণের অন্নের যোগ থাকে। যেখানে পাচক বা ভোক্তার দল স্বাধীন ইচ্ছায় যুক্ত, যেখানে কেবলমাত্র .ন্দু বা ক্রিশ্চান বা মুসলমান কিংবা অন্য কোনো ধর্মকে অসহায় সমবেত জনসংঘের সামনে একমাত্র পথ্য ব'লে জাহির হয়নি, সেখানে ধর্মে ও সমাজে দেওয়া-নেওয়ার মঙ্গল-পথ উন্মুক্ত। কেউ-কেউ ধর্মান্তরে না গিয়ে সর্বমানবের আধ্যাত্মিক ধর্মে উপস্থিত হতে চান। মানুষের সেবা এবং ঐশ আরাধনায় কেউ-বা প্রচলিত বিশেষ ধর্মের গভীরে

প্রবিষ্ট হয়ে আসল ধর্মকে উদ্ধার করেন। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্ট ধর্ম বা ইস্‌লামের বিশুদ্ধ রূপ কারো অবিদিত নয়। কিন্তু ক্ষুদ্র খণ্ড যোগচ্ছিন্ন দ্বীপে যাঁ দুর্গম গহন দেশের কোনায় কেবলমাত্র অন্ধ-মিশ্রণের বা জবরদস্তির প্রথা শুরু হলে. ধর্ম ঠেকে ক্রিয়াকাণ্ডে, ভাষা ঠেকে talkie-talkie-তে। সেই টকি-টকি না হিন্দি না ইংরেজি, তাতে না আছে মর্যাদা, না আছে কোনো চিন্তা বা সভ্যতা বা ধর্মের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। মার্টিনিক দ্বীপে কাফ্রি এবং ফরাসী ভৃত্য-প্রভু-সম্পর্কের উভয়বিধ দুর্দশায় যে-ভাষা এবং ভঙ্গি তৈরি হয়ে উঠেছে তার মহিমা অবর্ণনীয়। যথার্থ মানবধর্ম প্রকাশ করার পথ অন্য।

ভর্জিন আইল্যাণ্ডগুলি পূর্বে ছিল ডেনিশ; এখন কিছু তার ইংরেজ, মার্কিনেরা কয়েকটি দ্বীপ কিনে নিয়েছে। বিভীষিকার কালে একদা যখন পশ্চিম-জাতীয়েরা বিকৃত আরব এবং আফ্রিকান দাসব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুরোপুরি যোগ দিল এবং যন্ত্রসভ্যতার যোগে তাকে স্ফীত, সম্ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত লাভজনক ক'রে তুলল তখন এই দ্বীপগুলিতে ক্রীতদাসদের জড়ো ক'রে পুনর্বার বেচা-কেনা হ'ত। জাহাজের কাপ্তেনদের লগ্‌-বুক্‌-এ পড়া যায় আফ্রিকা থেকে এই-সব দ্বীপে আসবার পথে প্রত্যহ অনেক মানুষ 'নষ্ট' হয়ে যাওয়ায় তাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হ'ত। মৃত্যুর কারণ জাহাজের বায়ুহীন কক্ষে অসহনীয় ভিড়, কখনো জলের বা খাদ্যের অভাব, নানারকম যন্ত্রণা, রোগ। জাহাজে-জন্তুর ব্যবস্থাও আজকের দিনে অন্যরকম। দাসদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকত তাদের ভাগ্যে স্বামী-স্ত্রী পিতা-মাতার বিচ্ছেদ এবং পুনর্বার বেশি লাভে অন্যদের কাছে বিক্রীত হওয়া। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আনেন বিশ্ববিধাতা, তারই পালা আধুনিক রাজ্য-সাম্রাজ্যের তুমুল বিপ্লবে আবির্ভূত, কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেকের। কোনো দেশ বা জাতি এর থেকে পরিত্রাণ পাবে না, কেননা জাতি বা বর্ণ বা 'ধর্মে'র নামে পৃথিবী জুড়ে মানুষ অমানবিকতার চর্চা করেছে। St. Croix দ্বীপে এসেছিলাম স্মরণ করতে, সকলের হয়ে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় হয়েও। অস্পৃশ্যতার ধর্ম যাঁরা মানেন দাস-দস্যুর ধর্মও তাঁদের, যদিও অন্যবিধ। কী শান্ত সুখশ্রী ছড়িয়ে আছে St. Croix দ্বীপের Christiansted নামক ছোট্ট শহরে; আশীর্বাদী আলো ঝ'রে পড়ছে চিরবসন্তের বনানীতে, সমুদ্রের স্বনন কোরাল্‌-বালির উজ্জ্বলতায় মধুর মন্দ্রিত, মিশ্রিত। মনে হ'ল এই দুঃখের তীর্থে ক্ষমার সৌন্দর্য এসে পৌঁচেছে। সেই ক্ষমা যেন প্রত্যেক সভ্যতায় আমরা অর্জন করতে

পারি। গির্জের চূড়ায়, বাড়ির স্থাপত্যে পুরোনো ডেনিশ ভাব চিত্তাকর্ষক। ভর্জিন· দ্বীপ ছেড়ে যেতে হ'ল পোর্টোরিকো-তে, সান্-জুয়ান রাজধানীতে। ভাষা ইস্পানি, যদিও শহরে অল্পবিস্তর অনেকে ইংরেজি (বা 'মার্কিনি'!) জানে। বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করলাম এই দ্বীপ জুড়ে আমেরিকানদের চিত্তশক্তি যথার্থই ক্রিয়াশীল, তারাই এই দ্বীপের প্রকৃত চালক, কিন্তু এই চালনায় আত্মত্যাগ আছে, অর্থাৎ জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সমৃদ্ধির জন্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা দ্বীপবাসীর নিত্য সহযোগী হয়ে দেখা দিচ্ছে। লাভের অঙ্ক কষে বা সাম্রাজ্যবাদ ফলিয়ে কর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় না।

ক্যারিবিয়ন্ দ্বীপপুঞ্জ ছোটো একটি পৃথিবীর মতো। মানুষজাতির সংঘর্ষ এবং সমধর্মিতার ধারাবাহী আন্দোলিত প্রতিক্রিয়া ক্ষুদ্র আয়তনের মুকুরে স্পষ্ট চোখে পড়ে। 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্ ফর্ কাল্চারাল রেলেশনস্' দিল্লী থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন এই দ্বীপাবলীর তীর্থে যেতে। অনেক দ্বীপের নাম করেছি; তাছাড়া গিয়েছি টোবেগো, বার্বেডোস্, সেণ্ট টমাস্, গুয়াডেলুগ, আণ্টিগুয়া দ্বীপে। পার হয়েছি, বা ছুঁয়েছি ডমিনিকান্ রিপাব্লিক্, ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়া দেশের প্রান্ত। পানামা ক্যানাল প্রদেশে প্রায় হাজার ভারতীয়ের বসবাস, সেখানে কয়েক দিন সৌহার্দ্যের ব্যস্ততায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় ও ভ্রমণে দ্রুত কাটল। ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যানে অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমান স্বাধীন ভারতের জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিচয় দেবার ভার ছিল আমার; বিশেষ ক'রে সেই-সব দ্বীপবাসীদের কাছে যাদের সংস্কারে সমাজে ভারতীয় সম্পর্ক আজও ঘনিষ্ঠ। কখনো ভাবিনি শুধু ইণ্ডিয়ান নয়, আমেরিণ্ডিয়ান ভাই-ভগ্নীর খোঁজে ব্রিটিশ গিয়ানার গহনে প্রবেশ করতে পারব। একই অপরাহ্নে ব্রেজিলের সীমান্ত পেরিয়ে ওড়া-জাহাজ থেকে দেখলাম পৃথিবীর সব-চেয়ে উঁচু জলপ্রপাত, কাইট্যুর (Kaiteur) ফল্স্— মানবহীন আদিম ঘন অরণ্যে প্রকৃতির অশ্রান্ত জলধারা তুমুল গর্জনে শাদা হয়ে উঠছে, ফেনায় ছড়িয়ে যাচ্ছে আবর্তিত খরধার নদী। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে যখন সলজ্জ বিশ্বাসের নির্মল প্রতীতিময় আমেরিণ্ডিয়ান পল্লী-সংসারে নামলাম, ছোটো শিশু এগিয়ে এল হাসিমুখে, তখন মনে হ'ল আমার ভ্রমণতীর্থ একটি সমে পৌচেছে। এরাই ক্যারিব দ্বীপাবলী, লাটিন আমেরিকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা অঞ্চলের

অধিবাসী। এরা না হোক, এদেরই বংশগত এবং জাতি ও সংস্কারসভ্যতার সব-চেয়ে কাছাকাছি মানুষেরা ছিল পৃথিবীর এই অঞ্চল জুড়ে। তাদের আজ ঘন বনে, মরুময় ক্যানিয়ন্ বা খোয়াই রাজ্যে খুঁজে বার করতে হয়। দ্বীপে-দ্বীপে তাদের হত্যা করা হয়েছে। এর পিছনে যে-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন বা প্রকট তার বর্ণনা এখানে করব না। কেবল ব'লে রাখি, গর্বিত আদি আর্যেরা ভারতবর্ষে তুল্য পাপ হতে মুক্ত নয়। মার্কিন দেশে কল্যাণের ধারা 'আদি-মার্কিন'দের দিকে ফিরেছে, তা আমেরিকায় নানা ভ্রমণে লক্ষ্য করেছি। ক্যারিবিয়ন্ দেশে এবং লাটিন আমেরিকার তীর-তীর্থে ইস্ট ইণ্ডিয়ান পথিক জানিয়ে গেলাম আমেরিণ্ডিয়ানকে আমাদের শ্রদ্ধাবেদনার অভিনন্দন। কলম্বাসের ভুলে এই অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান নামের অপপ্রয়োগ ঘটেছে, কিন্তু এর ফলে যদি ভারতীয়ের সঙ্গে দূরের ভাইয়ের নতুন যোগ হয় তাহলে কল্যাণ। ক্যারিব দ্বীপাবলীর ভ্রমণে এদের সঙ্গে মিলন না ঘটলে তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হ'ত না; ভারতবর্ষ যে সর্ব-মানবিকতার দুরূহ পরীক্ষায় নিযুক্ত তার পরিচয় ভ্রষ্ট হ'ত। ক্যারিবিয়ানে পশ্চিমদেশীয় নানা জাতির লোক, আফ্রিকার বিবিধ অঞ্চলের নরনারী, ভারতীয় চীন আরবিক সীরিয় ইহুদি সম্প্রদায় একত্র ভাগ্যপরীক্ষায় মিলেছে। কাউকে বাদ দিয়ে মানরক্ষা শান্তিরক্ষা হবে না। হিন্দু মুসলমান ভারতের বাহিরে সেখানে সহজাত ঐক্যের সন্ধানী, যথার্থ ক্রিশ্চান শিক্ষক ব্রতচারী সেই সহযোগিতায় সমধর্মী। ক্যারিবিয়নের দ্বীপে নতুন দীপালির সূচনা দেখে এসেছি। সব আলো জ্বলেনি। কিন্তু যেখানে যন্ত্রণার ইতিহাস দীর্ঘ ছায়া ফেলে আজও আখের ক্ষেতে, মদের কারখানায়, ধানের মাঠে, জলায় মানুষের উত্তর খুঁজছে সেই পরিবেশে একটি নতুন প্রদীপ জ্বললে অনেকখানি আশ্বাস পাওয়া যায়। দুরূহ সেবার উৎসবে ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞানী শিল্পী সাধকেরা গিয়ানায় ট্রিনিডাডে সুরীনামে নতুন কালের আহ্বানে যোগ দেবেন না কি? অন্যদেশীয়, অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্বর্তী জনসমাজের সঙ্গে মঙ্গলকর্মে মিলিত হবার অধিকার সকলের। ভারতবর্ষ অনেক দূরে, কিন্তু কাছে-আসা মানুষের যুগে তার দায়িত্ব কম নয়। বস্টনে ফিরে এসে এই চিঠি পাঠাই।